

BENGALI
HISTORY OF INDIA

BY

E. MARSDEN, B A.

Inspector of Schools, Central Circle, Madras (Retired)

AND

RAI K. P. GHOSH, BAHADUR, C. I. E.

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ই. মার্শডেন, বি.এ.

এবং

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি. আই. ই.

MACMILLAN & CO., LIMITED
LONDON, BOMBAY AND CALCUTTA
1909

All rights reserved

সূচী ।

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
১। আৰ্য্যজাতি	১
২। বৈদিক যুগ	৫
৩। উত্তর-ভারতে আৰ্য্যদিগের বিস্তৃতি ...	৮
৪। পরবর্তী বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ ...	১১
৫। রামায়ণ	১৪
৬। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ	২১
৭। দ্রাবিড় সম্প্রদায়	২৪
৮। প্রাচীন হিন্দু-যুগ—জাতিভেদ	২৬
৯। পুরাতন হিন্দু-রাজ্য	৩২
১০। পুরাতন হিন্দু-যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান... ..	৩৬
১১। বুদ্ধ	৪১
১২। বৌদ্ধ ধর্ম	৪৬
১৩। জৈন সম্প্রদায়	৫০
১৪। ভারতে গ্রীক	৫২
১৫। চন্দ্রগুপ্ত	৫৫
১৬। বৌদ্ধযুগের প্রধান প্রধান রাজা ও রাজ্য ...	৬০
১৭। মৌর্য্যরাজ—অশোক	৬১
১৮। ইণ্ডো সিথিয়ান	৬৯
১৯। গুপ্তরাজাদিগের সাম্রাজ্য	৭০
২০। হুন	৭২
২১। বৌদ্ধযুগে ভারতের অবস্থা	৭৩

২২।	পুরাণ	...	...	৭৯
২৩।	পৌরাণিক যুগের হিন্দু উপদেষ্টা	...	...	৮০
২৪।	রাজপুত	...	...	৮৫
২৫।	মুসলমান	...	...	৯০
২৬।	দেববিগ্রহ ভঙ্গক গজনীর মহম্মদ	...	...	৯৩
২৭।	মহম্মদ ঘোরী	...	...	৯৭
২৮।	আফগান বা পাঠান রাজগণ	...	...	১০১
২৯।	দাসরাজ-বংশ	...	...	১০৪
৩০।	খিলিজি বংশ	...	...	১১১
৩১।	টোগলক বংশ	...	...	১১৬
৩২।	তৈমুর (the Lame) বা পঙ্খ	...	...	১১৯
৩৩।	তৈমুরের পরবর্তী ভারতের অবস্থা	...	...	১২২
৩৪।	বাহমণি ও বিজয়নগর রাজ্য	...	...	১২৫
৩৫।	দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজ্য	...	...	১২৮
৩৬।	মোগল সম্রাট্	...	...	১৩২
৩৭।	বাবর	...	...	১৩৩
৩৮।	হুমায়ুন	...	...	১৪১
৩৯।	শূর রাজগণ	...	...	১৫১
৪০।	আকবর	...	...	১৫৫
৪১।	জাহাঙ্গীর	...	...	১৭২
৪২।	প্রাসাদ-নির্মাতা শাজাহান	...	...	১৭৮
৪৩।	আওরঙ্গজেব	...	...	১৮৩

ইংরেজ রাজত্ব ।

৪৪।	ভারতের সহিত ইউরোপের প্রথম বাণিজ্য	...	১৯১
৪৫।	সম্মিলিত ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানী	...	১৯৪

২৪৬।	শিবজির অভ্যুত্থান ...	...	...	১৯৭
৪৭।	মোগল সাম্রাজ্যের পতন ...	...	...	২০৪
৪৮।	মহারাষ্ট্রা রাজ্যের উৎপত্তি ...	...	...	২০৬
৪৯।	নাদির শা ...	...	...	২১২
৫০।	ইংরেজ ও ফরাশিদিগের মধ্যে সংগ্রাম ...	...	...	২১৪
৫১।	ক্লাইব—আরকোট অবরোধ ...	...	...	২১৬
৫২।	কলিকাতার অন্ধকূপ ...	...	...	২২২
৫৩।	পলাশীর যুদ্ধ ...	...	...	২২৪
৫৪।	ফরাশিদিগের অধঃপতন ...	...	...	২২৭
৫৫।	মিরজাফরের রাজত্ব ...	...	...	২৩০
৫৬।	মিরকাশিম ...	...	...	২৩২
৫৭।	লর্ড ক্লাইব ...	...	...	২৩৭
৫৮।	আহম্মদ শা আবদালি ...	...	...	২৪০
৫৯।	মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ...	...	...	২৪৩
৬০।	হায়দর আলি ...	...	...	২৪৫
৬১।	ওয়ারেন হেস্টিংস ...	...	...	২৪৯
৬২।	ওয়ারেন হেস্টিংস—১ম গবর্ণর জেনেরেল ...	...	...	২৫২
৬৩।	মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ ...	...	...	২৫৫
৬৪।	মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ ...	...	...	২৫৮
৬৫।	বোর্ড অব্ কন্ট্রোল বা শাসন-সমিতি ...	...	...	২৬০
৬৬।	লর্ড কর্ণওয়ালিস—২য় গবর্ণর জেনেরেল ...	...	...	২৬২
৬৭।	সার জন শোর ...	...	...	২৬৬
৬৮।	মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি ...	...	...	২৬৮
৬৯।	ঐ ...	...	...	২৭৪
৭০।	ঐ ...	...	...	২৭৭

৭১।	লর্ড কর্ণওয়ালিস্, সার জর্জ কলো, লর্ড মিণ্টো ...	২৮২
৭২।	লর্ড হেষ্টিংস ...	২৮৫
৭৩।	ঐ ঐ ...	২৯০
৭৪।	লর্ড আমহার্ট ...	২৯২
৭৫।	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ...	২৯৫
৭৬।	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং প্রতিনিধি গবর্নর জেনেরেল সার চার্লস্ মেট্কাফ্ ...	৩০০
৭৭।	লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ...	৩০৫
৭৮।	লর্ড এলেনবরো ...	৩০৯
৭৯।	লর্ড হাডিঞ্জ ...	৩১২
৮০।	লর্ড ডালহৌসি ...	৩১৪
৮১।	ঐ ঐ ...	৩১৯
৮২।	লর্ড ক্যানিং ...	৩২২
৮৩।	ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন ভারত—১ম পঞ্চ ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি ...	৩৩০
৮৪।	সপ্ত রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় ...	৩৩৪
	আসাম বিভাগ।	
ক।	কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ...	৩৪৪
খ।	কোচারি আধিপত্য ...	৩৪৯
গ।	আহম আক্রমণ ও আহম-উপনিবেশ ...	৩৫২
ঘ।	কাচাড় ও কাচাড়ি রাজ্য ...	৩৫৪
ঙ।	শা জেলাল কর্তৃক শ্রীহট্টের মুসলমান ধর্মগ্রহণ ...	৩৬০
চ।	মিরজুম্মা কর্তৃক আসাম আক্রমণ ...	৩৬৬
ছ।	বর্মা কর্তৃক আসাম আক্রমণ ও আসামে ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তন ...	৩৭৪

BENGALI
HISTORY OF INDIA

BY

E. MARSDEN, B A.

Inspector of Schools, Central Circle, Madras (Retired)

AND

RAI K. P. GHOSH, BAHADUR, C. I. E.

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ই. মার্শডেন, বি.এ.

এবং

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি. আই. ই.

MACMILLAN & CO., LIMITED
LONDON, BOMBAY AND CALCUTTA
1909

All rights reserved



PRINTED BY R. DUTT
HARE PRESS

46, BECHU CHATTERJEE STREET, CALCUTTA

সূচী ।

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
১। আৰ্য্যজাতি	১
২। বৈদিক যুগ	৫
৩। উত্তর-ভারতে আৰ্য্যদিগের বিস্তৃতি ...	৮
৪। পরবর্তী বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ ...	১১
৫। রামায়ণ	১৪
৬। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ	২১
৭। দ্রাবিড় সম্প্রদায়	২৪
৮। প্রাচীন হিন্দু-যুগ—জাতিভেদ	২৬
৯। পুরাতন হিন্দু-রাজ্য	৩২
১০। পুরাতন হিন্দু-যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান... ..	৩৬
১১। বুদ্ধ	৪১
১২। বৌদ্ধ ধর্ম	৪৬
১৩। জৈন সম্প্রদায়	৫০
১৪। ভারতে গ্রীক	৫২
১৫। চন্দ্রগুপ্ত	৫৫
১৬। বৌদ্ধযুগের প্রধান প্রধান রাজা ও রাজ্য ...	৬০
১৭। মৌর্য্যরাজ—অশোক	৬১
১৮। ইণ্ডো সিথিয়ান	৬৯
১৯। গুপ্তরাজাদিগের সাম্রাজ্য	৭০
২০। হুন	৭২
২১। বৌদ্ধযুগে ভারতের অবস্থা	৭৩

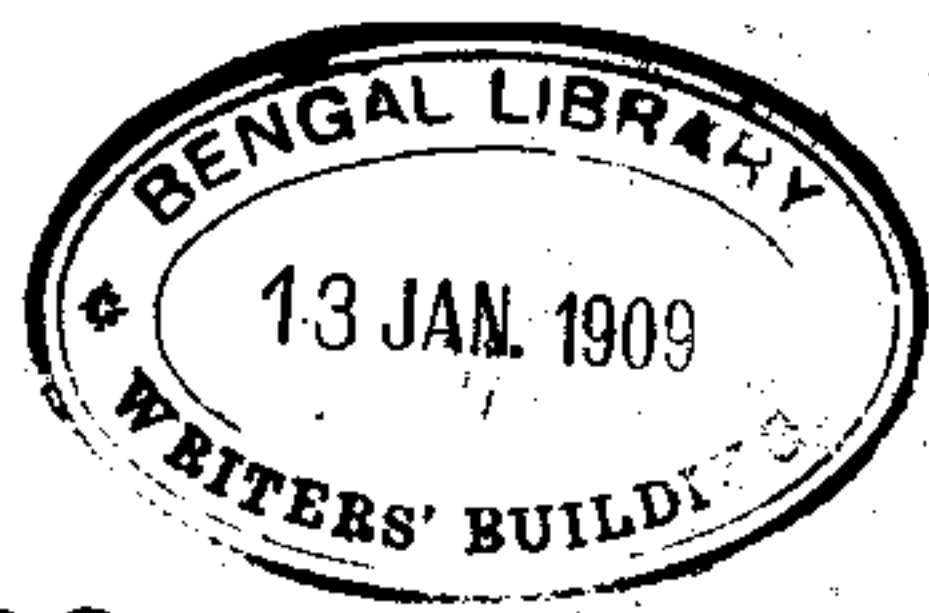
২২।	পুরাণ	...	...	৭৯
২৩।	পৌরাণিক যুগের হিন্দু উপদেষ্টা	...	...	৮০
২৪।	রাজপুত	...	...	৮৫
২৫।	মুসলমান	...	...	৯০
২৬।	দেববিগ্রহ ভঙ্গক গজনীর মহম্মদ	...	...	৯৩
২৭।	মহম্মদ ঘোরী	...	...	৯৭
২৮।	আফগান বা পাঠান রাজগণ	...	...	১০১
২৯।	দাসরাজ-বংশ	...	...	১০৪
৩০।	খিলিজি বংশ	...	...	১১১
৩১।	টোগলক বংশ	...	...	১১৬
৩২।	তৈমুর (the Lame) বা পঙ্খ	...	...	১১৯
৩৩।	তৈমুরের পরবর্তী ভারতের অবস্থা	...	...	১২২
৩৪।	বাহমণি ও বিজয়নগর রাজ্য	...	...	১২৫
৩৫।	দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজ্য	...	...	১২৮
৩৬।	মোগল সম্রাট্	...	...	১৩২
৩৭।	বাবর	...	...	১৩৩
৩৮।	হুমায়ুন	...	...	১৪১
৩৯।	শূর রাজগণ	...	...	১৫১
৪০।	আকবর	...	...	১৫৫
৪১।	জাহাঙ্গীর	...	...	১৭২
৪২।	প্রাসাদ-নির্মাতা শাজাহান	...	...	১৭৮
৪৩।	আওরঙ্গজেব	...	...	১৮৩

ইংরেজ রাজত্ব ।

৪৪।	ভারতের সহিত ইউরোপের প্রথম বাণিজ্য	...	১৯১
৪৫।	সম্মিলিত ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানী	...	১৯৪

২৪৬।	শিবজির অভ্যুত্থান ...	...	...	১৯৭
৪৭।	মোগল সাম্রাজ্যের পতন ...	...	...	২০৪
৪৮।	মহারাষ্ট্রা রাজ্যের উৎপত্তি ...	...	...	২০৬
৪৯।	নাদির শা ...	...	...	২১২
৫০।	ইংরেজ ও ফরাশিদিগের মধ্যে সংগ্রাম ...	...	...	২১৪
৫১।	ক্লাইব—আরকোট অবরোধ ...	...	...	২১৬
৫২।	কলিকাতার অন্ধকূপ ...	...	...	২২২
৫৩।	পলাশীর যুদ্ধ ...	...	...	২২৪
৫৪।	ফরাশিদিগের অধঃপতন ...	...	...	২২৭
৫৫।	মিরজাফরের রাজত্ব ...	...	...	২৩০
৫৬।	মিরকাশিম ...	...	...	২৩২
৫৭।	লর্ড ক্লাইব ...	...	...	২৩৭
৫৮।	আহম্মদ শা আবদালি ...	...	...	২৪০
৫৯।	মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ...	...	...	২৪৩
৬০।	হায়দর আলি ...	...	...	২৪৫
৬১।	ওয়ারেন হেস্টিংস ...	...	...	২৪৯
৬২।	ওয়ারেন হেস্টিংস—১ম গবর্ণর জেনেরেল ...	...	...	২৫২
৬৩।	মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ ...	...	...	২৫৫
৬৪।	মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ ...	...	...	২৫৮
৬৫।	বোর্ড অব্ কন্ট্রোল বা শাসন-সমিতি ...	...	...	২৬০
৬৬।	লর্ড কর্ণওয়ালিস—২য় গবর্ণর জেনেরেল ...	...	...	২৬২
৬৭।	সার জন শোর ...	...	...	২৬৬
৬৮।	মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি ...	...	...	২৬৮
৬৯।	ঐ ...	...	...	২৭৪
৭০।	ঐ ...	...	...	২৭৭

৭১।	লর্ড কর্ণওয়ালিস্, সার জর্জ কলো, লর্ড মিণ্টো ...	২৮২
৭২।	লর্ড হেষ্টিংস ...	২৮৫
৭৩।	ঐ ঐ ...	২৯০
৭৪।	লর্ড আমহার্ট ...	২৯২
৭৫।	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ...	২৯৫
৭৬।	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং প্রতিনিধি গবর্নর জেনেরেল সার চার্লস্ মেট্‌কাফ্ ...	৩০০
৭৭।	লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ...	৩০৫
৭৮।	লর্ড এলেনবরো ...	৩০৯
৭৯।	লর্ড হাডিঞ্জ ...	৩১২
৮০।	লর্ড ডালহৌসি ...	৩১৪
৮১।	ঐ ঐ ...	৩১৯
৮২।	লর্ড ক্যানিং ...	৩২২
৮৩।	ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন ভারত—১ম পঞ্চ ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি ...	৩৩০
৮৪।	সপ্ত রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় ...	৩৩৪
	আসাম বিভাগ।	
ক।	কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ...	৩৪৪
খ।	কোচারি আধিপত্য ...	৩৪৯
গ।	আহম আক্রমণ ও আহম-উপনিবেশ ...	৩৫২
ঘ।	কাচাড় ও কাচাড়ি রাজ্য ...	৩৫৪
ঙ।	শা জেলাল কর্তৃক শ্রীহট্টের মুসলমান ধর্মগ্রহণ ...	৩৬০
চ।	মিরজুম্মা কর্তৃক আসাম আক্রমণ ...	৩৬৬
ছ।	বর্মা কর্তৃক আসাম আক্রমণ ও আসামে ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তন ...	৩৭৪



ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

(১)

আর্য্যজাতি ।

১। অতি প্রাচীন কালে ভারতে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদিগের কোন ইতিহাস নাই। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। এই বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্বে, ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, পঞ্চাবে কএক সম্প্রদায় লোক বাস করিতেন। তাহারা দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ। “আর্য্য” অর্থাৎ পূজা, এই নামে তাহারা আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেন। আমরা তাহাদিগকেই “এরিয়ান্” বা “আর্য্যজাতি” আখ্যায় অভিহিত করিলাম।

২। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, এই সকল জাতি, ভারতে আসিবার পূর্বে, তুর্কিস্থান নামক দেশে অবস্থিত ছিলেন। তুর্কিস্থান হইতে তাহারা আফগানিস্থানের মধ্যদিয়া ভারতে অবতরণ করেন। আফগানিস্থান হইতে আসিবার জন্য হিমালয় পর্বতের স্থানে স্থানে যে সকল গিরিপথ আছে, সম্ভবতঃ সেই সকল গিরিপথেই তাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, মূর্তি সুন্দর এবং ললাট প্রসন্ন ও উন্নত ছিল। তুর্কিস্থানের পূর্ব দিকে, মঙ্গোলিয়া দেশে, যে সকল সমতল বা চোটাল-মুখ পীতচর্ম্মা লোক বাস করিত, তাহারা কোন অংশেই ইহাদিগের মত নহে।

৩। তাহারা তুর্কিস্থানের গ্রামে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে বাস করিতেন। রুম, গাভী ও মেঘপাল রক্ষা করা তাহাদিগের এক প্রধান কর্ম্ম ছিল।

তঁাহারা ভূমি চাষ করিয়া গোধূম ও যবের ফসল প্রস্তুত করিতেন এবং মৃত্যু কাটিয়া বস্ত্র বুনন করিতে পারিতেন। কিন্তু লৌহ দ্বারা অস্ত্র নির্মাণ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তঁাহারা জানিতেন না; কিন্তু আঙুনে তামা ও টিন গালাইয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে জানিতেন। উহা পিঙ্গল বর্ণ এক প্রকার পদার্থে পরিণত হইত। তঁাহারা উহাকে পিত্তল বলিতেন। এই পিত্তল দ্বারা তঁাহারা ছুরি ও বর্ম্মের ফলক প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

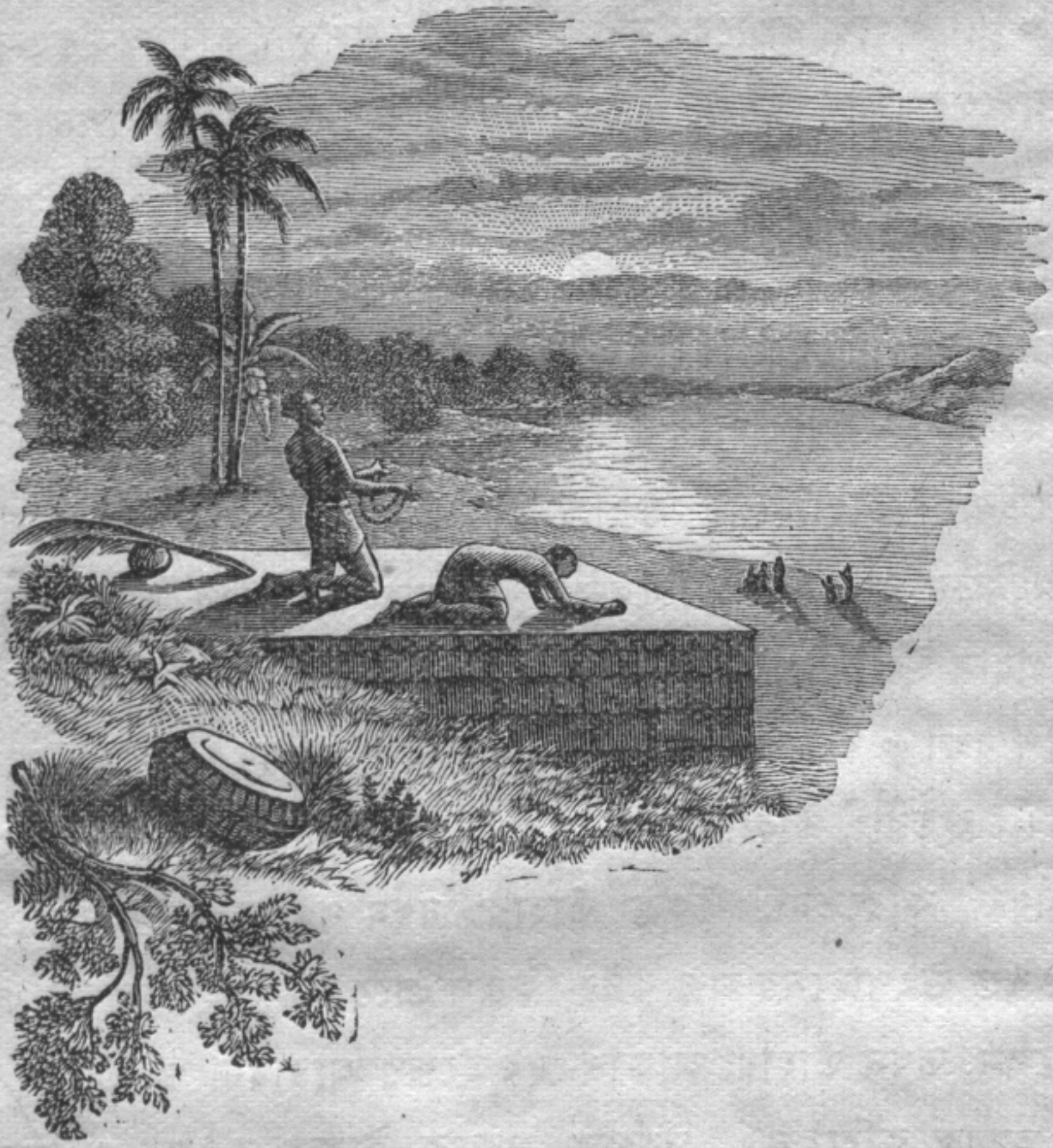
৪। কতকগুলি পরিবার পরস্পর নিকটে নিকটে বাস করিয়া এক একটা দল বা সম্প্রদায়ে পরিণত হইত। প্রত্যেক দলের এক এক জন দলপতি বা নায়ক ছিলেন। তিনি যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, দলভুক্ত অন্য লোকদিগকে রণক্ষেত্রে চালনা করিতেন। ক্রমে এই সকল দল আশ্রয়নে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; বাড়িতে বাড়িতে শেষে এত বৃহৎ হইয়া পড়ে যে, তঁাহাদিগের পুরাতন বাসভূমিতে স্থানান্তর হইয়া উঠে। তঁাহাদিগের বাসভূমি প্রথমতঃ সজল ও উর্ব্বর ছিল, কালক্রমে উহা জলশূন্য ও শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। এই কারণে, তঁাহাদিগের কতিপয় সম্প্রদায় দক্ষিণপশ্চিম দিকে পারশ্ব গমন করেন। পারশ্ব “ইরান” দেশ নামে পরিচিত ছিল। “ইরান” শব্দ “এরিয়ানেরই” রূপান্তর মাত্র। অল্প কএক সম্প্রদায় ভারতে চলিয়া আসেন। যঁাহারা ভারতে আগমন করেন, তঁাহারা দীর্ঘকাল পঞ্জাব-প্রদেশেই অবস্থিত ছিলেন।

৫। যে “এরিয়ান” বা আর্যেরা ভারতে উপনিবিষ্ট হন, আমরা তঁাহাদিগকে ভারতীয় আর্য নামে নির্দেশ করিতে পারি। তঁাহারা লিখিতে পারিতেন না, একথা ঠিক; এই হেতু, তঁাহারা তঁাহাদিগের কোন লিখিত বিবরণ রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তঁাহারা তঁাহাদের উপাস্য দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে স্তুতি-গাথা গান করিতেন। তঁাহারা

মুখে উচ্চারণ করিতে শিখাইতেন । এইরূপে ইহার কতকগুলি লোকের স্মৃতিতে গাথা থাকিয়া শত শত বৎসর পর্য্যন্ত, বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল । অবশেষে লিখিবার সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইলে, স্মৃতি-গাথাগুলি লিখিত হইতে থাকে । লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সকল এখনও হিন্দুদিগের নিকটে আছে । উহাই “বেদ” বা ভারতের পুরাতন জ্ঞান নামে পরিচিত । এই বেদ হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইয়া থাকি ।

৬ । তাঁহারা পঞ্জাবের নদীতটবর্তী প্রদেশে দীর্ঘকাল অবস্থিত রহিয়া, তাঁহাদিগের আড়ম্বরশূন্য, অল্পে পরিতুষ্ট স্মৃথময় জীবন যাপন করেন । তাঁহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ভূমি চাষ করিতেন এবং সেই চষা ভূমিতে স্বর্ণবর্ণ শস্তের ফসল পাকাইয়া গৃহে তুলিয়া লইতেন । গোধূম ও যবই তাঁহাদিগের প্রধান শস্ত ছিল । তাঁহারা তাঁহাদিগের উপাস্ত বস্তুকে দেব,—অর্থাৎ দীপ্তিশীল বা আলোকময় এই আখ্যায় অভিহিত করিতেন । তাঁহাদিগের উপাস্ত দেবতা প্রোজ্জলমূর্তি ও তাঁহাদিগের প্রতি নিত্য বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন । ভারতে আসিবার পূর্বে, তাঁহারা শীতপ্রধান উত্তর দেশে বসতি করিতেন । তখন তাঁহাদিগের শারীরিক উত্তাপ রক্ষা ও রক্ষন কার্য্যের জন্য আগুন ও তাপের একান্ত প্রয়োজন ছিল । সুতরাং, তাঁহারা তখন প্রধানতঃ অনলের অধিষ্ঠাতা অগ্নিদেবের আরাধনা করিতেন । কিন্তু তাঁহারা যখন পঞ্জাবে আগমন করিলেন, এবং শস্ত উৎপাদনের জন্য বৃষ্টির কিরূপ প্রয়োজন, ইহা অনুভব করিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা আকাশ-দেব ইন্দ্রের আরাধনা ও তাঁহার স্মৃতি গান আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা বজ্রকে ইন্দ্রের কণ্ঠস্বর ও বিদ্যুতের চমককে তাঁহার বর্ষাফলক মনে করিতেন । ইন্দ্র সেই বর্ষা দ্বারা কাল-মেঘের বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীর শস্তক্ষেত্রে বৃষ্টির ধারা বড়াইয়া দেন

৭। মৃত্যুর পরে, তাঁহাদিগের আত্মা শূন্য-পথে উর্দ্ধদিকে উথিত হইয়া, আকাশস্থিত আলোকময় স্মৃৎধামে গমন করিবে, আর্যেরা এই তত্ত্বে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই উর্দ্ধধামে কোন ক্লেশ বা কোন দুঃখ নাই; আলোক ও আনন্দ চির-বিরাজমান। সেখানে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর কখন বিচ্ছেদ ঘটে না। তাঁহারা সেই আলোকময় উর্দ্ধধামের অধিপতি বা রাজাকে যম নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই যমরাজই মৃত ব্যক্তিদিগের বিচারকর্তা।



আর্য্যদিগের সূর্য্য উপাসনা।

মস্তকোপরি বিস্তৃত নীলবর্ণ আকাশকে তাঁহারা বরুণদেব বলিতেন। বরুণের নিকট প্রার্থনা করা হইত। তাঁহারা সূর্য্য, সবিতা বা উজ্জল রবির

উপাসনা করিতেন । সমস্ত স্থান বাপিয়া যে বাতাস বিদ্যমান আছে, উহাকে বায়ুদেব, বজ্রনির্নাদিত কাল-মেঘকে রুদ্রদেব এবং দিবসের লোহিতবর্ণ প্রভাতকে উষা বলা হইত । ইহাদিগের উদ্দেশ্যেও তাঁহারা স্তুতিগাথা গাইতেন ।

৮ । ভারতীয় প্রাচীন আৰ্য্যদিগের মধ্যে কোনরূপ জাতিভেদ এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ দেবমন্দির বা দেববিগ্রহ ছিল না । শস্ত্র ও মাংস উভয়ই তাঁহাদিগের ভোজ্য ছিল । তাঁহারা সোমলতার রস দ্বারা প্রস্তুত, এক প্রকারের মদ্য পান করিতেন । এক্ষণে যে সকল হিন্দু ভারতবর্ষে বাস করেন, তাঁহারা অনেক অংশেই সেই কালের আৰ্য্যদিগের মত নহেন ।

(২)

বৈদিক যুগ ।

খৃষ্টের পূর্ব ২০০০—১৫০০ ।

১ । আৰ্য্যেরা যে সময়ে পঞ্জাবে আগমন করেন, তখন পঞ্জাব অরণ্য-ময় ছিল । আৰ্য্যদিগের বহু পূর্বে, যে সকল লোক ভারতে আসিয়াছিল, আৰ্য্যেরা আসিয়া সেই সকল লোক দ্বারা পঞ্জাবের বন-ভূমি পরিপূর্ণ দেখিতে পান । ভারতের সেই আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে বহু সম্প্রদায় বা দল ছিল । তাহাদিগের অনেক সম্প্রদায়ের নাম পর্যাণ্ডও যে এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । আৰ্য্য-কবিরা তাহাদিগের সম্বন্ধে বেদে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ভিন্ন, তাহাদের সম্পর্কে আর কোথাও কিছু জানিবার উপায় নাই । বেদে তাহাদিগকে দম্বা বা দাস নামে অভিহিত করা হইয়াছে । দাস শব্দে প্রথমতঃ এদেশের পুরাতন অধিবাসীদিগকে বুঝাইত ; কিন্তু পরিশেষে এই শব্দের অর্থ দেবাদাস বা ভতা হইয়া পড়ে ।

আর্যেরা এই সকল আদিম অধিবাসীর কতকগুলিকে যে আপনাদিগের দাস-শ্রেনী ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পুরাতন বৈদিক গাথা বা স্তোত্রে তাহাদিগকে কৃষ্ণ-কায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদিগের শরীরের বর্ণ কদর্যা, নাসিকা চোটাল ছিল। তাহারা আমমাংস ভক্ষণ করিত এবং দেব-ধর্ম কিছুই মানিত না, বেদে তাহাদিগের এইরূপ বর্ণনা আছে।

২। আর্যজাতি ক্রমে ক্রমে সমস্ত পঞ্জাবে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার করেন; দস্যুদিগকে তাড়াইয়া দেন; এবং শস্তক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে গোধূম ও যবের ফসল করিতে আরম্ভ করেন। আর্যেরা যে কেবল ভারতের পুরাতন অধিবাসীদিগের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতেন, এমন নহে; তাহাদিগের আপনাদিগের মধ্যেও পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। আর্যেরা সকলে একদেহবদ্ধরূপে ভারতে আসেন নাই। তাহারা, একের পরে অণ্ডে, ভিন্ন ভিন্ন বংশ ও সম্প্রদায়ে, এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারা প্রথমে আসিয়া পঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহারা অবশ্যই তাহাদিগের সুন্দর গৃহ ও উর্বর ভূমিটুকু, কঠোর কলহ ব্যতীত, পরবর্তীকে সহজে ছাড়িয়া দেন নাই, ইহা নিশ্চিত। আর্য জাতিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদের কথা বেদেও উল্লিখিত আছে।

৩। কত কাল পূর্বে প্রাচীন আর্যপরিবার পঞ্জাবে আগমন করিয়াছিলেন, এবং সিন্ধুদের সমস্ত উপত্যকায় বিস্তৃত হইয়া পড়িতে তাহাদিগের কত সময় অতীত হইয়াছিল, আমরা নিশ্চিতরূপে তাহা অবগত নহি। বিজ্ঞ লোকেরা অনুমান করেন যে, প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে, প্রথম আর্যেরা খাইবার পাসের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞ লোকেরা ইহাও অনুমান করেন যে, সিন্ধুদের পূর্বতম উপনদীর তট পর্যন্ত অধিকার

বিস্তার করিতে আৰ্য্যদিগের সম্ভবতঃ ৫০০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল ।
সিন্ধু নদের পূর্বদিকে সর্বশেষ যে উপনদীটি প্রবাহিত ছিল, উহার
তদানীন্তন নাম সরস্বতী ।

৪। পূর্বকার দৃশ্যতী এইক্ষণকার ঘাগর নদী ও পূর্বতন
সরস্বতী এক্ষণকার সারস্বতি । এই দুই নদীর মধ্যবর্তী, সিন্ধুনদের
পূর্ব উপত্যকাটি দৈর্ঘ্যে ৬০ মাইল ও প্রস্থে ২০ মাইল । এই ভূমিখণ্ড
বড়ই উর্বর ও সমৃদ্ধ ছিল । আৰ্য্যেরা এই স্থানটিকে শেষে “ব্রহ্মাবর্ত”
বা ঈশ্বরনিবাস নামে অভিহিত করেন । তাঁহারা বলিতেন, এই
স্থানের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সমস্তই বিপুলতম ও সর্বোৎকৃষ্ট ।

৫। আৰ্য্যেরা যে সময়টা পঞ্জাবে ছিলেন, সেই ৫০০ বৎসর কালকে
আমরা বৈদিক যুগ বলিতে পারি । এইক্ষণ চারিখানি গ্রন্থ বেদনামে
পরিচিত দেখা যায় । কিন্তু এই চারি খানির মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম
ও সর্বপ্রধান । অতীত তিন খানি অনেক পরে রচিত হইয়াছে । অপর
তিন খানি বেদের বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব । ঋগ্বেদ অর্থ
স্তুতিগাথা বা স্তোত্র বেদ । জগতে ইহার মত প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই ।
ইহাতে ইন্দ্র, অগ্নি ও অতীত আৰ্য্যদেবগণের ১০২৮টি স্তোত্র বা
স্তুতিগাথা আছে । পিতা দিনের পর দিন ঈশ্বরের স্তুতি গান করিতেন ।
এই অনুষ্ঠানে তাঁহাকর্তৃক প্রতিদিন, বারংবার, একই শব্দ বা কথার
পুনরাবৃত্তি হইত । তাঁহার ছোট ছোট পুত্রগণ তাঁহার সেই স্তুতি-
পাঠ শ্রবণ করিত এবং তিনি যাহা বলিতেন, শুনিয়া শুনিয়া সেই সকল
শব্দ শিখিয়া রাখিত । তাহারাও আবার সময়ে তাহাদিগের পুত্রগণের
নিকট পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষের অনুকরণে উহার ঐরূপ আবৃত্তি করিত ।
এই প্রণালীতে স্তুতিগাথা ও প্রার্থনাগুলি, একযুগ হইতে যুগান্তরে,
যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল ।

৬। অতি পুরাতন সময়ে, আৰ্য্যদিগের ভারতে আগমনের অনেক

পূর্বে, পুরাতন আৰ্য্য ঋষি অথবা কবিগণ যে সকল স্তুতিগাথা বা স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকলের কতক লোপ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা অবশিষ্ট ছিল, ঋগ্বেদে তাহা গ্রথিত আছে। ঋগ্বেদের শেষ সূক্তগুলিও, সম্ভবতঃ খৃষ্টের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বের রচিত। ইহাও অনুমিত হয় যে, আৰ্য্যদিগের অনেকে সিন্ধু-নদের পূর্বতম উপত্যকা, বা ব্রহ্মাবর্ত ত্যাগ করিয়া যাইবার আগে, ঐ সকল সূক্তের রচনা হইয়াছিল। এই সকল সূক্ত বা স্তোত্রে পুনঃ পুনঃ কেবল সিন্ধুনদের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের শেষ সূক্ত বা স্তুতিগাথায় দুই বার মাত্র গঙ্গানদীর নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭। পুরাকালীন ভারতীয় আৰ্য্যদিগের বিষয়ে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা আমরা ঋগ্বেদ হইতেই জানিতে পাই। ইহা যে ভাষায় লিখিত, সে ভাষাটিকে আমরা বৈদিক ভাষা বলিতে পারি। এই ভাষা যুগযুগান্ত পর্য্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষিত হিন্দুর পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, বেদ ইংরেজী ও অগ্ৰাণ্ড ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। বেদের স্তোত্রগুলি অতি প্রাচীন সময়ে রচিত হইয়া থাকিলেও, এক্ষণে বেস পোর্কাপাথ্য শৃঙ্খলার সহিত আমরা উহা প্রাপ্ত হইতেছি। পূর্বে স্তোত্রগুলি অবশ্যই একরূপ শৃঙ্খলার সহিত গ্রথিত ছিল না। পরবর্তী ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত উহার সংখ্যানির্দেশও হয় নাই।

(৩)

উত্তর ভারতে আৰ্য্যদিগের গতি ও বিস্তৃতি ।

খৃঃ পূঃ ১৫০০—১০০০

১। আৰ্য্যেরা পঞ্জাব প্রদেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাঁহাদিগের প্রাণপ্রিয় মনোরম ভূমি ব্রহ্মাবর্তে বসতি করিলেন। ইহার পরে, তাঁহারা দেখিলেন যে, ব্রহ্মাবর্তের বহুদূর

পূর্বভাগে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উর্বর ও উষ্ণ প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রান্তরে গঙ্গা ও যমুনা নদী প্রবাহিত। এই সময়ে জনসংখ্যার তাঁহারা এত বাড়িয়া পড়িয়াছিলেন যে, সিন্ধু নদের উপত্যকার আর তাঁহাদিগের সকলের ভাল রূপ বাসোপযোগী স্থান হইয়া উঠিত না। বিশেষতঃ, আৰ্য্যজাতির নূতন নূতন দল পশ্চাৎ দিকে আসিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আরও সম্মুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতেছিল। তাঁহারা দক্ষিণ দিকে যাইতে পারেন না। দক্ষিণে চারি শত মাইল বিস্তৃত বালুকাময় বিশাল মরুভূমি। অতএব, তাঁহাদিগের অনেকে যমুনা পার হইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে, সমগ্রদেশ বহু জাতিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহারা বহুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আপনাদিগের পথ করিয়া লইলেন। তাঁহারা জঙ্গল কাটিলেন এবং বাসগ্রাম নির্মাণ করিলেন। এই সকল গ্রামই পরবর্তী যুগে বড় বড় নগরে পরিণত হইয়াছিল।

২। তাঁহাদিগের অধিক সংখ্যক লোক গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর উপত্যকার অধিষ্ঠিত হইলেন। আৰ্য্যদিগের অনেকগুলি কাব্য ও সঙ্গীত এই স্থানে রচিত হয়। অবশেষে তাঁহারা এই স্থানের নাম রাখিলেন,—ব্রহ্মর্ষি দেশ বা ব্রহ্মগায়কের রাজ্য।

৩। বোধ হয় যেন, প্রথমে তাঁহারা সোজা পূর্বমুখে যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী দেশে, উজান দিকে অবস্থিত রাজ্যের মধ্য দিয়া, প্রায় ৩০০ মাইল অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন। যমুনার উজানে, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নামে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক এক নগর স্থাপন করেন। দীর্ঘকাল পরে, এই নগরই দিল্লী নাম ধারণ করিয়া উত্তর ভারতের সর্বপ্রধান রাজধানী হইয়াছিল। গঙ্গার উজান প্রায় ৬০ মাইল দূরে তাঁহারা হস্তিনাপুর নামক আরও একটি নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে বোধ হয় যেন, তাঁহাদিগের কতেকে ঐ দুই নদীর মধ্যস্থিত

একটু দক্ষিণ দিকে সরিয়া পড়েন। প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণ দিকে তাঁহারা অপর দুটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন ;—যমুনার তটে আগ্রা আর গঙ্গার তটে কাম্পিল্য। এই কাম্পিল্য নগরই এখন কনোজ নামে পরিচিত। ক্রমে আরও দক্ষিণে নামিতে নামিতে তাঁহাদিগের কতকে, অবশেষে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে তাঁহারা তাঁহাদিগের পঞ্চম মহানগর প্রয়াগের ভিত্তি স্থাপন ও প্রয়াগ নির্মাণ করেন। প্রয়াগ এক্ষণে এলাহাবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

৪। আর্যদিগের এই ভূমি খণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে, ন্যূন-কল্পে অনুমান প্রায় ৩০০ বৎসর অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রায় ১৫০০ হইতে প্রায় ১২০০ সন পর্যন্ত সময় লাগিয়াছিল। এই সময়েও আর্যগণ-কর্তৃক বৈদিক দেবতারই উপাসনা চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার যে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৫। আর্যেরা যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী দেশে কিছুকাল বাস করিলে পর, ভিন্ন ভিন্ন দলপতির অধীন তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দল হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও গঙ্গার মধ্যস্থিত দেশ দিয়া আরও নূতন নূতন বসতি স্থাপনার্থ পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। গোমতী, গোগ্রা, গণ্ডক এবং কুশী প্রভৃতি যে সকল নদী গঙ্গাপ্রবাহের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাঁহারা একে একে সেইগুলি পার হইয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা গঙ্গার দক্ষিণেও চম্বল ও শোণ নদীর উপত্যকা দিয়া বিক্ষ্য পর্বত পর্যন্ত গমন করিলেন এবং হিমালয় ও বিক্ষ্য পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগকে মধ্যদেশ নামে অভিহিত করিয়া লইলেন।

৬। উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত ভারত ও পাঞ্চাল বংশ ভিন্ন, আরও কতিপয় প্রধান প্রধান বংশের নাম আমরা শুনিতে পাই। কোশলেরা

নামে পরিচিত । এই রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা । এক্ষণে ত্রিহৃত বা উত্তরবিহার নামে পরিচিত গণ্ডক নদীর পূর্বদিগ্বর্তী ভূভাগে বিদেহগণ বাস করিতেন । তাঁহাদিগের প্রধান নগর মিথিলা । যে স্থানে গোমতী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার অনতিদূরে গঙ্গার তট দিয়া কানীবংশীয়েরা বাস করিতেন । তাঁহাদিগের প্রধান নগর কানী । এই কানী এক্ষণে বারাণসী বা বেনারস্ নামে অভিহিত হইতেছে । কানী হিন্দুদিগের একটি প্রধান ও পবিত্র তীর্থস্থান ।

৭ । দেশের এই অংশে বিজয়লাভ করিতে, বোধ হয়, আৰ্য্যদিগের প্রায় দুই শত বৎসর কাল অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রায় ১২০০ হইতে প্রায় ১০০০ সন পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হইয়াছিল ।

(৪)

পরবর্তী বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ ।

১ । ঋগ্বেদের মন্ত্র বা সূক্তগুলিকে, আমরা যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে এক্ষণে প্রাপ্ত হইতেছি, সেই শৃঙ্খলা অনুসারে, সম্ভবতঃ, এই যুগেই ঐ সকল লিখিত হয় । অতীত দুটি বেদও, এই সময়েই রচিত হইয়াছিল । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদ হিন্দু গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে প্রাচীনতম ; এবং ইহার ১০২৮ সংখ্যক স্তোত্র বা সূক্ত খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরেরও বহু পূর্ববর্তী অতি পুরাতন যুগের ঋষি, জ্ঞানী বা আধ্যাত্মিকগণ কর্তৃক রচিত । ইহাই আৰ্য্যদিগের বাইবেল বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ ছিল । অতি প্রাচীন সময়ে, আৰ্য্যদিগের মধ্যে কোন যাজক বা ঋত্বিক ছিলেন না । দেব সমীপে কোন প্রাণী বলিদান করা হইত না,—দেবতাদিগকে মাত্র সোমরস ও সামান্ত তণ্ডুলাদি শস্যের বলি-উপহার প্রদান করা হইত ।

এবং তত্ত্বদেশীয় জাতি ও সম্প্রদায় সমূহের সহিত যত মিশিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের ধর্ম্মে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল । বলিদানের প্রথা প্রবর্তিত ও যাজকশ্রেণী গঠিত হইল । যজ্ঞ ও বলিদানের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং উহা সম্পন্ন করা, যাজকদিগের কর্তব্য হইয়া পড়িল । ক্রমে অল্প দুটি বেদও রচিত হইল । দ্বিতীয় বা যজুর্বেদের নাম যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন । যজুর্বেদ, ঋগ্বেদের কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা মন্ত্র এবং যজ্ঞ ও বলি ইত্যাদির কতকগুলি নিয়ম সংগৃহীত হইয়া প্রস্তুত হইল । বলিদানের সময়, যজুর্বেদের মন্ত্র এক শ্রেণীর যাজক বা ঋত্বিকগণ কর্তৃক উচ্চারিত হইত । এই মন্ত্রগুলি প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই নহে । যজুর্বেদকে আর্যাদিগের প্রার্থনা পুস্তক বলিলে বলা যাইতে পারে । তৃতীয় বেদের নাম সামবেদ । ইহাতেও ঋগ্বেদেরই কতকগুলি স্তুতিগাথা বা স্তোত্র গ্রথিত আছে । যজ্ঞ অনুষ্ঠান কালে অল্প আর এক শ্রেণীর যাজক কর্তৃক এই সকল স্তোত্র পাঠ বা স্বর-সংযোগে গান করা হইত । ইহা আর্যাদিগের স্তুতিগাথা বা স্তোত্র গ্রন্থ । ইহার অনেক কাল পরে, চতুর্থ বেদ রচিত হয় । এই গ্রন্থের নাম অথর্ববেদ । অথর্ববেদ কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা শ্লোকের সংগ্রহ মাত্র । এই সকল শ্লোক পাঠে সকল রকম আপদ বিপদ দূরে অপসারিত হয় বলিয়া মনে করা হইত ।

ব্রাহ্মণ ।—দীর্ঘকাল পরে, আঘ্যেয়া যমুনা ও গঙ্গার উপত্যকায় অধিকতর প্রসারিত হইয়া পড়িলে, ব্রাহ্মণ যাজকেরা সংখ্যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহাদিগের ক্ষমতাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিল । তাঁহারা যজ্ঞকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও উহা সম্পন্ন করিতেন । ব্রাহ্মণযাজকেরা ক্রমেই বজ্রাদির অনুষ্ঠান-বিষয়ে নূতন নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে থাকিলেন । চারি বেদ এই সকল নিয়মাবলীর পক্ষে যথেষ্ট হইল না । প্রত্যেক যাজক বা ঋত্বিকের কি কর্তব্য, তাহা অধিকতর বিশদরূপে নির্দেশ করিয়া দিবার

নিমিত্ত, তাঁহারা প্রতি বেদের সঙ্গে বহুসংখ্যক বিধিব্যবস্থা যোজনা করিয়া লইলেন । এই সকল বিধিব্যবস্থাকে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হইল । বৈদিক সূক্ত বা স্তোত্র কিরূপে পাঠ করিতে হইবে, ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে যজ্ঞকদিগের প্রতি তদ্বিষয়ক উপদেশ লিখিত হইয়াছে । সোম-যজ্ঞে যাঁহারা সামগান করেন, সামবেদের ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ কল্পিত । যাঁহারা স্বহস্তে যজ্ঞে আহুতি প্রদান বা হোম করিতেন, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠান-প্রণালীর নির্দেশার্থ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হইয়াছে । অথর্ববেদের ব্রাহ্মণে উক্ত বেদোক্ত সূক্ত বা শ্লোকগুলির বিশদ ব্যাখ্যা আছে ।

আরণ্যক ।—এই সকল ব্রাহ্মণের কতকের নাম রাখা হইল আরণ্যক । মনুষ্য-নিবাস বা মনুষ্য-সমাগম হইতে বহুদূরে যাইয়া যে সকল পুণ্যাত্মারা অরণ্যে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের জ্ঞাত কতকগুলি নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা প্রণীত হয় । এই গুলিই আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ । কেবল প্রথম বেদ ঋক্ ও দ্বিতীয় বেদ যজুর নামে আরণ্যকের নামকরণ হইয়াছে । সাম ও অথর্ববেদের সহিত কোন আরণ্যকের সম্পর্ক ঘটে নাই ।

উপনিষদ ।—এইরূপ অনুমান হয় যে, ব্রাহ্মণসমূহের অশেষ নিয়মাবলী ও ঋত্বিকদিগের অনন্তকোটি ধর্ম্মাচার ও পূজাদি ধর্ম্মোৎসবের অনন্ত অনুষ্ঠানে, সেই কালের হিন্দুগণ শেষে একান্ত ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন । ক্রমে তাঁহারা আপনাদিগের কাছে ও পরস্পরের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন যে, চতুর্দিকে যে অসীম জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহার মূল কে, ইহার আদি কারণ কি ? তাঁহারাই বা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায় চলিয়া যাইতেছেন ? ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন হিন্দু ঋষি বা জ্ঞানীদিগের সিদ্ধান্ত ও অনুমাননিচয়ই উপনিষদনিবহে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

উপনিষদ সমূহ খৃষ্টের পূর্ববর্তী যুগে, ব্রাহ্মণনিচয় রচিত হইবার পরে, রচিত হইয়াছিল । ঋষিরা দেখিতে পান যে, তাঁহাদিগের উপাস্ত সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণও কোন মহতী সত্তা, ব্যক্তি বা আত্মার শক্তি হইতে উৎপন্ন পদার্থ বা বস্তু । তাঁহারা বুঝিলেন যে, একই মহাসত্তা হইতে, সমস্ত পদার্থের আবির্ভাব বা উদয় হইয়াছে ; এবং অবশেষে সেই মহাসত্তারই অংশরূপে সমস্ত আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইবে বা লয় প্রাপ্ত হইবে । তাঁহারা এই মহতী সত্তাকে পরম আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর রূপে নির্দেশ করিলেন । সমুদ্র হইতে জলকণা উথিত হইয়া যেমন মেঘে পরিণত ও বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে পতিত হয় ; এবং পৃথিবীতে নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া সেই জলরাশি যেমন অবশেষে ফিরিয়া আবার সেই সমুদ্রেই গমন করে ও সমুদ্রেরই অংশরূপে উহাতেই মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় ; তেমনই সমস্ত পদার্থ জগদীশ্বর হইতে আইসে, এবং শেষে সেই ঈশ্বরেই ফিরিয়া যায় । উপনিষদে এই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

হিন্দুগণ তাঁহাদের প্রাচীন গ্রন্থনিচয়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন । একের নাম শ্রুতি ও অন্তের নাম স্মৃতি । শ্রুতি পূর্ববর্তী ও প্রাচীনতম এবং স্মৃতি পরবর্তী ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক । শ্রুতি অর্থ শ্রুত বা স্বপ্রকাশিত তত্ত্ব । বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, সমস্তই শ্রুতি শ্রেণীভুক্ত । এগুলি স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়া সম্মানিত । স্মৃতি অর্থ যাহা স্মরণে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে অথবা যাহা জনশ্রুতিক্রমে মুখের কথায় কথায় পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে ।

(৫)

রামায়ণ ।

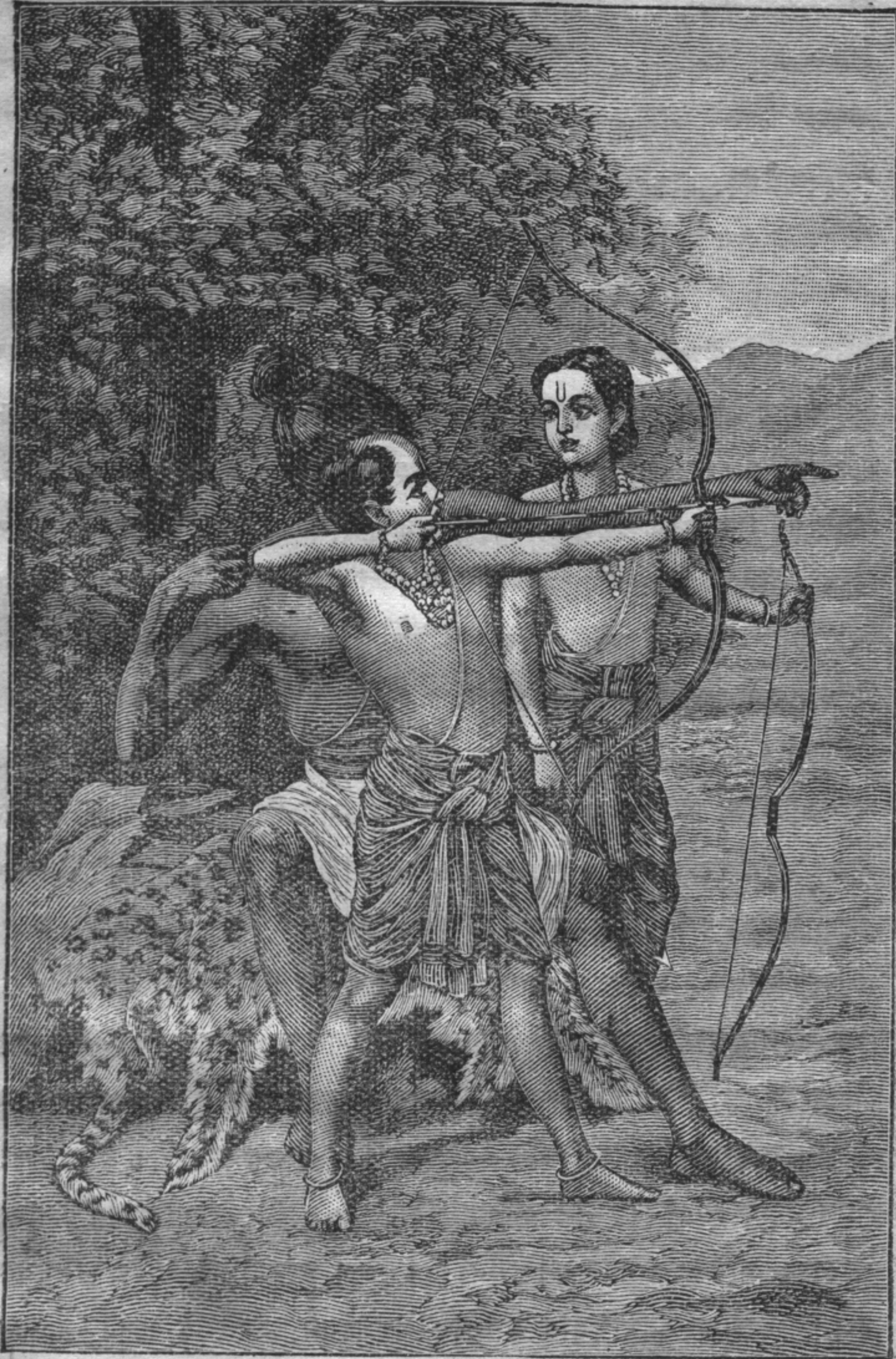
১ । রামের আখ্যানের নাম রামায়ণ । অযোধ্যার রাজা দশরথের

দশরথের সর্বপ্রধানা মহিষী । কোশল্যার গর্ভজাত সন্তান রামই রাজ-
সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী । কিন্তু বৃদ্ধ রাজা দশরথ তাঁহার
কনিষ্ঠা পত্নী স্নন্দরী কৈকেয়ীকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন ।
কৈকেয়ী তাঁহা দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইতে পারিতেন ।
কৈকেয়ী তাঁহার নিজ পুত্র ভরতকে রাজ্য দানের অভিলাষ করিলেন ।
দশরথের তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মণ তাঁহার অন্য এক পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ।

২। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম । চতুর্দিগ্‌বর্তী সমস্ত রাজ্যের মধ্যে
রাজকুমার রাম সর্বাপেক্ষা বলশালী ও সাহসী । তিনি শুধু বলবীৰ্য্য-
সম্পন্ন ও সাহসী বীর ছিলেন এমন নহে, তাঁহার প্রাণটিও সত্যনিরত,
সৎ ও একান্ত মহৎ ছিল । অযোধ্যার লোক তাঁহাকে সর্বাস্তুঃকরণে
ভক্তি করিত ও ভালবাসিত । পিতা তাঁহার সমস্ত পুত্রগণের মধ্যে
রামকে সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন । তিনি তাঁহাকেই আপন
সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ।

৩। অযোধ্যার অনেক দূর পূর্বদিকে, গণ্ডক নদীর পার দিয়া
মিথিলা রাজ্য । মিথিলার রাজা জনক । সীতা রাজা জনকের কন্যা ।
সীতা তৎকালে সমগ্র অর্ধা ভারতে অদ্বিতীয়া রূপসী রাজকুমারী বলিয়া
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

বহু রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ উৎসুক হইলেন । কিন্তু সীতা
যেন আপন স্বামী আপনি নির্বাচন করিয়া লইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে
পিতা জনক সীতার “স্বয়ম্বর” ঘোষণা করিলেন । জনকের গৃহে
তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের একটা অতি প্রকাণ্ড ও গুরুভারাবিত ধনু ছিল ।
যে রাজকুমার এই ধনু নত করিয়া উহাতে গুণ দিতে পারিবেন, সীতা
তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিবেন, এই পণ অবধারিত হইল । যুবক
রাজগণ দলে দলে মিথিলায় আসিতে লাগিলেন, সকলেই সেই মহাধনু
নত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলেন



রামের বাণশিক্ষা।

না । নত করা দূরে থাকুক, ধনুখানি এত গুরুভার যে, তাঁহাদিগের কতকে উহা ধরিয়। তুলিতেও সমর্থ হইলেন না । অবশেষে রাম আসিলেন । তিনি অনায়াসে ধনু নত করিলেন এবং ধনু নত করিয়া উহাতে গুণ দিতে দিতে উহাকে ছুখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন । সীতা রামের গলায় ফুলের মালা দিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন । মহাসমারোহে তাঁহাদিগের বিবাহ হইল । তাঁহারা অযোধ্যায় বাইয়া দশরথের রাজ্যভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

৪ । রাজা দশরথ বৃদ্ধ । তিনি আর বড় অধিকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন না বুঝিয়া, যুবরাজনিরোগ আবশ্যক মনে করিলেন । যুবরাজ, রাজা জীবিত থাকা পর্যন্ত, রাজকাৰ্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতেন । রামের অমুকূলে সকলেই মত দিলেন । পৌর ও রাজন্তবর্গ, মন্ত্রিসভার বয়োবৃদ্ধেরা, এবং সর্বসাধারণ লোক একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধ রাজা রামকে তাঁহার কাছে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং পর দিন প্রভাতেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা করেন, এই কথা বলিলেন । প্রত্যেকেই রামকে ভালবাসিত । রামের রাজ্যাভিষেকসংবাদে সমস্ত নগর আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

৫ । কিন্তু রাণী কৈকেয়ী এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মাটিতে পড়িয়া রহিলেন । রাজা দশরথ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না । অবশেষে, তিনি তাঁহার পুত্র ভরতকে যুবরাজ করিয়া রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্ত বনে পাঠাইবার নিমিত্ত রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া, শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন ।

৬ । বৃদ্ধ রাজা শোকে ও মনস্তাপে একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন ।

তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে নির্বাসিত করিবেন, এ কল্পনাও যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল । অযোধ্যাবাসী সকলেই তাহাদিগের প্রিয়দর্শন, সাহসী, ও যুবক রাজকুমারকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, যে বনবাসের কথা শুনিла, সে-ই ক্রোধে জলিয়া উঠিল । কৌশল্যা রামকে বনে যাইতে নিষেধ এবং গৃহে থাকিবার জন্ত আকুলপ্রাণে অনুরোধ করিলেন । সকলেই বিচলিত, কিন্তু একমাত্র রাম অটল ও অবিচল রহিলেন । তিনি বলিলেন, মহারাজ মাতা কৈকেয়ীকে যে বাক্য দান করিয়াছেন, অবশ্যই সে বাক্য রক্ষা করিতে হইবে । পিতার আজ্ঞা-পালন পুত্রের সর্বপ্রধান কর্তব্য । তিনি একাকীই বনগমনে উৎসুক হইলেন । কিন্তু সীতা কিছুতেই পতিসঙ্গ ছাড়িয়া শূন্যগৃহে থাকিবার পাত্রী নহেন । তিনি বলিলেন, পতি রাজপ্রাসাদেই থাকুন, অথবা জটী-চীরধারী বনবাসীই হউন, পতি যেখানেই গমন করুন না কেন, পতির সঙ্গিনী হওয়াই পত্নীর কর্তব্য । সীতা রামের সঙ্গে বনবাসিনী হইলেন । রামের বৈমাত্র ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের সহচররূপে রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গমন করিলেন ।

৭। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ যমুনার দক্ষিণবর্তী অরণ্যময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন । পরে তাঁহারা বিদ্যাপর্বতের দক্ষিণে মধ্যভারতের অন্তর্গত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাদিগের বনগমনের অল্পকাল পরেই বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইল । কৈকেয়ী মনে করিলেন, তাঁহার পুত্র ভরতই এখন রাজ্যের রাজা হইবেন । কিন্তু ভরত সৎ ও সত্যপরায়ণ ছিলেন, তিনিও রামকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন । তিনি রামকে ফিরাইয়া আনিয়া অযোধ্যার রাজা করিবার নিমিত্ত রামের অনুসরণ করিলেন । কিন্তু রাম কিছুতেই ফিরিয়া আসিলেন না । তিনি বলিলেন, “আমি চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব বলিয়া পিতা বিমাতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং আমিও সেই পিতৃবাক্য স্বীকার



রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গঙ্গাপার হইতেছেন।

করিয়া বনে চলিয়া আসিয়াছি। রাজার পুত্র কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারে না। চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ না হইতে আমি কোন প্রকারেই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পারি না।’ অতএব ভরতকে একাকী ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের জ্ঞাত রাজ্যাগ্রহণ করিলেন না; রামই যে রাজ্যের প্রকৃত রাজা, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, রামের পাছকা সিংহাসনে রাখিয়া, রামের পরিবর্তে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত, অযোধ্যা-রাজ্যের শাসন-কার্য্যে ব্রতী হইয়া রহিলেন।

৮। লঙ্কা দ্বীপের বর্তমান নাম সিলোন। রাবণ নামে লঙ্কায় এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের একাংশ রাবণের শাসনাধীন ছিল। রাম বহুবৎসর দক্ষিণ ভারতের নির্জন অরণ্যে বাস করিলেন। তিনি লক্ষ্মণসহ প্রতিদিন মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন। একটি পরমসুন্দরী আর্য্যরাজ-মহিলা ঐ অঞ্চলের বনভূমিতে আসিয়া বাস করিতেছেন, রাবণ ইহা শুনিলেন। একদিন রাম ও লক্ষ্মণ মৃগয়ার্থ কুটীরের বাহিরে গমন করিলে, রাবণ সীতাকে একাকিনী পাইয়া, বলপূর্ব্বক লঙ্কায় লইয়া গেলেন। রাবণ, সীতাকে ভুলাইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাকে লঙ্কার রাণী করিবার নিমিত্ত, বহুপ্রকারে বহুকঠোর প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সীতা তাঁহার পানে ফিরিয়াও চাহিলেন না। অবশেষে সীতাকে একটা অন্ধকার-ময় কুঞ্জকাননে রক্ষিপরিবেষ্টিতভাবে বন্দির অবস্থায় রাখা হইল।

৯। রাম ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীব নামক পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতনিবাসী এক ক্ষমতাপন্ন রাজার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এই রাজা ও তাঁহার প্রজাগণ কৃষ্ণকায় ও বস্ত্রভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহারা অরণ্যে বাস করিতেন। আর্থ্যেরা এই হেতু, তাঁহাদিগকে বানর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুগ্রীব তাঁহার সেনাপতি হনুমানের অধীন বহুসংখ্যক সৈন্য রামের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীবের সাহায্যে রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কায় যাইয়া রাবণবধ ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলেন।

১০। অবশেষে বনবাসের নির্দিষ্ট সময় চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত হইল। রাম ও সীতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। রাম দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া বহুবৎসর রাজ্য শাসন করেন। প্রাচীন আর্য নৃপতিদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লোকান্তর গমনের পর, তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দুগণ-কর্তৃক আরাধা দেবতারূপে পূজিত হইয়াছেন। রামসীতার দুটি পুত্র ছিল। একটির নাম লব আর একটির নাম কুশ। এখনও দুটি প্রধান রাজপুত্রবংশ লব ও কুশের সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন।

(৬)

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ ।

১। ভারত অথবা কুরুবংশ ও পাঞ্চাল, প্রাচীন কালের এই দুই প্রধান রাজবংশের নাম আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত আসিয়া পহঁ-চিয়াছে। গঙ্গার উজানদিকে গঙ্গার তট দিয়া ভারত বা কুরুবংশের বসতি এবং হস্তিনাপুর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। গঙ্গার নিম্নদিকে পাঞ্চালগণ বাস করিতেন। কাম্পিল্য বা কনোজ তাঁহাদিগের রাজধানী।

২। ভারত বংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ন ছিলেন। এই হেতু তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুকে রাজ্য ছাড়িয়া দেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র; তন্মধ্যে দুর্যোধন সর্বপ্রধান। পূর্ব পুরুষ কুরুর নাম অনুসারে তাঁহাদিগকে কোরব বলা হইত। পাণ্ডু রাজার পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন প্রধান। তাঁহারা পাণ্ডব নামে পরিচিত ছিলেন।

৩। পাণ্ডব ও কোরব রাজকুমারেরা হস্তিনাপুরের রাজ-ভবনে একত্র অবস্থান করিতেন। তাঁহারা এক সঙ্গেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে রাজ্য পাইবেন, কোরব ও পাণ্ডব উভয়ের মনেই এই আশা সমানরূপে বলবতী ছিল। সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রতিনিয়তই পরস্পর বিবাদবিসংবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে পাণ্ডুর মৃত্যু হইল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার শত পুত্রের সাহায্যে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। পাণ্ডব রাজপুত্রেরা দূরে অপসারিত হইয়া, কোন খানে থাকিবার একটু স্থান করিয়া লইবার নিমিত্ত, কিছুকাল নানা রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

৪। এই সময়ে দ্রুপদ পাঞ্চালের রাজা ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁহার কন্যা। দ্রৌপদী দেশপ্রসিদ্ধা সুন্দরী। দ্রুপদরাজা সেই কালের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরার্থ দিন অবধারণ করিলেন। দ্রৌপদী পণ করিলেন যে, যিনি তাঁহার পিতার গুরুভারাস্থিত বৃহৎ ধনুকে শর যোজনা করিয়া একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। বহু রাজকুমার যত্ন করিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কোরবেরাও বিফলমনোরথ হইলেন। অর্জুন এই স্বয়ম্বর সময়ে ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া কাম্পিল্য নগরে আগমন করিয়াছিলেন। অবশেষে অর্জুন অগ্রসর হইয়া, ধনু নত করিলেন, উহাতে গুণ দিলেন ও লক্ষ্য ভেদ করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে অর্জুন ও তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হইল।

৫। পাঞ্চালের শক্তিসম্পন্ন রাজা শৃগুরূপে পাণ্ডবদিগের প্রবল সহায় হইলেন দেখিয়া, কোরবেরা হস্তিনারাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। পাণ্ডবেরা রাজ্যের পশ্চিম অংশ গ্রহণ করিলেন। এই অংশেই যমুনা প্রবাহিত। এই স্থানে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নগর

অরণ্যবাসী বন্য নাগজাতিনিবহকে তাড়াইয়া দিয়া, তাঁহারা এক বৃহৎ রাজ্য গঠন করিয়া তুলিলেন ।

৬। কিন্তু কোরবেরা নিশ্চিত থাকিতে পারিলেন না । তাঁহারা ভ্রাতা পাণ্ডবদিগকে অক্ষকীড়ায় আহ্বান করিলেন । পণ ধরিয়া অক্ষকীড়া হইল । কোরবেরা অসৎ উপায়ে পাশা খেলিয়া পাণ্ডবদিগের রাজ্য, ধন প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, এমন কি, তাঁহাদিগের পত্নী পর্যন্ত জয় করিয়া লইলেন । পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য দ্বিতীয় বার বনে গমন করিতে হইল । বনবাসের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য যত্ন করিলেন । কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল ; কোরবেরা কিছুতেই আর তাঁহাদিগের রাজ্য তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে সম্মত হইলেন না ।

৭। ইহার পরে কোরব ও পাণ্ডব, এই দুই ভ্রাতৃদলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । প্রত্যেক পক্ষে বহুসংখ্যক রাজা, তাঁহাদিগের সহায় ও সঙ্গিগণ সহ আসিয়া যোগদান করিলেন । দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সহায় হইলেন । দ্বারকার বর্তমান নাম গুজরাট । কৃষ্ণ অদ্বিতীয় বীর ও বোদ্ধা ছিলেন । তিনি অবশেষে ঈশ্বরের অবতাররূপে হিন্দুগণ কর্তৃক পূজিত হইয়াছেন । পাঞ্চালের রাজাও পাণ্ডবদিগের সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন । বর্তমান দিল্লীনগরের উত্তরপশ্চিম-স্থিত বিস্তৃত কুরুক্ষেত্রের মাঠে উভয় পক্ষে মহাযুদ্ধ হইল । কুরুক্ষেত্র এক্ষণে পানিপথের প্রান্তর নামে পরিচিত । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন স্থায়ী ছিল । যুদ্ধে কোরবেরা পরাভূত ও একে একে পাণ্ডব-হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন । পাণ্ডবেরা অতঃপর হস্তিনার রাজা হইলেন ।

(৭)

দ্রাবিড় সম্প্রদায় ।

১। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আৰ্য্য জাতি ধীরে ধীরে সমস্ত হিন্দু স্থান অর্থাৎ বিক্র্যপর্বতের উত্তরবর্তী ভূভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়েন । সম্পূর্ণ আর এক জাতীয় লোকে দক্ষিণভারত পরিপূর্ণ ছিল । এই জাতি দ্রাবিড় নামে পরিচিত । দ্রাবিড়ীয়েরা কিরূপে প্রথমে দক্ষিণ-ভারতে আসিল এবং আৰ্য্যদিগের উত্তরভারতে আগমনের পূর্বে, কতকাল অবধি, তাহারা সেখানে ছিল, আমরা ভালরূপে তাহা জানিতে পারি নাই । কতিপয় বিজ্ঞ লোকের অনুমান যে, তাহারাও এক সময়ে আৰ্য্যদিগের সেই পথেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল । কিন্তু তাহারা আৰ্য্য-দিগের বহুপূর্বে আগমন করে এবং ক্রমে দক্ষিণ ভারতে ঘাইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভারতের দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগরে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা বৃহৎ রাজ্য ছিল ; কিন্তু সে রাজ্য সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে । উহার কোন চিহ্নই আর শেষে পরি-লক্ষিত হয় নাই । দ্রাবিড়েরা সেই দেশ হইতে ভারতের দক্ষিণ ভাগে আগমন করিয়াছিল । কতিপয় ব্যক্তি এরূপও অনুমান করেন যে, দ্রাবিড়েরা বহিঃস্থ অন্য দেশ হইতে ভারতে আগমন করে নাই, তাহারা ভারতেরই আদিম অধিবাসী । তাহারা ইহাও বলেন যে, আৰ্য্যেরা ভারতে আগমন করিলে, তখন উত্তরভারতে যে দ্রাবিড় সম্প্রদায় ছিল, তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে নবাগত আৰ্য্যদিগের সহিত মিশ্রিত হয় ও তাহা-দিগের সঙ্গে একজাতিতে পরিণত হইয়া যায় । কিন্তু সকলেই আৰ্য্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল এমন নহে, তাহাদিগের কতকে, আৰ্য্যদিগের সহিত না মিশিয়া, দক্ষিণভারতে চলিয়া যায় । তাহারাই শেষে ভারতের

২। প্রথমতঃ সমস্ত দ্রাবিড়েরা এক ভাষায় কথা বলিত । কিন্তু কালক্রমে, দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া যাহারা বাস করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগের ভাষা অবশিষ্ট দ্রাবিড়দিগের ভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল । স্থানভেদে একই দ্রাবিড় ভাষার বহুপ্রকার বিভিন্ন মূর্তি বিকশিত হইল এবং এক এক স্থানের দ্রাবিড়েরা এক এক রকমের দ্রাবিড়ী ভাষায় কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল । এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রাবিড়ী ভাষার মধ্যে তামিল, তেলিগু, মালয়ালাম ও কেনেরিসই প্রধান ।



দ্রাবিড়দিগের সর্প উপাসনা ।

৩। দ্রাবিড়েরা তাহাদিগের সঙ্গে বড় বড় গরুর পাল লইয়া আসিয়াছিল । তাহারা গাভীর দুগ্ধ পান করিত ; বন জঙ্গল কাটয়া ফেলিত ও ভূমি পরিষ্কার করিয়া উহাতে চাষ করিত । তাহারা গ্রামে থাকিত । তাহাদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক এক জন সর্দার বা প্রধানপুরুষ ছিল । সকলে তাহার আজ্ঞা পালন করিয়া চলিত । তাহারা সর্প ও বৃক্ষের পূজা করিত । তাহাদিগের দেবতাদিগকে তাহারা

শ্রমের ভাবে ভক্তি করিত না, ভয় করিত । দেবতারা যেন তাহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট না করেন, এই জন্য তাহাদিগের নিকট প্রার্থনাদি করা হইত । তাহাদের দেবগণ শোণিতপানে তৃপ্তি লাভ করেন, ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল । এই বিশ্বাসবশতঃ, দেবতাদিগকে প্রসন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে, দেবতার নিকট তাহারা কুক্কট, ছাগ ও মহিষ প্রভৃতির শোণিত উপহার প্রদান করিত । উষ্ণ বা গ্রীষ্মঋতু দেশে হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া বসতি করিতে করিতে তাহারা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল । তাহারা এক্ষণ ভারতের অন্ত প্রদেশবাসী অপেক্ষা সাধারণতই অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ ।

(৮)

প্রাচীন হিন্দুযুগ—জাতিভেদ ।

খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৩০০ ।

১। খৃষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ববর্তী সময় হইতে, আর আর্য্য নামের ব্যবহার তত সঙ্গত বোধ হয় না । এই সময়েই প্রথম, আর্য্যের স্থলে হিন্দু পূর্ণ-অবয়বে বিকশিত হইয়া পড়ে । ইহার অনেক পূর্ব হইতেই হিন্দুজাতি ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া আসিতেছিল । দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও গৌরবাস্তি আর্য্যগণ, বিগত সহস্র বৎসর অবধি, সমগ্র উত্তর ভারতে অল্পে অল্পে ছড়াইয়া পড়িতেছিলেন । তখন সেখানে তাহাদিগের বহুপূর্বের আগত বহু সম্প্রদায়, জাতি ও লোকের বসতি ছিল । বেদে তাহারা দম্ব্য বা দাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।

সম্ভবতঃ আর্য্যগণ অপেক্ষা তাহারা সংখ্যায় পঞ্চাশ গুণ অধিক হইবে। তাহারা দীর্ঘকাল হিন্দু স্থানের উষ্ণ প্রান্তরে বাসহেতু বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা উত্তর দেশ হইতে সমাগত বিশালবপু শ্বেতকাস্তি পুরুষদিগের ত্র্যম্ব বলশালী বা সাহসী ছিল না। কালে তাহাদিগের নাম পর্য্যস্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল এক মহাভারতে তাহাদিগের একটা বৃহৎ সম্প্রদায় ভিল ও অন্য একটা বড় সম্প্রদায় নাগ নামে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের অনেকে পাহাড় পর্বতে পালাইয়া গিয়াছিল। সম্ভালগণের সংখ্যা এক্ষণে দশ লক্ষেরও উপরে। সম্ভানেরা দাক্ষিণাত্যের উত্তরপূর্ব প্রান্তে পার্বত্যপ্রদেশে বাস করিতেছে। খন্দেরা আছে মধ্য ভারতে। তাহাদের সংখ্যা এক্ষণে ১২ মিলিয়ন্ বা পনের লক্ষেরও উপরে উঠিয়াছে।

২। কিন্তু আদিম নিবাসীদিগের অনেকেই পাহাড় পর্বতে পলায়ন না করিয়া, পশ্চাতে পড়িয়াছিল। তাহারা শেষে আর্য্য সমাজের সহিত মিশিয়া যায়। অধিকতর প্রাচীন সময়ের কতিপয় আর্য্য, অন্য আর্য্যগণ অপেক্ষা এদেশে দীর্ঘতর সময় ছিলেন। তাহারা এই সকল লোকের সহিত একত্র বাস করিয়া তাহাদিগের ভাষা শিখিয়া লন এবং তাহাদিগের সহিত সৌহার্দ্যপূর্বে বন্ধ হইয়া পড়েন। এমন কি, তাহারা তাহাদিগের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া

— — — — —

পাদনের জন্ত ভূমিচাষ ও পরিচ্ছদের জন্ত বস্ত্রবুনন করিতেন। ছোট ছোট বালকেরা গরু চরাইত। স্ত্রীলোকেরা গাভী দোহন করিতেন, সূতা কাটিতেন এবং অন্যান্য গৃহকার্য সম্পাদন করিতেন। যুদ্ধের সময়, পুরুষেরা ধনুঃশর ও তরবারি ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বলশালী ও জ্ঞানবান্ ছিলেন, যিনি সম্প্রদায়ের সর্দার, তিনিই তাঁহাদের দলপতি বা নায়ক হইয়া যুদ্ধে যাইতেন। সকলে তাঁহার আজ্ঞাবাহী হইয়া চলিত। যুদ্ধে সহায় হইবার নিমিত্ত তিনি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা এবং যুদ্ধের অবসানে দেব-রূপালাভ হেতু দেবতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন।

৪। আর্যেরা উত্তর ভারতে যেমন বিস্তৃত হইতে লাগিলেন, যুদ্ধ বিগ্রহও তেমন অতি যাত্রার বাড়িয়া পড়িল। পরিবারের প্রধান পুরুষ বা পিতা ও সম্প্রদায়ের নায়ক বা সর্দারগণ অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা হেতু, সময় অভাবে, দেবতাদিগের স্তুতিগাথা বা বৈদিক প্রার্থনাদি নিজেরা শিখিতে পারিতেন না। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কতিপয় ব্যক্তিকে শুধু এই কার্যের জন্ত পৃথক্ করিয়া রাখা হইল। তাঁহারা ইহা ভিন্ন আর কিছুই করিতেন না। কালক্রমে এই সকল ব্যক্তি সম্প্রদায়ের অন্তলোক কর্তৃক, অতি পূত-চরিত্র ও পবিত্র বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে এক স্বতন্ত্র শাখা বা শ্রেণীরূপে গঠিত ও পরিগণিত হইয়া উঠিলেন।

৫। সম্প্রদায়ের নায়ক বা দলপতি এবং তাঁহার অধীন যোদ্ধবর্গও দেখা গেল যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া ভূমিকর্ষণ অথবা অন্য কিছুই করিবার সময় পাইতেছেন না। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিষ্ঠ লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া যুদ্ধের জন্ত পৃথক্ করিয়া রাখা হইল। সম্প্রদায়ের কর্তা তাঁহাদিগের চালক বা নায়করূপে নির্দিষ্ট হইলেন। এই নায়ক-দিগকে তাঁহারা বাক্ষ্য নামে অভিহিত করিলেন। বাক্ষ্য ১০ তাঁহার

যোদ্ধবর্গ এই সমস্তই আবার ক্ষত্রিয় নামে আৰ্য্য জাতির এক স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হইলেন। দীর্ঘ কাল পর্যন্ত, সামাজিক মর্যাদায় ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ ছিলেন। অবশেষে তাঁহারা সমাজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন।

৬। সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকেরা ভূমি-কর্ষণ, বজ্রবুনন এবং অন্তবিধ প্রয়োজনীয় কর্মে নিযুক্ত হইলেন। ইহাদিগের নাম হইল বৈশ্য। ভারতীয় আৰ্য্যদিগের মধ্যে ইহারা তৃতীয় শ্রেণী বা সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া রহিলেন।

৭। চতুর্থ শ্রেণী সংখ্যায় বড় বেশী হইয়া পড়িল। এই চতুর্থ শ্রেণীর নাম শূদ্র জাতি। প্রথম আগত যে আৰ্য্যগণ এদেশীয় স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি এবং এদেশের যে বৃহৎ সংখ্যক পুরাতন অধিবাসী অর্থাৎ দ্রাবিড়, কোল ও অন্যান্ত জাতীয় লোকেরা আৰ্য্যদিগের সহিত সৌহার্দ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া, আৰ্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই এই নিম্নতর শূদ্র শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইল।

৮। যে সকল বন্যজাতি আৰ্য্যদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিল না, তাহারাই আৰ্য্যগণ কর্তৃক বিজিত ও আৰ্য্যজাতিভুক্ত সকল শ্রেণীর দাসরূপে পরিগণিত হইল। ইহারা নিম্নতম শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের নাম চণ্ডাল অথবা অন্ত্যজ বা পতিত জাতি। ইহারা আৰ্য্যদিগের বাসগ্রামে থাকিবার স্থান টুকু পর্যন্তও পাইত না; স্ততরাং গ্রামের বাহিরে কুটারে বাস করিত।

৯। এইরূপে, দীর্ঘকালের পরে, ন্যূনকল্পে ৩০০০ বৎসর পূর্বে এদেশে হিন্দু নামে পরিচিত এই বৃহৎ জাতির গঠন হইয়াছিল। তাঁহারা অনেক দলে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক দলের এক এক জন রাজা ও ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ বা যাজকশ্রেণী, শূদ্র বা

সাধারণ সমাজ এবং চণ্ডাল বা দাস শ্রেণী ছিল। বড় বড় নগর ও মন্দির নির্মিত হইল। অনেক নূতন দেবতার পূজা প্রচলিত হইয়া পড়িল। এ দেশের প্রাচীনতম নগর সমূহের অগ্রতর কাশী বা বেনারস। অবশেষে যে সকল লোক কোন এক কর্মে লিপ্ত থাকিত, অথবা এক ব্যবসায়ের অনুসরণ করিত, তাহারা কালে এক স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায়ে পরিণত



কাশী বা বেনারস।

হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে শত শত সম্প্রদায় বা জাতি উদ্ভূত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। এক সম্প্রদায় বা এক জাতীয় লোক অগ্র সম্প্রদায় বা অগ্র জাতিনিষ্ঠ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান বা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত না। এক সম্প্রদায়ের লোকের অগ্র সম্প্রদায় স্থিত লোকের সহিত একত্র ভোজন ও বিবাহাদিও নিষিদ্ধ ছিল। জাতি-

ভেদের এই পদ্ধতি একমাত্র ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় । পৃথিবীর আর কোথাও এই প্রণালীর জাতিভেদ নাই ।

১০। এই সময় ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে হিন্দুদিগের ধর্ম গঠিত হইতে থাকে । পুরাতন আৰ্য্যদেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি প্রায় বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া যান । যদি কখন তাঁহাদিগের পূজা আরাধনার প্রয়োজন ঘটিত, তাহা হইলে সে পূজা অতি সামান্য উপচারে কোন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া যাইত । আৰ্য্যদিগের পূর্বে যাহারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই পুরাতন অধিবাসীদিগের ধর্ম এবং আৰ্য্যদিগের ধর্ম, বোধ হয়, একত্র বাস নিবন্ধন, একত্র মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল । এই উভয় ধর্মের মিশ্রণ হইতেই হিন্দুধর্মের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব উহার প্রধান দেবতা ও এতদ্ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক দেবতা উহার উপাঙ্গ । ঠিক এমনই ভাবে, পুরাতন আৰ্য্যের সেই বৈদিক ভাষাটিও, পূর্বে উত্তর ভারতে যে সকল ভাষা কথিত হইত, সেই সকল ভাষার সহিত কতকটা মিশ্রিত হইয়া যায় । এই সকল মিশ্রিত ভাষা হইতে প্রথম বিজ্ঞ ও ভদ্রসমাজের ব্যবহার্য্য সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয় এবং পরে ‘প্রাকৃত’ নামক বিবিধ হিন্দু ভাষার বিকাশ ঘটে । এই প্রাকৃত হইতেই বর্তমান বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি ।

১১। এই মহতী জাতিভেদ-পদ্ধতির গঠন ও প্রতিষ্ঠা লাভে কত সময় লাগিয়াছিল, আমরা অবশ্যই তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না । কিন্তু মনুর সময়ে ইহা সম্পন্ন হয়, ইহাই আমরা জানি । এই যুগের শেষ ভাগে অর্থাৎ খৃষ্টের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে, মনু জাতীয় ব্যবহার আইন বা সংহিতা রচনা করেন । মনু, হিন্দু জাতিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এই সকলের নাম নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন । সেই চারি শ্রেণী, ব্রাহ্মণ, কলিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । মনু বলেন, সাধারণ শ্রেণীর হিন্দুরা মিশ্রবর্ণ ও মিশ্রজাতি অর্থাৎ শূদ্র ।

খৃষ্টের পূর্ব প্রায় ১০০০ বৎসর হইতে খৃষ্টের পূর্ব প্রায় ৩০০ বৎসর পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বৎসরব্যাপী সময়কে আমরা পুরাতন হিন্দু অথবা ব্রাহ্মণ যুগ বলিতে পারি । কারণ, এই সময়ে ব্রাহ্মণেরাই সমধিক ক্ষমতাপন্ন ছিলেন ।



(৯)

পুরাতন হিন্দু-রাজ্য ।

খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৩০০ ।

১ । পুরাতন আৰ্য্য-দলপতিগণ আপন আপন সম্ভ্রদায় বা দলসহ উত্তরভারতের বড় বড় নদীর গতি অনুসরণ করিয়া, ধীরে ধীরে ঐ সকল নদীর উর্বর উপত্যকায় আপনাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করিতে থাকেন । বৈদিক যুগে আমরা তাঁহাদিগকে সিন্ধুনদের উপত্যকায়ই সীমাবদ্ধ দেখিতে পাই । পরবর্তী যুগে তাঁহারা গঙ্গা ও যমুনার উজানে বড় বড় পাঁচটি রাজ্য ও নগর স্থাপন করেন । ইহার পরে তাঁহারা উত্তরে হিমালয় হইতে যে সকল নদী গঙ্গায় পতিত হইয়াছে, সেই সকল নদীর গতি অনুসরণ করিয়া চলেন ; এবং দক্ষিণে বিক্র্যপর্বতে গমন করিয়া অবশেষে মহানদী, গোদাবরী এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নদী সমূহের অনুসরণে প্রবৃত্ত হন । ক্রমে ক্রমে তাঁহারা এই সমস্ত নদীর তটেই উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন ।

২ । পুরাতন হিন্দুযুগে এদেশে বহুসংখ্যক বড় বড় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল । প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন । অল্প কএকটি মাত্র রাজ্যে শূদ্র রাজারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । অনেকগুলি সুদীর্ঘ রাজবংশ এদেশে বহুশত বৎসর ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছেন ।

পরবর্তী সময়ে, এক রাজা যেমন প্রায় প্রতিনিয়তই অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছেন দেখা যায়, সেকালেও তাঁহারা তেমনই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন, এবং প্রবলেরা হীনবলদিগকে পরাভূত করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদিগের রাজদরবার ছিল ; এবং সেই দরবারে সম্ভ্রান্ত অধীন ভূস্বামী, সৈন্য সামন্ত, কবি ও পুরোহিত ছিলেন। ঐ সকল রাজাদিগের অধিকাংশেরই নামটি পর্য্যন্তও, অনেক কাল হইল, লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অল্প কএকটির নাম আমরা অবগত আছি।

৩। এই সময়ের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও প্রতাপাশ্রিত রাজ্য—মগধ। বর্তমান বিহারের দক্ষিণ ভাগের নাম মগধ। মগধ, উত্তর-বিহার বা বিদেহ-রাজ্য হইতে গঙ্গানদী দ্বারা বিভক্ত ছিল। মগধে এক রাজবংশের পর আর এক রাজবংশ শত শত বৎসর ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। মগধ ক্রমে ক্রমে অঙ্গ প্রদেশের সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া লইয়াছিল।

৪। যে রাজ্যকে এক্ষণ বাঙ্গালা বলা হয়, সেই কালে উহার পূর্বভাগের নাম বঙ্গ ও পশ্চিমভাগের নাম ছিল অঙ্গরাজ্য। উড়িষ্যা কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালোয়ার জম্বলনদী প্রবাহিত। মালোয়ার মনোরম পার্বত্য-রাজ্য পূর্বে অবন্তী নামে পরিচিত এবং অবন্তীর দক্ষিণভাগে সোরাষ্ট্র-রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহারই বর্তমান নাম গুজরাট। দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীর উপত্যকা ব্যাপিয়া অন্ধ্র রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

৫। এই যুগে উত্তর ভারতের ধর্ম, বিধিব্যবস্থা ও রীতিপদ্ধতি, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে অল্পে অল্পে বিস্তৃত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণেরা, এই সময়ে, বোধ হয়, ভারতের সর্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ধর্ম, বিধিব্যবস্থা এবং ভাষাও অল্পাধিক

বাসী দ্রাবিড় জাতীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের বহু দেবতাকে আপনাদিগের দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের ভাষানিচয়ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আনীত সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তরভারতের অধিবাসী আৰ্য্যগণ দক্ষিণভারতীয় লোকের চালক বা নায়ক স্বরূপ ছিলেন। অঙ্গবলের দ্বারা তাঁহারা এই আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষিত ও অধিকতর বুদ্ধিশালী ছিলেন। এই সময়ে দ্রাবিড়গণও অনেক বড় বড় নগর ও মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহাদিগেরও বড় ও ছোট বহু রাজ্য ছিল। তাঁহারাও আত্মশক্তিতে অনেক বিষয় আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরভারত হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা নানা তত্ত্বে অধিকতর অভিজ্ঞ ও অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ-ধর্ম গ্রহণ করাইয়া এবং তাঁহাদিগের ভাষায় গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইয়া, তাঁহারা যে তাঁহাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর জাতি, ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দ্রাবিড়ীয়েরা, তথাপি তাহাদিগের পুরাতন ধর্মবিশ্বাস ও পুরাতন দেবতা নিচয়কে অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তরভারতের হিন্দুধর্ম যেমন অংশতঃ পুরাতন আৰ্য্যধর্ম এবং অংশতঃ দ্রাবিড়ীয় ও কোল ধর্মের মিশ্রণ, দক্ষিণভারতের হিন্দুধর্মও তেমনি অংশতঃ উত্তরভারতের ধর্ম ও অংশতঃ পুরাতন দ্রাবিড়ীয় ধর্মের সম্মিলনে গঠিত। এই হেতুই তাঁহাদিগের ধর্মে প্রস্তর, বৃক্ষ, ভূত এবং দানব বা পিশাচ-পূজা প্রচলিত আছে।

৬। মধ্যভারতে যে অবস্থা, দক্ষিণভারতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। উত্তরভারত হইতে ব্রাহ্মণগণ ও হিন্দুব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্য সহ ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যেখানে যখন গিয়াছেন, তাঁহাদিগের দেবধর্ম, তাঁহাদিগের ভাষা, তাঁহাদিগের

কাল-চক্রের আবর্তনে সমগ্র ভারতবর্ষই হিন্দু হইয়া উঠে । প্রত্যেক জাতি তাহাদিগের আপন মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও তাহাতে বহু সংস্কৃত শব্দ গাঁথিয়া লয় ; এবং আপনাদিগের পুরাতন দেবতা গুলিকে অব্যাহত রাখিয়া, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতীয় দেবতাদিগের পূজাপদ্ধতিও শিক্ষা করিতে থাকে । শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরা ভারতের যে প্রদেশে যখন বাস করিতেন, সেই প্রদেশের চলিত ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, কিন্তু তাহাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃতেই লিখিত থাকিত । তাহারা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা, উভয় ভাষায়ই অভিজ্ঞ ছিলেন । তাহারা সংস্কৃত লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন ।

৭। দক্ষিণভারতে, অতি প্রাচীন কাল হইতে, চারিটি প্রধান রাজ্য ছিল । এই চারি রাজ্যের একটির নাম পাণ্ড্য । পাণ্ড্য রাজ্য বহুদূর দক্ষিণে তামিল দেশে অবস্থিত । ইহার প্রধান নগর মাদুরা । পাণ্ড্য রাজ্যের উত্তরে চোল রাজ্য । ইহাও তামিলেরই অন্তর্নিবিষ্ট । এই রাজ্যের প্রধান নগর কাঞ্চী বা কঞ্জিভরম । চিরারাজ্য কর্ণাট দেশে । ইহার বর্তমান নাম মহীশূর । চতুর্থ রাজ্য কিরাল দেশ । সমুদ্র ও পশ্চিম-ঘাট পর্বতের মধ্যে এই রাজ্য বিস্তৃত । ইহার বর্তমান নাম মালবার ও ত্রিবাঙ্গুর । এই সকল পুরাতন রাজ্য, বিশেষতঃ চোল ও পাণ্ড্য নামক দুটি তামিল রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ অবিশ্রান্ত চলিত । কতিপয় পুরাবিদ বিজ্ঞলোকে অনুমান করেন যে, উত্তরভারতের ক্ষত্রিয় রাজগণ এই সকল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । আবার অনেকে ইহাও অনুমান করেন যে, দ্রাবিড়-রাজগণই, অতি প্রাচীন কাল হইতে, এই সকল রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন । কথিত আছে, অগস্ত্য নামক জনৈক মহান্ ব্রাহ্মণ ঋষি দক্ষিণভারতে আগমন করিয়া পাণ্ড্য রাজাদিগের রাজদরবারে অবস্থিত হন এবং পাণ্ড্য রাজ্যের লোকদিগকে ব্রাহ্মণ-ধর্মের শিক্ষাদান করেন । পশ্চিমঘাট পর্বতের

একটি উচ্চতম শৃঙ্গ, এই মহাবীর নামে অগস্ত্য-মলয় নামে অভিহিত হইয়াছে ।

(১০)

পুরাতন হিন্দু-যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ।

খৃঃ পূঃ ১০০০—খৃঃ পূঃ ৩০০ ।

১। আর্যেরা হিন্দুস্থানের সমৃদ্ধ ও উর্বর উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ হইলে, অধ্যয়নের জন্ত তাঁহারা প্রচুর সময় পাইলেন। তাঁহাদিগকে আর যুদ্ধ করিতে হইত না, ভূমিকর্ষণও আর তাঁহাদিগের কৰ্ম্য রহিল না। তাঁহাদিগের সমস্ত অভাবপূরণ অত্র সম্প্রদায় কর্তৃক হইয়া যাইত। দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা ও স্তুতি-গাথা পাঠের পর, দিবসে তাঁহাদিগের আর কোন কৰ্ম্মই থাকিত না। তাঁহারা বেদ মুখস্থ করিতেন। ইহাতে অবশ্যই বহু সময় ব্যয়িত হইত। তাঁহারা কাব্য রচনা ও বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন। শিল্প ও বিজ্ঞান-চর্চাও তাঁহাদিগেরই কৰ্ম্য হইয়া উঠিল।

২। এই সময়েই হিন্দুদিগের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হইয়াছিল। এই দুই কাব্যের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুই মহাকাব্যের প্রত্যেক খানিই বহুসংখ্যক গাথা বা কবিতার একত্র সংগ্রহ। ঐ সকল গাথা বা কবিতা বাল্মীকি ও ব্যাসকর্তৃক সংগৃহীত হইবার বহু পূর্বে রচিত এবং কবি বা গায়কের মুখে রাজরাজড়া-দিগের দরবারে স্বর-সংযোগে গীত হইয়াছিল। এই সকল কবিতার পুরাতন রাজাদিগের বীর-কীর্তি বর্ণিত আছে; এবং উহার সঙ্গে দেবতাদিগের বহু উপকথা ও উপন্যাসও মিশিয়া গিয়াছে।

৩। ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের পবিত্র দেব-ভাষা সংস্কৃতটি বিশেষ

যত্ন ও মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন । তাঁহারা উহার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিলেন । ব্যাকরণ প্রণেতাদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পাণিনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । পাণিনিকৃত ব্যাকরণের মত ব্যাকরণ পৃথিবীর কোন ভাষায় কখন লিখিত হইয়াছে কি না, জানি না । পাণিনিই জগতে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্যাকরণ, ইহা স্বীকার করিতে কাহার কোনরূপ আপত্তি থাকিলেও, পাণিনি ব্যাকরণ যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ-নিচয়েরই অন্ততর, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই ।

৪ । সেই কালের পুরাতন হিন্দুরা রাত্রিকালে আকাশের প্রতি দৃষ্টি পাত করিতেন এবং চন্দ্র কিরূপে আকাশ-পথে চলিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিতেন । ইহা দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের জ্যোতিষত্বের সূত্র পাত করেন । চন্দ্রের গতিপথ যে অষ্টবিংশতি নক্ষত্রস্বকের মধ্য দিয়া বিস্তৃত আছে, তাঁহারা সেই অষ্টবিংশ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম নির্দেশ ও তাহাদিগকে চন্দ্র-গৃহ নামে অভিহিত করিয়া লন । দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম অনুসারে তাঁহারা দ্বাদশ মাসের নামকরণ করেন । পূর্ণিমা তিথিতে এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়া চন্দ্রের গতি হইয়া থাকে ।

৫ । তাঁহারা অঙ্ক বা পাটীগণিতেরও বিশদ আলোচনা করিয়া-ছিলেন । তাঁহরাই সর্বপ্রথম দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কার করেন । দশমিক গণনা তাঁহাদিগ হইতেই পাশ্চাত্য জাতিনিবহের মধ্যে প্রচলিত হয় । যজ্ঞ-অনুষ্ঠান হেতু বেদিনির্মাণের প্রক্রিয়া হইতে তাঁহারা জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্রান্ত বহুবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা বর্গ ২৭ সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র, বৃত্ত ও ত্রিভুজ ক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব অবগত ছিলেন ।

৬ । প্রাচীন হিন্দুগণ, জীবন-তত্ত্ব, চতুর্দিক্‌ব্যাপ্ত বহির্জগৎ, ঈশ্বর, মানব ও মন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গভীর চিন্তায়

নিমগ্ন থাকিতেন । এই চিন্তা-যোগে, তাঁহারা যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, অথবা অবগত হইলেন বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । অবশেষে তাঁহারা দেখিতে পান যে, এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন ছয়টা দিক্ দিয়া তাঁহাদিগের চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে । এই ছয়টা বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতিই তাঁহাদিগের ষড়্-দর্শন বা ছয়টি দার্শনিক তত্ত্ব বা মত । ভিন্ন ভিন্ন ছয় জন ঋষি বা তত্ত্বজ্ঞানী কর্তৃক এই ষড়্-দর্শন উদ্ভাবিত হয় ।

৭। কপিল সাংখ্য দর্শন আবিষ্কার করেন । তিনি বলেন, তিনি বা অন্য লোকে যাহা দেখিতে, অনুভব বা প্রমাণ করিতে পারে, তিনি কেবল তাহারই অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ । তিনি বৈদিক উপদেশ অগ্রাহ ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন । তিনি বলেন, এই যে জগৎ আমরা দেখিতে পাই, ইহা কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহা আপনি জড়-পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । সেই জড়-উপাদান নিত্য বিদ্যমান, কিন্তু পূর্বে বর্তমান মূর্তিতে ছিল না । তিনি দুটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন;—একটি জড়-প্রকৃতি আর একটি আত্মা,—প্রকৃতি ও পুরুষ । এ দুটি অনন্ত কাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল থাকিবে । মানুষের আত্মা কিছু দিনের জন্য জড় দেহে বাস করে, ইহার পরে হয় উচ্চতর, না হয় নিম্নতর প্রাণীর দেহ কিংবা তরু-লতাাদি আশ্রয় করিয়া থাকে । আত্মজীবনের ভাল মন্দ কর্ম অনুসারে একরূপ ঘটে । কিন্তু যখন আত্মা পূর্ণজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া উঠে, তখন আর সে কোন দেহ আশ্রয় করে না, অনন্ত কালের জন্য আত্মাক্রমেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অবস্থান করে ।

৮। ইহার পরে যোগ-দর্শন । খৃষ্টের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে পাতঞ্জল কর্তৃক এই তত্ত্বের আবিষ্কার হয় । তিনি বলেন,—মহৎ আদি কারণ বা পরমাত্মা হইতে সমস্ত জগৎ উদ্ভূত । মানবাত্মা, তাঁহার মতে, কেবল আত্ম-চিন্তা দ্বারাই জড় বস্তুর সংস্রব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া

ঈশ্বরের সহিত এক হইতে পারে । একরূপ যুক্তি লাভের ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ বা উপায় নাই ।

৯ । ইহার পরবর্তী দার্শনিকতত্ত্ব গোতম কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় । ইহার নাম জ্ঞানদর্শন বা তর্ক-শাস্ত্র । কিরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়া তত্ত্বনির্ণয় বা সিদ্ধান্তে পঁছচা যায়, জ্ঞানদর্শন তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকে । গোতমের মতেও আত্মা ভিন্ন সমস্তই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত । আত্মা নিত্য বা চিরস্থায়ী । আত্মার পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে, উহার আর জড় দেহের সংস্রবে থাকিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, উহা তখন আত্মাক্রূপে অনন্ত কালের জ্ঞান স্বতন্ত্র অবস্থিত রহে ।

১০ । বৈশেষিক দর্শন কণাদ কর্তৃক আবিষ্কৃত । তিনি বলেন, জগৎ পরমাণু বা ক্ষুদ্রতম জড়কণা হইতে উদ্ভূত । পরমাণু সকল নিত্য-স্থায়ী, উহার কোন পরিবর্তন নাই । কিন্তু জগৎ নিত্যপরিবর্তনশীল । আত্মা সম্বন্ধে কণাদ ও কপিলের এক কথা ও একই সিদ্ধান্ত ।

১১ । পরবর্তী দুটির নাম বেদান্ত-দর্শন । এ দুটিই বৈদিক উপদেশের উপর গঠিত । প্রথমটির নাম পূর্বমীমাংসা । ইহা জৈমিনি কর্তৃক উদ্ভাবিত । জৈমিনি ব্রাহ্মণ সমূহের অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে যে সকল কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সেই কর্তব্যবিষয়ে উপদেশ করিতেছেন । পুনরায় বৈদিক উপদেশ মানিয়া চলা, আবার সেই বৈদিক প্রার্থনা ও স্তুতি-গাথা গান করা এবং বেদের উপদিষ্ট যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই তদীয় উপদেশনিচয়ের সার কথা । কিন্তু জৈমিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই ।

১২ । দ্বিতীয়টি বা শেষদর্শনের নাম উত্তরমীমাংসা অথবা বাদরায়ণ বাসকৃত বেদান্ত । এই বাস মহাভারতের সে ব্যাস নহেন । বাদরায়ণ বাস পুনরায় উপনিষদের উপদেশ অনুসরণ করিয়াছেন ।

তিনি বলেন ঈশ্বর উপাসনা মনুষ্যের অরশ্যকর্তব্য । ঈশ্বর হইতেই

সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং কি জড় বস্তু, কি অজড় আত্মা, সমস্তই আবার সেই ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইবে ; তখন এক মাত্র ঈশ্বরই বর্তমান থাকিবেন । তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ফুলিঙ্গ যেমন আগুনের অংশ, মানুষের আত্মাও তেমন ঈশ্বরের অংশ । আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করে । এইরূপে দেহে দেহে পর্যটন করিতে করিতে আত্মা যখন জ্ঞানে ও জগন্মজলা প্রেমে পূর্ণতা লাভ করে, তখন ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায় । এই বেদান্ত-দর্শনকে অদ্বৈতবাদ অথবা একত্ববাদও বলা হইয়া থাকে । কারণ, আত্মা ও জড় পদার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথক বস্তু নহে ; একই সত্তা বা ব্যক্তির বিভিন্ন মূর্তি মাত্র এবং সেই সত্তা বা ব্যক্তিই ঈশ্বর ; শেষ বেদান্তের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত বা সার উপদেশ ।

১৩ । ব্রাহ্মণেরা অত্র হিন্দুদিগের শিক্ষক ও উপদেষ্টা ছিলেন । তাঁহারা অত্র হিন্দুদিগের সর্বপ্রকার কর্তব্যবিষয়ে বিধিাবস্থা প্রণয়ন করিতেন । যজ্ঞানুষ্ঠানের জ্ঞান বিধান এবং যজ্ঞকার্যের প্রত্যেক অঙ্গের জ্ঞান নিয়মাবলী নির্দিষ্ট ছিল । হিন্দুদিগের পূজা, উৎসব এবং গৃহধর্ম ও ঘরকন্নার জ্ঞানও ব্রাহ্মণেরা সংহিতা বা ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন । প্রত্যেক লোকের কি ভাবে দৈনিক জীবন যাপন করিতে হইবে, তৎসম্পর্কে ব্রাহ্মণপ্রণীত ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ছিল । অপরাধ করিলে, তজ্জন্ত দণ্ডদানের বিধানও ব্রাহ্মণেরাই রচনা করিয়াছিলেন । এই সকল বিধিব্যবস্থা ছন্দের প্রণালীতে সূত্রের আকারে রচিত । উহা কঠিন করিয়া রাখা হইত । মনুর ব্যবস্থা রাজাদিগের আইন স্বরূপ ছিল । ইহাতে কিরূপে রাজ্যশাসন করিতে হইবে, অপরাধীর প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা কর্তব্য, এই সকল বিষয়ের বিধান থাকা হেতু, রাজগণ মনুর ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেন । এই যুগে ইহাও সূত্রাকারে গ্রথিত ছিল ; পরবর্তী যুগে শ্লোকে পরিণত হইয়াছে ।

(১১)

বুদ্ধ।

খৃঃ পূঃ ৫৫৭ হইতে খৃঃ পূঃ ৪৭৭।

১। পরাক্রান্ত কোশল রাজ্যের পূর্বদিকে, অল্প একটু দূরে, শাক্য জাতি নামে পরিচিত ক্ষুদ্র একটা সম্প্রদায় বাস করিত। প্রায়



২৫০ বৎসর পূর্বে, পুরাতন হিন্দু বা ব্রহ্মণ্য যুগের শেষ সময়ে, ক্ষত্রিয় নৃপতি শুদ্ধোদন এই শাক্য জাতির রাজা ছিলেন। শুদ্ধোদনের রাজধানী কপিলবাস্তু। কপিলবাস্তু বারাণসী বা কাশীধাম হইতে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে, রোহিণী নদীর তটে অবস্থিত ছিল। শুদ্ধোদন বড়ই সাহসী ও রণকুশল নৃপতি ছিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁহার এক মাত্র পুত্র গৌতমও তাঁহারই মত রণ-নিপুণ বীরপুরুষ হন। তিনি এই হেতু পুত্রকে অতি

বুদ্ধ।

যত্নের সহিত ধনুর্বিদ্যা, বর্ষা ও

অসিচালনায় শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। গৌতমের বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তিনি যশোধারা নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় কাণ্ড সম্পন্ন করেন। বিবাহের দশ বৎসর পরে গৌতমের একটি পুত্র সন্তান জন্মে।

২। গৌতম বাল্যকালেও, অনেক সময়ই, নীরবে বসিয়া চিন্তা

করিতে ভাল বাসিতেন । তিনি বাক্যালাপে নম্র, সদয়হৃদয় ও সকলের প্রতিই রূপাপরবশ ছিলেন । গৌতম শিকারে যাইতেন ; কিন্তু মৃগকে স্বচ্ছন্দে বনে' চরিয়া বেড়াইতে দেখিলে, তাঁহার আর শিকারে প্রবৃত্তি থাকিত না । তিনি অনেক সময়ই অর্দ্ধ-আকৃষ্ট ধনু হাতে লইয়া হঠাৎ থামিয়া যাইতেন ; এবং “এ আমার কি করিয়াছে, আমি কেন অকারণ এই উপায়হীন প্রাণীর শরীরে আঘাত করিতে যাইতেছি”, এই বলিয়া হাতের বাণটিকে তুলীয়ে তুলিয়া রাখিতেন ও বিনা শিকারে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন । ঘোড় দৌড়ের সময়, তিনি তাঁহার ঘোড়াটিকে পরিশ্রান্ত ও বেশী পরিমাণে হাঁপাইতে দেখিলে, গতি-পথে সহসা থামিয়া যাইতেন, এইরূপে পণে পরাজিত হইতেন, তথাপি ঘোড়াকে ক্লেশ দিতে পারিতেন না ।

৩। বসন্ত কালে একদিন রাজা শুক্লোদন পুত্র গৌতমকে সঙ্গে লইয়া মাঠের শোভা দেখিতে বহির্গত হইলেন । তাঁহারা বহুসংখ্যক বাগান, কূপ, শস্ত্রশ্রামল ও তৃণপূর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন । গৌতম চারিদিকের শোভা দেখিয়া বড়ই প্রীত ও সুখী হইলেন । কিন্তু তাঁহার এ সুখ স্থায়ি হইল না । তিনি দেখিভে পাইলেন, জনৈক কৃষক একটা রুগ্ন বলদ দিয়া হাল চাষ করিতেছে । বলদের পিঠে ক্ষত । বলদটা তেমন জোরে লাঙ্গল টানিতেছে না, দেখিয়া কৃষক উহাকে বেগে চলিবার নিমিত্ত পাঁচনী দ্বারা এমন প্রহার করিল যে, উহা যন্ত্রণায় ধড় ফড় করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবার মত হইল । তিনি এইস্থান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখিলেন, একটা সন্ধান বা শিকরে পাখী একটি কপোত ধরিয়া খাইতেছে । আর একস্থানে দেখিলেন একটা কপোত বা ঘুঘু মক্ষিকা বা ছোট ছোট কীট ধরিয়া খাইয়া ফেলিতেছে । এই সকল দেখিয়া তিনি বড়ই বিষমমনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ।

৪। এই ঘটনার কিছুদিন পরে, গৌতম একদিন, নিশিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটি একটু বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তিনি দেখিলেন, অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ একটি বৃদ্ধ যেন তাঁহার সম্মুখে। বৃদ্ধ চলিতে অক্ষম ; এমন কি বার্ককাহেতু ভাল করিয়া তাহার দাঁড়াইবারও শক্তি নাই। তিনি বৃদ্ধকে দেখিতেছেন, এমন সময়, সেই স্বপ্নেই শুনিতে পাইলেন কে যেন কহিল “গৌতম, তুমিও একদিন এমনই বৃদ্ধ ও দুর্বল হইবে”। ইহার পরে, তিনি দেখিলেন, একটি লোক বড় পীড়িত। সে রোগ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। কে যেন আবার বলিল, “গৌতম, তুমিও একদিন এইরূপ পীড়িত হইবে, এবং রোগযন্ত্রণায় এমনই কষ্ট পাইবে।” অবশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি লোক যেন মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছে। উহার শরীরটা শীতল ও শক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি এই মৃত দেহ দেখিতেছেন, এমন সময়, সেই কণ্ঠ আবার বলিল “গৌতম, তোমাকেও একদিন অবশ্য মরিতে হইবে।”

৫। এই স্বপ্নদর্শনের অল্পকাল পরেই, গৌতম তাঁহার পিতা, পত্নী, শিশু পুত্র ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া গভীর বনে চলিয়া যান। এই সময়, তাঁহার বয়স্ক্রম ত্রিশ বৎসর। গৌতম বনে যাইয়া ক্ষত্রিয় রাজ-কুমাররূপে তাঁহার মস্তকে যে সুদীর্ঘ কেশরাশি ছিল, তাহা কাটিয়া ফেলিলেন এবং রাজ-পরিচ্ছদ ফেলিয়া দিয়া ভিক্ষুকের ছেড়া নেকড়া পরিধান করিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর কাল সন্ন্যাসীর জীবন বনে বাস করেন। তিনি সংসারে চারিদিকে যে পাপ, তাপ, ও দুঃখরাশি দেখিয়া আসিয়াছেন, কি উপায়ে সে সমস্ত দূর করা যাইতে পারে, ঐ সাত বৎসর কাল, কেবল এই চিন্তায়ই অতিবাহিত হইয়াছিল। গৌতম প্রথমতঃ মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিকটবর্তী বনে, অর্থাৎ বর্তমান পাটনা জিলার অন্তর্গত কোন স্থানে ছটি ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া থাকেন। কিরূপে মনে সুখ বা শান্তি লাভ করিতে পারা



বুঙ্গয়ার মন্দির।

যান, ব্রাহ্মণ গুরুরা তাঁহাকে তাহা শিক্ষা দিতে পারিলেন না । তিনি ইহার পরে পাটনার দক্ষিণবর্তী গয়ার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন । এই অরণ্যে তিনি ছয় বৎসর কাল উপবাস ও অন্তরূপ কঠোর অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন । কিন্তু অবশেষে তিনি বুঝিতে পাইলেন যে, এই উপায়ে নিজের শাস্তি লাভ হয় না, কিরূপে শাস্তি লাভ করা যাইতে পারে, অতঃকোঁ সে পথ দেখাইয়া দেওয়া যায় না । গৌতম যে স্থানে এই ছয় বৎসর কাল অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানেই এক্ষণ বুদ্ধগয়ার মন্দির বিরাজমান ।

৬। গৌতম অতঃপর এক শাল-তরুতলে ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন । এই তরুটি পরে যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া বুদ্ধের “বোতরু” কিংবা “বোধি” বা “বুদ্ধি বৃক্ষ” নামে পরিচিত ছিল । এই তরুতলে গভীর ধ্যানস্থ অবস্থায়ই তাঁহার মনে সর্বপ্রথম জ্ঞানালোকের বিকাশ হয় ; তিনি এতদিন পরে, প্রকৃত সুখশান্তির পথ পাইলেন বলিয়া আত্মায় অনুভব করেন । তিনি বুঝিলেন, উপবাসে শাস্তি পাওয়া যায় না ; শরীরকে পীড়া দিয়াও শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু কোন জীবিত বস্তুর অপচয়, অনিষ্ট বা হিংসা না করিয়া, সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়ার ভাব পোষণ করিয়া, বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সৰ্বাংশে কল্যাণকর জীবন যাপন করিতে পারিলেই মানুষ ইহলোকে সুখী হইতে পারে, এবং পরলোকে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় । ইহাই তাঁহার নিকট ঋষ সত্য বলিয়া অনুভূত হইল । তিনি ইহার নাম রাখিলেন “মধ্য-পথ” ।

৭। গৌতম এই জ্ঞানলাভের পর অরণ্য হইতে লোকালয়ে ফিরিয়া আসিয়া বুদ্ধ নাম ধারণ করিলেন । বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী,—বুদ্ধি বা জ্ঞানপ্রাপ্ত । তিনি সর্বপ্রথম কাশী বা বারাণসীতে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই নিকট উল্লিখিত সত্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন । তিন মাসের মধ্যে তাঁহার ৬০ জন শিষ্য হইল । তিনি এই

শিষ্যদিগকে তাঁহার উপদেশনিচয় চারি দিকে প্রচার করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। বুদ্ধ কাশী হইতে রাজগৃহে গমন করেন। সেখানকার রাজা আপন লোক জন সহ তাঁহার নূতন ধর্ম যোগদান করিলেন। ইহার পর তিনি কপিলবাস্তুতে যাইয়া বুদ্ধ পিতার সহিত দেখা করিলেন। তিনি রাজকুমাররূপে যে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আজি কাঞ্চাল ভিক্ষুর বেশে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক, হাতে করঙ্গ। তাঁহার পিতা, পত্নী, বালক পুত্র এবং সমস্ত শাক্য সম্প্রদায় তাঁহার উপদেশ শুনিলেন এবং শিষ্যরূপে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল, অর্থাৎ তাঁহার অনীতি বৎসর বয়স পর্যন্ত, নানা স্থানে পর্ষাটন করিয়া, তাঁহার এই নূতন তত্ত্ব,—বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তিনি এই প্রচার-কার্যে মগধ ও কোশল রাজ্যের সকল স্থান অর্থাৎ বর্তমান বিহার, অযোধ্যা ও আগ্রা প্রদেশ সমস্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

(১২)

বৌদ্ধধর্ম।

১। বুদ্ধের উপদেশ গুলি এমন মধুর ও উপাদেয় এবং তাঁহার জীবন এতদূর পবিত্র যে, অচিরেই বহুলোক তাঁহার মতের অনুসরণ করিল। বিশেষতঃ তিনি প্রচার করিলেন যে, তাঁহার পবিত্রসম্প্রদায়-ভুক্ত সকলেই স্বাধীন ও পরস্পর সমান। তাহাদিগের মধ্যে ছোট বড় ভেদ নাই, যে ব্যক্তি নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, সত্য কথা বলে এবং কোনরূপ কুৎসিত কর্মে রত না হয়, সে-ই অতীত যে কোন ব্যক্তির ত্রায় আদরণীয়। তাঁহার এই উক্তি সাধারণ লোকের বড়ই প্রীতিকর হইল। ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ এবং সকল জাতি ও

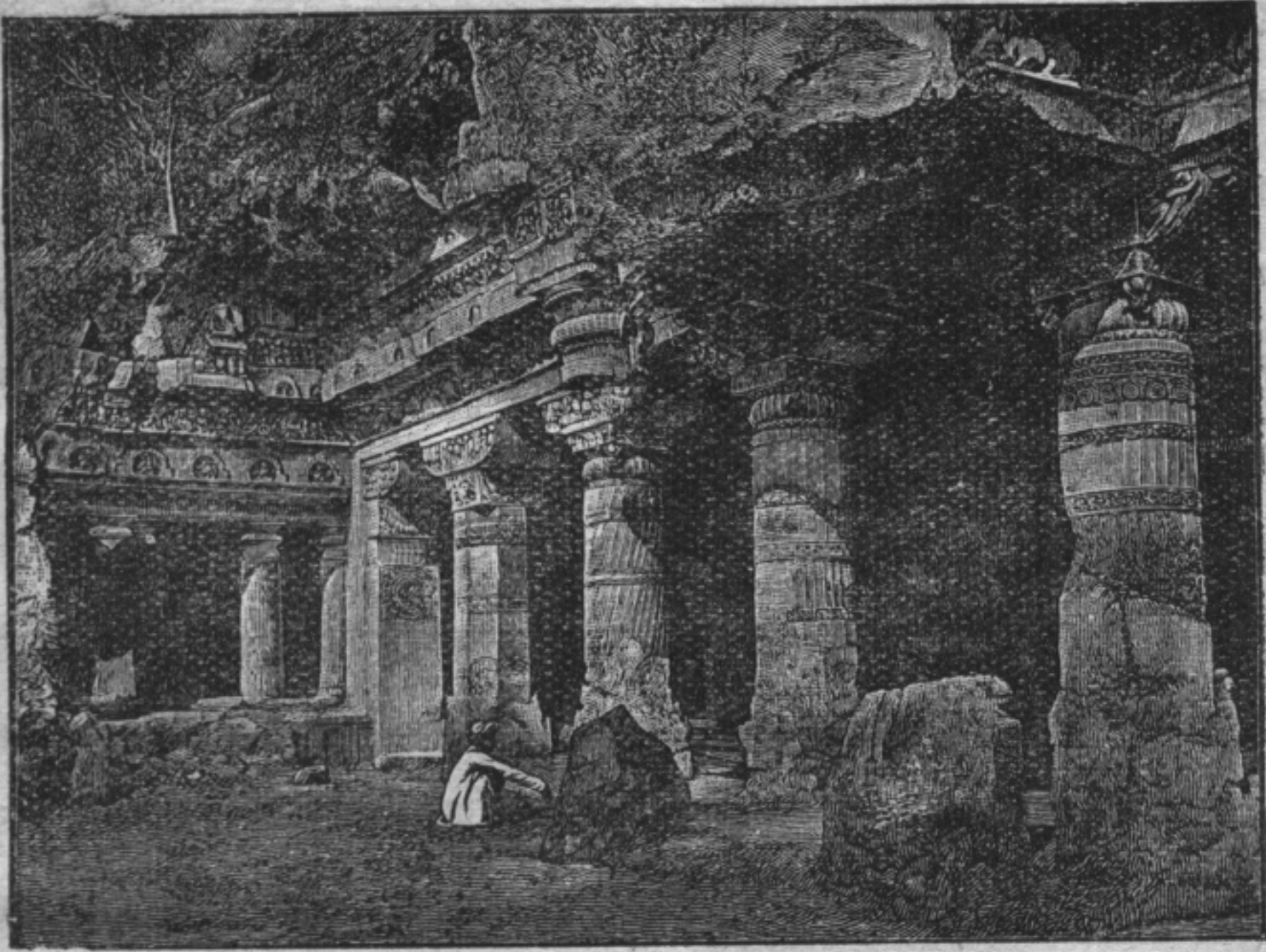
সকল ধর্মসম্প্রদায়ের পুরুষ ও স্ত্রী লোকেরাই তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দলে দলে বুদ্ধ হইতে লাগিল।

২। বুদ্ধের মতে প্রত্যেক মনুষ্যের ইহকাল ও পরকালের সুখ দুঃখ ও ভাল মন্দ তাহার আত্মকৃত অনুষ্ঠানের ফল। ইহাকেই তিনি কর্ম বলিয়া নির্দেশ করিলেন। মন্দ কর্ম করিলে, অবশ্যই দুঃখ পাইতে হইবে; এবং সংকার্য্য করিলেই সুখ ও শান্তি লাভ ঘটিবে। তিনি বলিলেন, দেবতার নিকট কোনরূপ বলিদানেই পাপ পুছিয়া যায় না। কোন পুরোহিত বা পূজকের কোনরূপ প্রার্থনায়ই কাহারও কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। মানুষ যেমন বীজ বপন করে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। তিনি ইহাও বলিতেন যে, মৃত্যুর পরে, মৃত ব্যক্তির আত্মা অগ্র মনুষ্য দেহে অথবা ইতর প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে; এবং বারংবার জন্মের পর, জন্ম ধারণ করিতে থাকে। অবশেষে যখন পাপ-ক্ষয় হয়, সুখ, দুঃখ ও জীবনের সমস্ত ব্যতনা ঘুচিয়া যায়, যখন সংকর্মের পরিমাণ তৎকৃত মন্দ অনুষ্ঠান অপেক্ষা বেশী হইয়া উঠে, তখনই সংলোকের আত্মা চরম শান্তি লাভ করে। বুদ্ধ এই অবস্থাকে নির্বাণ বলিয়াছেন। এই অবস্থায় আত্মা চির-কালের তরে পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

৩। যাহারা সংসার ছাড়িয়া শান্তিময় পবিত্র জীবন যাপনে ইচ্ছুক হইলেন, বুদ্ধ তাঁহাদিগের দ্বারা একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা শ্রেনী গঠন করিলেন। এই উদাসীন শ্রেনীভুক্ত সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনীগণ ভিক্ষিণী নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহারা মাথা মুড়াইলেন, গৈরিক বা পীতবাস পরিধান করিলেন, এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিহার বা উদাসীন-আশ্রমে থাকিয়া অধ্যয়ন ও প্রশান্তমনে চিন্তা করিতেন। এইরূপ চিন্তা ও অধ্যয়নে তাঁহাদিগের সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহারা যে সকল পরিত-পার্বস্থ

গহ্বর বা গোফায় বাস করিতেন, সেই সকল গহ্বরকে বিহার বা উদাসীন-অশ্রমা বলা হইত। মগধে এই শ্রেণীর বিহারের সংখ্যা সর্কাপেক্ষা বেশী ছিল। এই হেতু মগধ, এই নামটি শেষে বিহার-ভূমি বা বিহার-রাজ্যে পরিবর্তিত হয়। এখনও ইহা এই বিহার নামেই পরিচিত।

৪। বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিলেন যে, তাহারা নিজেরাই যে শুধু ষথার্থ ধর্মের পথ লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, এমন নহে, এই সত্যের পথ লইতে অতেরও মতি জন্মাইতে হইবে। তিনি যাহা



বৌদ্ধ উদাসীনের গোফা বা গহ্বর অজন্ত।

বলিলেন, তাহারা তাহা করিল। তাঁহার উপদেশের ফল এই হইল যে, তাঁহার জীবন কালেই, বহুলক্ষ হিন্দু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। মগধের রাজা বিম্বশর পূর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। সময়ে আবার কোটি কোটি লোক তাঁহার উপদেশের অনুবর্তী হইল।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম, হাজার বৎসর কাল, ভারতের সর্বপ্রধান ধর্মরূপে পরিগণিত ছিল ।

৫। খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরই, তাঁহার উক্তি ও উপদেশগুলি একত্র সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পাঁচশত শিষ্য পাটনার নিকটবর্তী এক বৃহৎ গহ্বরে সমবেত হন। তাঁহারা, তাঁহার উপদেশগুলিকে স্মৃতিতে দৃঢ় করিয়া গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত, সকলে মিলিয়া সুর-সংযোগে গান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বুদ্ধপ্রদত্ত উপদেশনিচয়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই বিভাগত্রয়কে পেটিকা নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধদেব শিষ্য-দিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, প্রথম পেটিকায় সেইগুলি সন্নিবিষ্ট হইল। দ্বিতীয় পেটিকায় শিষ্যদিগকে কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি যে সকল নিয়ম উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই স্থান পাইল। তৃতীয় পেটিকায় তাঁহার উপদেশাবলী ও ধর্মমত সংগৃহীত হইল। ইহাই বুদ্ধদিগের সর্বপ্রথম মহাসম্মিলনী। এই অধিবেশনের একশত বৎসর পরে, দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। এই সম্মিলনীতে সাত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। কতিপয় বিবাদ ও বাতবিতণ্ডার মীমাংসা উপলক্ষে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৩৭৭ অব্দে এই অধিবেশন হয়। ইহার একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ২৪২ অব্দে পাটনা নগরে মগধের সুবিখ্যাত নৃপতিশ্রেষ্ঠ অশোক কর্তৃক তৃতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিথীর নৃপতি কনিষ্ক কর্তৃক, ৩০০ শত বৎসর পরে, চতুর্থ সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ইহাই বৌদ্ধ-দিগের শেষ সম্মিলনী।

৬। খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই একহাজার ১০০০ বৎসর কালকেই ভারতের বৌদ্ধ-যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ,

এই সময়ের মধ্যেই, ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্ব-প্রধান ধর্ম-রূপে পরিগণিত হইয়া উঠে ।

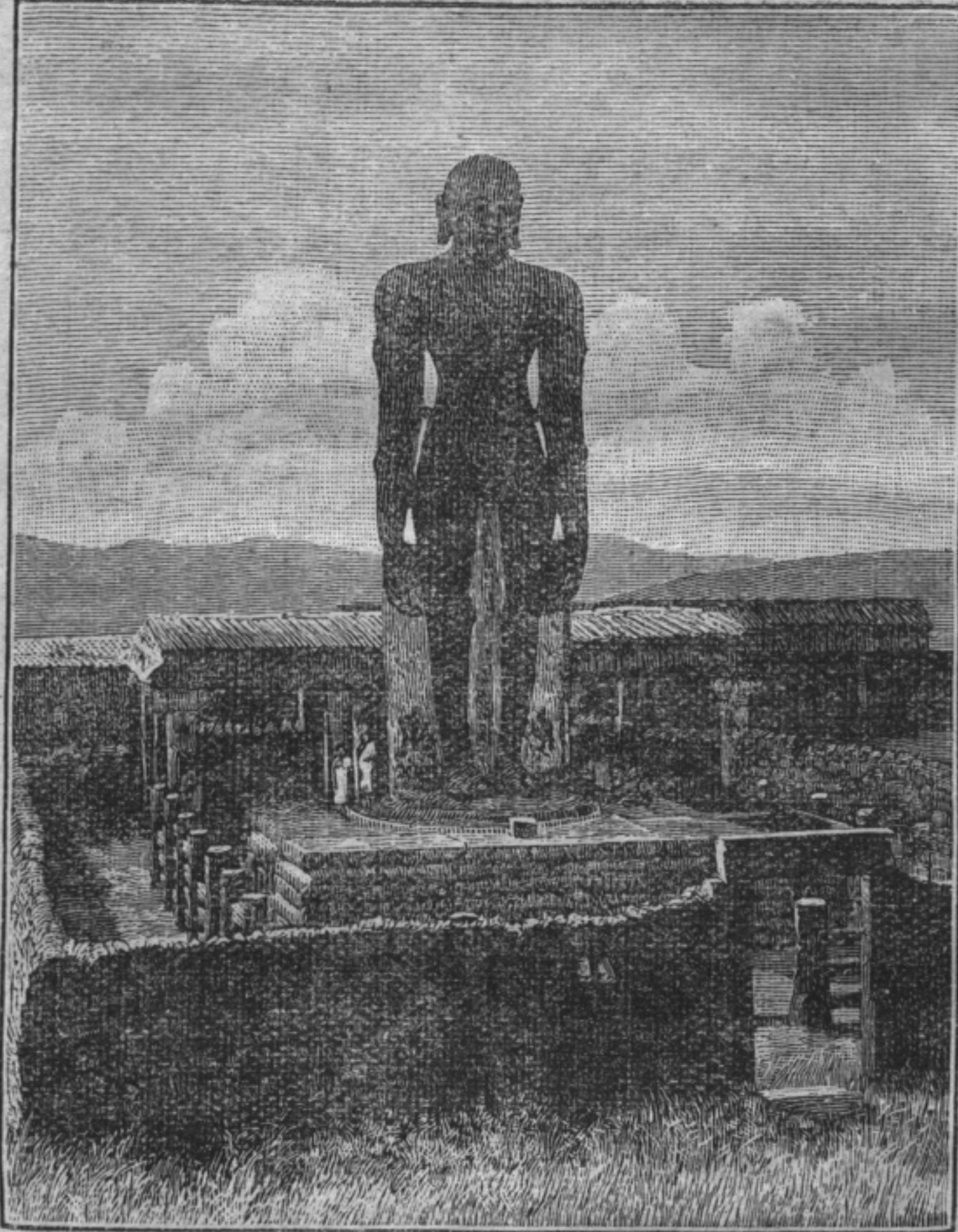
৭। এই যুগের প্রথম অংশে গ্রীক ও সিখীয়গণ ভারতে আগমন করেন । এই সময়ের বড় বড় হিন্দু রাজা, হিন্দু রাজত্ব এবং এই সময়ের শিক্ষা ও শিক্ষিতদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে, গ্রীক ও সিখীয়গণ ভারতে আসিয়া কি করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে ।

(১৩)

জৈন সম্প্রদায় ।

১। যখন বুদ্ধদেব সশরীরে বর্তমান থাকিয়া ধর্ম প্রচার করিতে-ছিলেন, প্রায় সেই সময়েই বর্দ্ধমান নামক অন্ত এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার, মহাবীর নাম ধারণ করিয়া, আর একটা নূতন ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন । ইহাও অনেক অংশে বৌদ্ধ ধর্মেরই অনুরূপ । এই মহাবীর “জিন” বা পুণ্যাশ্বা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । তাঁহার জিন আখ্যা হইতেই তাঁহার ধর্মের নাম জৈনধর্ম এবং তাঁহার শিষ্যেরা জৈন নামে পরিচিত । তিনিও উত্তরভারতে অবস্থিত হইয়া, সেইখানেই তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । স্বয়ং জৈনেরা বলে যে, তাহারা বৌদ্ধদিগের পূর্ববর্তী ; সুতরাং বৌদ্ধগণ অপেক্ষা প্রাচীনতর । কতিপয়-বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিও অনুমান করেন যে জৈনদিগের এই উক্তি প্রকৃত । গুজরাটের পালিতালা নগরে অতি সুন্দর সুন্দর বহুসংখ্যক জিনমন্দির দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । মন্দিরের সংখ্যা এত বেশী যে, গুজরাটের পালিতালা-মন্দির-নগর নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইয়া আছে । এই সকল মন্দিরের কএকটি হাজার বৎসর পূর্বে নিশ্চিত হইয়াছিল ।

আবু পর্বতে দুটি খেত মার্কলের মন্দির আছে । মার্কলগুলি অবশ্যই ৩০০ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে আনীত হইয়াছিল । শোভা ও সৌন্দর্য্যে এই মন্দিরদ্বয় ভারতে সর্বোৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । জৈনধর্ম্মের প্রবর্তক মহাবীর জিনের মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরে, সুপ্রসিদ্ধ রাজা চন্দ্র গুপ্ত যখন মগধের অধীশ্বর, তখন সেই দেশে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ



জৈন প্রাতিমূর্তি ।

হয় । এই সময়ে বহুসংখ্যক জৈন হিন্দুস্থানের ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে কর্ণাটিকা রাজ্যে চলিয়া যায় । কর্ণাটিকার বর্তমান নাম মহীশূর ও কানাড়া । এখনও কতিপয় জৈন এই স্থানে বসতি

করিতেছে । এই সময়ে, জৈনেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় । এক সম্প্রদায়ের নাম “শ্বেতাশ্বর” ; ইহারা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিত । অন্য সম্প্রদায়কে “দিগম্বর” বলা হইত ; ইহারা কোনরূপ বস্ত্র পরিধান করিত না । ভারতের নানা স্থানে এখনও সর্বসমেত ১২ মিলিয়ন বা ১৫ লক্ষ জৈন বর্তমান আছে ।

২ । বৌদ্ধদিগের গায় জৈনদিগের মধ্যেও সন্ন্যাসী আছে । জৈনেরাও জীবহত্যা করেনা ; এমন কি, ক্ষুদ্র কীট পর্যন্তও তাহাদিগের কাছে নিরাপদ থাকে । তাহারাও কৰ্ম ও নিকৰ্ণ মানে ; এবং মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির আত্মা অন্য প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হয় ও পুনঃপুনঃ জন্মধারণ করে, এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে । তাহারা নগর ও লোকালয় হইতে বহুদূরে,—গভীর অরণ্যে এবং জঙ্গলময় পাহাড়ে তাহাদিগের মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে । এই সকল মন্দিরে বা মন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে, তাহারা জৈন-মহাত্মা ও বড় বড় জৈনদিগের বৃহৎ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে । এই সকল মূর্তির একটি দক্ষিণ ভারতস্থিত কানাড়ার অন্তর্গত কারকানে প্রতিষ্ঠিত আছে । ইহা “গুম্ভা” অর্থাৎ গৌতম বা বুদ্ধের প্রতিমূর্তি বলিয়া পরিচিত । মূর্তিটি ৪২ ফুট উচ্চ এবং এইটা অতীব দৃঢ়নিবদ্ধ ও শক্ত । ইহা একটা প্রকাণ্ড পাহাড় ফলক হইতে খোদিত্বা নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে ।

(১৪)

ভারতে গ্রীক্ ।

১ । আর্য্যদিগের এক শাখা পারস্তে বাইয়া একটা অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করেন । খৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, প্রায় বুদ্ধের সমসময়ে, ডেরিয়ান্স পারস্যের সম্রাট ছিলেন । সিন্ধু নদের পশ্চিমতট হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত, এসিয়ার সমগ্র পশ্চিম অংশ অর্থাৎ এখনকার এসিয়া মাইনর, পারস্ত, আফ্গানিস্তান, তুর্কিস্তান, এবং সিন্ধু

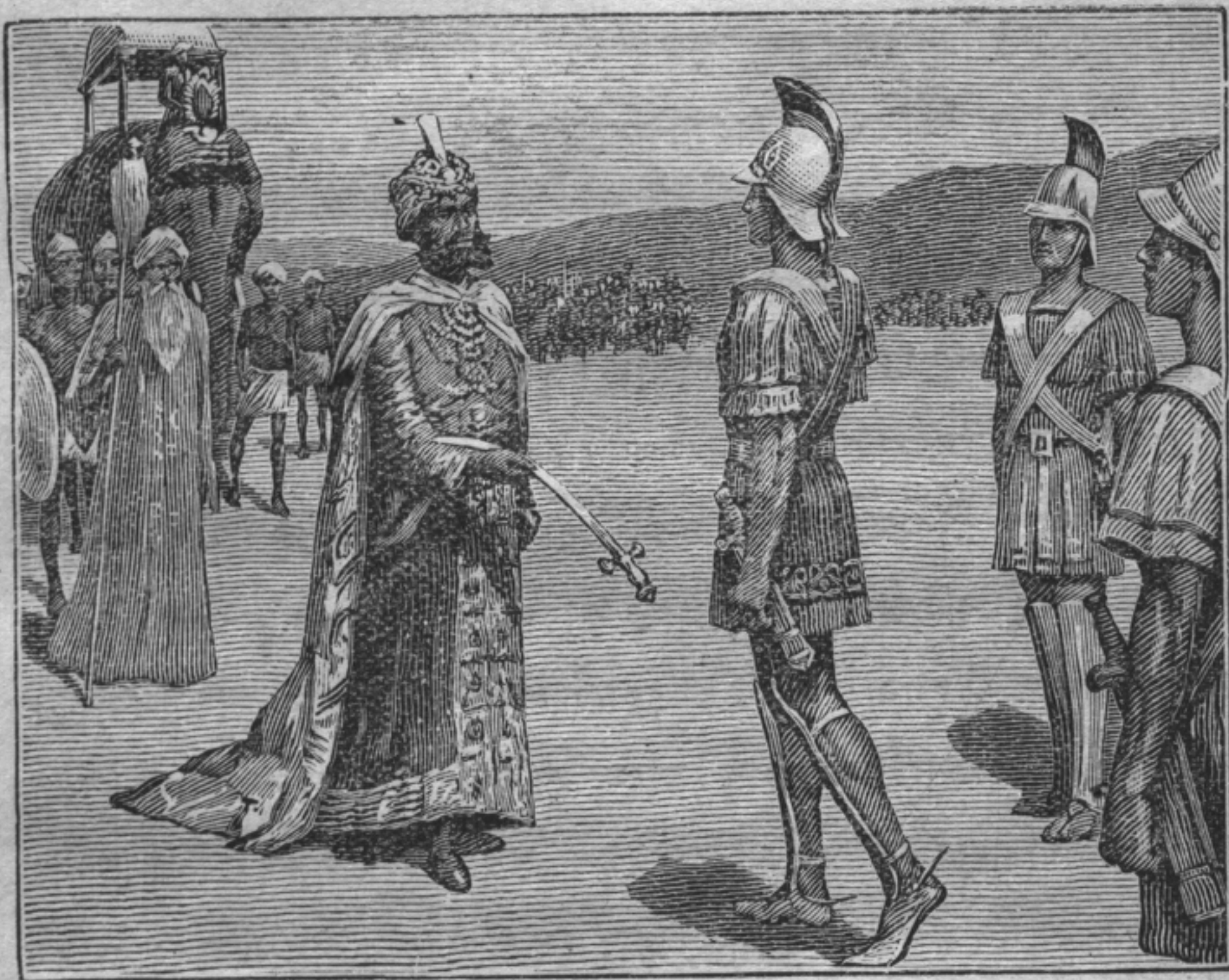
নদের পশ্চিমস্থ পঞ্জাবপ্রদেশ, সমস্তই এই সময়ে পারস্ত রাজ্যের অধীন ছিল ।

২। ইউরোপ-নিবাসী আৰ্য্যজাতিবহুর মধ্যে এই সময়ে গ্রীক-গণই সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত, সাহসী ও সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । গ্রীক নৃপতি আলেকজান্ডার পারস্ত আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হন । তিনি সাহসী গ্রীক বীরদিগের ক্ষুদ্র একদল সেনা সঙ্গে লইয়া সাহসের সহিত পারস্ত অভি-মুখে যুদ্ধ-যাত্রা করেন । তাঁহার সঙ্গে মাত্র ৩৫০০০ হাজার সৈন্য আসিয়াছিল ।

৩। আলেকজান্ডারকে অতি কীচা বয়সে রাজ-পদে অভিষিক্ত করা হয় । তখন তিনি কুড়ি বৎসর বয়সের তরুণ যুবক । পারস্ত আক্রমণের সময়, তাঁহার বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল । কিন্তু এই বয়সেই, তিনি পৃথিবীর বীরসমাজে যে সকল ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই অন্ততরুপে সম্মানিত ছিলেন । তিনি ইতিহাসে, আলেকজান্ডার (The Great) অর্থাৎ মহান্ আলেকজান্ডার নামে প্রসিদ্ধ । আলেকজান্ডার ক্রমে সমস্ত এশিয়া মাইনর ও পারস্ত দেশ জয় করিলেন । পারস্তরাজ ডেরিগাস যখন যে যুদ্ধ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার সৈন্যদল পরাজিত হইল । আলেকজান্ডার তুর্কিস্থান ও আফগানিস্থান হস্তগত করিয়া খাইবার পাশের পথে ভারতে প্রবেশ করিলেন । বহুযুগ পূর্বে, এইপথেই আৰ্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন ।

৪। পোরাস নামক পঞ্জাবের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা আলেকজান্ডারকে ভারত হইতে সবলে নিষ্কাশিত করিতে যত্ন করেন । বিলাম্ নদীতটে প্রবল যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে পোরাস ও তাঁহার ক্ষত্রিয় বীরগণ আলেকজান্ডার ও তাঁহার গ্রীকবীরগণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন । যুদ্ধের অবসানে পোরাস বন্দিরূপে আলেকজান্ডারের সম্মুখে আনীত

হইয়াছিলেন। গ্রীক নৃপতি আলেক্জান্ডার পোরাসকে এই প্রশ্ন করিলেন,—“আপনি বন্দী, আপনি কাহার ঞায় ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন, বলুন”। পোরাস সগর্বে উত্তর করিলেন,—“রাজার ঞায়”। আলেক্জান্ডার এই সাহসিক উত্তর শুনিয়া প্রীত হইলেন, এবং পূর্বের ঞায় তাঁহাকে তাঁহার আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।



পোরাস আলেক্জান্ডারকে তরবারি প্রদান করিতেছেন।

৫। আলেক্জান্ডার, ইহার পর, গঙ্গার তটবর্তী দেশে প্রবেশ করিয়া সমস্ত হিন্দুস্থান জয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল এতদূর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহার অনুগমনে সম্মত হইল না। তাহারা বহুবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, স্বদেশ দর্শন করে নাই, সুতরাং স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্ম সকলেই অধীর হইয়া উঠিল। অতএব, আলেক্জান্ডারকে এই স্থান

হইতে ফিরিয়া যাইতে হইল । কিন্তু তিনি ফিরিয়া আর স্বদেশে যাইতে পারেন নাই । পথে এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত বেবিলনে জ্বর-রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

(১৫)

চন্দ্রগুপ্ত ।

খৃঃ পূঃ ৩২১—২৯৭ ।

১। চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজবংশের সন্তান । কিন্তু তাঁহার জননী মুরা নীচজাতীয়া ধর্মণী ছিলেন । এই হেতু চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র । মগধের রাজ-ক্ষমতা তখন যাহার হাতে ছিল, সেই মহাপথ নন্দ ও ~~শূদ্র~~ শূদ্র ছিলেন । মগধ সিংহাসনে নন্দের কোন স্বত্ব ছিল না । তিনি অবৈধ উপায়ে উহা অধিকার করিয়া লন এবং বালক রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন । রাজকুমার প্রাণভয়ে পঞ্জাবে পলাইয়া যান ।

২। চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় বুদ্ধি ও শক্তি-বলে ক্রমে ভারতের প্রাক্তনিবাসী কতিপয় রণপ্রিয় জাতির চালক ও নায়ক হইয়া উঠেন । আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর পর, তিনি এই সকল সৈন্তের সাহায্যে, গ্রীক দুর্গগুলি আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন এবং ধীরে ধীরে সমগ্র পঞ্জাবের প্রভু হইয়া বসেন ।

এইরূপে তিনি যখন আপনাকে যথেষ্ট বলসম্পন্ন বলিয়া বুঝিলেন, তখন আর অপেক্ষা রহিল না । তিনি সাহস সহকারে পূর্বমুখে মগধের দিকে রণ-যাত্রা করিয়া নন্দকে আক্রমণ করিলেন । নন্দ যুদ্ধে পরাজিত, সিংহাসনচ্যুত ও তৎকর্তৃক সর্বংশে নিহত হইলেন । তাঁহার জননীর নাম অনুসারে এই বংশ মোর্য বংশ নামে খ্যাত হইল । মোর্য রাজ-বংশ ১৩৭ বৎসর কাল মগধ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । ভারতীয় শ্রেষ্ঠতম নৃপতিদিগের দুই জন এই বংশসম্ভূত ।

৩। চন্দ্রগুপ্ত ইহার পরে তাঁহার সেনাবল বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ক্রমে ৬০০,০০০ পদাতি, ৩০০০০ অশ্বারোহী এবং ২০০০ করীসৈন্তে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এই বিপুল সৈন্য দ্বারা ক্রমে উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্য লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া লন। এইরূপে বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত, নর্মদার উত্তর-বর্তী সমস্ত ভূভাগ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

৪। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার গ্রীক সেনাপতিদিগের মধ্যে সিলুকাস্ সিরিয়ার রাজ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে আলেকজান্ডারের অনুকরণে পঞ্জাব আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হন, এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও পশ্চাৎ অপসারিত করিয়া দেন। অবশেষে উভয় সম্রাটে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। সন্ধির সর্ত্তগুলি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষেই অধিকতর লাভজনক হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত সিলুকাসকে ৫০০ শত হস্তী প্রদান করেন; কিন্তু এই হস্তীর বিনিময়ে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পর্য্যন্ত,—বর্ত্তমান সময়ে আফগানিস্থান নামে পরিচিত, সমস্ত ভূভাগের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সিলুকাসের কন্যা বিবাহ করেন এবং মেগাস্থিনিন্স নামক একটি গ্রীক রাজকর্মচারীকে রাজদূতরূপে স্বীয় রাজধানীতে রাখেন। মেগাস্থিনিন্স মগধের রাজধানী পালিবোথ্রা বা পাটলীপুত্র নগরে বহুবৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরভারতের ভৌগোলিক অবস্থা, উৎপন্ন দ্রব্য, অধিবাসী এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার, রাতি নীতি, ধর্ম ও রাজকীয় শাসন-প্রণালীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সন্ধি স্থাপনের ছয় বৎসর পরে, খৃঃ পূঃ ২৯৭ অব্দে, রাজা চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার পুত্র বিন্দুশর মগধ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

৫। এক্ষণে যেখানে পাটনা, ঠিক সেই স্থানে গঙ্গার তটে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগর অবস্থিত ছিল। পাটলীপুত্রের দৈর্ঘ্য নয়

মাইল, বিস্তার দেড় মাইল। উহার চারিদিকে অতি বৃহৎ কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীর এবং ঐ প্রাচীরে চৌষটি টি দ্বার ছিল। প্রাচীরের বহির্ভাগ গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। রাজ-প্রাসাদ বিস্তৃত ভূমিতে অবস্থিত ছিল। প্রাসাদটি নানা শোভার আধার প্রকাণ্ড অট্টালিকা। রাজ-দরবারের আড়ম্বর অপরিমিত। রাজা মুক্তাস্তবকে সজ্জিত সূবর্ণ শিবিকায় বহির্গত হইতেন। মেঘ, ষণ্ড, হস্তী ও গণ্ডারের লড়াই তাঁহার নিকট বড়ই প্রীতিকর আমোদ ছিল। মৃগয়ার নিমিত্ত রক্ষিত বহু স্থান ছিল। রাজা ঐ সকল স্থানে মৃগয়া করিতেন। শিকারের জন্ত পশুদিগকে তাড়াইয়া রাজার দিকে লইয়া যাওয়া হইত, সুতরাং শিকার অশ্বেষণের ক্লেশ রাজাকে ভোগ করিতে হইত না। রাজ-প্রাসাদ সশস্ত্র রমণী কর্তৃক পরিরক্ষিত ছিল। ‘মুদ্রারাক্ষস’ নামক ভারতীয় নাটকে চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবার বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ-সংহারার্থ সর্বদাই ষড়যন্ত্র চলিত। এই হেতু, তিনি কখন ক্রমে দুই রাজ্য একঘরে শয়ন করিতে সাহস পাইতেন না। তাঁহার সূবৃহৎ সৈন্ত-দল সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। সৈন্তেরা প্রচুর বেতন পাইত। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে অশ্ব, অস্ত্র, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করিতেন।

৬। সৈনিকবিভাগের কার্য পরিচালনার জন্ত, একটি সামরিক কার্যালয় ছিল। এই কার্যালয় ছয়টি বোর্ড বা পঞ্চায়েতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বোর্ড বা পঞ্চায়েতে পাঁচ জন করিয়া সভ্য থাকিতেন। এক এক শ্রেণীর সৈন্ত এক এক বোর্ডের বা পঞ্চায়েতের অধীন ছিল। এক বোর্ডের অধীন পদাতি; অন্য বোর্ডের, অশ্বারোহী; তৃতীয় বোর্ডের অধীন রথ বা চারিয়ট; চতুর্থের, করী সৈন্ত; পঞ্চম বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সেনা সমূহের খাদ্য সামগ্রী এবং ষষ্ঠ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ছিল,—নৌকা ও নদীপথে কার্য করিবার নিমিত্ত ছোট ছোট জাহাজ।

৭। এই সামরিক বিভাগের কার্য্য যেরূপ সতর্কতার সহিত পরিচালিত হইত, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, চন্দ্রগুপ্তের সেই অসামান্য বীরকর্মে বিশ্বাসের বিষয় আর কিছুই থাকে না ;—তিনি গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কিরূপে সমগ্র উত্তরভারত জয় করিয়া আপনার বশে রাখিয়াছিলেন, সমস্তই স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই, তিনি তাঁহার রাজ-শক্তি এরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য, অনায়াসে বিনা বাধা বিপত্তিতে, প্রথম পুল ও তৎপর পৌত্রের হাতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

৮। রাজ্যের দেওয়ানী বিভাগেও, সেনা-বিভাগের আয়, মনোযোগ বিহিত হইয়াছিল। রাজধানী পাটলীপুত্র নগর মিউনিসিপাল সভার অধীন ছিল। এই সভার মেম্বর বা সভ্য ত্রিশ জন। সামরিক কার্যালয়ের আয় এই সভাও ছয়টি বোর্ড বা পঞ্চায়েতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বোর্ডের সভ্য সংখ্যা পাঁচটি। নগরের সমস্ত কার্য্য এই সকল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। তাঁহারা সাধারণের কার্য্য-কলাপে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। এক বোর্ড বা পঞ্চায়েত সর্বপ্রকার শিল্প ও শ্রমজাত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন ; দ্বিতীয় বোর্ডের কর্ম্ম ছিল নগরে উপস্থিত পরিদর্শক ও বিদেশী লোকদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখা। এই বোর্ডই তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দেশ ও আহাৰ্য্যের বন্দোবস্ত করিতেন। যখন তাঁহারা পরিদর্শনার্থ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন বোর্ড তাঁহাদিগের পরিরক্ষক ও পথ-প্রদর্শক সঙ্গী নিযুক্ত করিয়া দিতেন। বিদেশী পরিদর্শক ও পর্য্যটকদিগের কেহ পীড়িত হইলে, বোর্ড তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন ও তাঁহাদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেন ; এবং তাঁহাদিগের কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বা সমাধি, বোর্ডের তত্ত্বাবধানে হইত । বোর্ড মৃত ব্যক্তির কাছে যে কিছু সম্পত্তি পাওয়া যাইত, তৎসমস্ত তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিতেন । তৃতীয় বোর্ড বিশেষ সতর্কতার সহিত জন্ম মৃত্যুর রেজেষ্ট্রারী বা তালিকা লিখিয়া রাখিতেন । লোক-সংখ্যার উপর জন প্রতি টেক্স বা কর-অবধারণও এই তৃতীয় বোর্ডের কার্য্য ছিল । চতুর্থ বোর্ড বাণিজ্য ব্যবসায়, বাটখারা ও পরিমাপক যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং সওদাগর বা বণিগদিগের উপর লাইসেন্স টেক্স ধার্য্য করিতেন । শিল্পী কারিকরদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থার ভার পঞ্চম বোর্ডের হাতে ছিল । ইহা ব্যতীত, নূতন বস্তু বলিয়া কেহ পুরাতন দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বঞ্চনা করিতে না পারে, পঞ্চম বোর্ডকে তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইত । ষষ্ঠ বোর্ড ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে নিয়ম অবধারণ করিয়া দিতেন । সর্ববিধ বিক্রীত দ্রব্যের উপর মূল্যের দশম অংশ কর বা টেক্স ধার্য্য করা হইত ।

৯ । মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন,—তিনি ঐ সময়ে ভারতে হিন্দুজাতির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, পুরুষেরা সাহসী ও সত্যবাদী এবং স্ত্রীলোকেরা পুতপ্রকৃতি ও সতী । দাস মাত্রই ছিল না । সকলেই সকলকে বিদ্ভাব করিত । চোর ছিল না । লোকে ঘরে তালা বন্ধ করিত না । দেশের লোকেরা কদাচিৎ আইন আদালতের আশ্রয় লইত । মেগাস্থিনিস্ বলেন,—তখন ভারতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ১১৮টি রাজ্য ছিল । ভারতবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্টিগোচর হইত, এক শ্রেণী শ্বেতকায় আর এক শ্রেণী কৃষ্ণবর্ণ । বলা বাহুল্য যে,—এই শ্বেত-কায়েরাই উচ্চশ্রেণীস্থ আৰ্য্য-জাতি,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইত্যাদি ; এবং কৃষ্ণকায়েরা আদিম ভারতবাসীর সহিত সংপৃক্ত শূদ্র ও নীচজাতীয় লোক । প্রত্যেক গ্রাম আপনাতে আপনি সর্বাধিকার পূর্ণ ছিল ; কোন বিষয়ে এক গ্রাম অন্য গ্রামের মুখাপেক্ষী হইত না । কারণ, প্রত্যেক গ্রামে সকল জাতি, সকল শ্রেণী ও সকল ব্যবসায়ের লোক

বাস করিত । দেশীয় রাজা ও সর্দারদিগের শাসনে লোক বড়ই সুখে ও শান্তিতে ছিল ।

১০। দুই হাজার বৎসরেরও অনেক পূর্বে, রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে, উত্তরভারত ক্রীকপ সুসভ্য ছিল, এই বিবরণ পাঠে তাহা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইবে । অধুনা একান্ত সভ্যতাবাপন্ন নূতন জাতিসমূহের মধ্যে সমর-বাপারে যেক্রপ উদার-নীতির অনুসরণ হয়, সেই পুরাতন কালে, ভারতেও তদ্রূপ সদয় জ্ঞান-নীতি দ্বারা যুদ্ধকাণ্ড পরিচালিত হইত । পরবর্তী সময়ে, রণ-কাণ্ডে যেক্রপ নিষ্ঠুর ও নির্দয় অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতিহাসাদিতে পাঠ করি, তখনকার ভারতীয় রণ-নীতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু ছিল । মেগাস্থিনিস বলেন, “ভারতবাসীর চক্ষে কৃষকশ্রেণী সর্বথা পবিত্রসম্প্রদায়রূপে গণ্য ছিল । এমন কি, যখন অতি সন্নিহিত স্থানেও যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছে, তখনও কৃষককুল সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট ও নিরাপদ রহিতে পারিয়াছে । প্রতিবন্দী যোদ্ধারা যদিও পরস্পর প্রাণসংহার করিয়াছে, কিন্তু তাহারা কৃষকের কেশাগ্রও স্পর্শ করে নাই । কোন যুদ্ধেই বিপক্ষের ভূমিকে অনলসহযোগে বিধ্বস্ত কিংবা বৃক্ষাদি ছেদন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা হইত না ।

(১৬)

বৌদ্ধযুগের প্রধান প্রধান রাজা ও রাজ্য ।

খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৭০০ = ১০০০ বৎসর ।

১। আমরা যতদূর দেখিতে পাই, পুরাতন হিন্দুযুগে উত্তরভারতে মগধরাজাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । এক্ষণে যে প্রদেশের নাম বিহার, মগধ সেই প্রদেশের অস্থানিবিষ্ট । প্রাচীন কালে উহা বিদেহদিগের রাজ্য ছিল । বৌদ্ধযুগে মগধ অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে । বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই মগধরাজ বিশ্বশর তাঁহার উপদেশ গুলিয়া

মৌর্যরাজ—অশোক ।

স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । রাজগৃহে মগধের রাজধানী ছিল । ইহার পরবর্তী রাজবংশ শূদ্র জাতীয় । এই রাজবংশ ইহার স্থাপয়িতা রাজা নন্দের নামানুসারে নন্দবংশ নামে খ্যাত হইয়াছিল । ইহারা শোণ নদী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানে পাটলীপুত্র নগরে রাজধানী স্থাপন করেন । আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন এই বংশের রাজকুমার,—পঞ্জাবে পলায়িত চন্দ্রগুপ্ত মগধের তদানীন্তন রাজা নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মানসে আলেকজান্ডারের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে মগধ আক্রমণ করিয়া মগধ জয় করিতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু আলেকজান্ডারের সৈন্যগণ কিছুতেই অতদূর যাইতে সম্মত হয় নাই । ইহার পরে, আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান । স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার পথে আলেকজান্ডারের যে পরিণাম ঘটিল এবং আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের পরে, চন্দ্রগুপ্ত যে ভাবে সৈন্য সংগ্রহ, মগধ আক্রমণ ও নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মগধ সিংহাসন অধিকার করিলেন, আমরা সে কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলিয়াছি ।

(১৭)

মৌর্যরাজ—অশোক ।

খৃঃ পূঃ ২৭২—২৩২ ।

১ । অশোক, রাজা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র । পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল রাজা 'The great' (দি গ্রেট) বা 'মহান্' এই উচ্চ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন, রাজা অশোকও তাঁহাদিগেরই একজন । তিনি চতুর্দশ বৎসর কাল তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । এই সুদীর্ঘ রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই শাসন-কার্য্য এমন ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সর্ব্বাংশেই লোকবৎসল সৃজন বলিয়া সম্মান করা

মাইতে পারে। তিনি কলিঙ্গ ভিন্ন সমস্ত উত্তর ও মধ্যভারত রাজ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ, এই দুই প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতির পঞ্চাশবৎসরব্যাপী অপ্রতিহত স্থির-শাসন-বলে এই সাম্রাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি স্বয়ং কলিঙ্গ রাজ্যও আপনার অধীন ও অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

২। তদীয় রাজত্বকালের প্রথম এগার বৎসরের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। দ্বাদশ বৎসরে তিনি প্রথম যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহার জীবনে ইহাই প্রথম ও শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ ও জয় করিয়া লন। কলিঙ্গের বর্তমান নাম উড়িষ্যা। কলিঙ্গ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কলিঙ্গবাসী স্বদেশ রক্ষার জন্য ক্রমে তিন বৎসর-কাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। রাজা অশোক স্বয়ং শোকসন্তপ্তচিত্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, এই রণ-কাণ্ডে ১৫০,০০০ দেড় লক্ষ লোক বন্দী, ১০০০০০ এক লক্ষ লোক নিহত এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকতরসংখ্যক লোক দুর্ভিক্ষ ও মারীর আক্রমণে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই শোচনীয় অবস্থাদর্শনে অশোকের প্রাণ এমন গভীরতম দুঃখ ও অনুতাপপূর্ণ হইয়া উঠে যে, তিনি ভবিষ্যতে আর কখন রণ-ব্যাপারে লিপ্ত হইবেন না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প অক্ষরে অক্ষরে রক্ষিত হইয়াছিল।

৩। এই সময়েই রাজা অশোক বৌদ্ধধর্মের দীক্ষিত হন। তিনি বৌদ্ধ হইয়া “পিয়দাসী” অর্থাৎ দেবতাদিগের প্রিয়, এই উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তদীয় রাজত্বকালের অবশিষ্ট সময়, ভারতের সর্বত্র ধর্ম বা ধর্মনীতি প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহা কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম, ভারতের রাজ-ধর্ম রূপে পরিগণিত হয়। তিনি ভারতের বহিঃস্থ অন্যান্য দেশেও ধর্ম-প্রচারার্থ বহুসংখ্যক প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৪। তিনি রাজত্ব কালের ষোড়শ ও সপ্তদশ বৎসর, তাঁহার আপন শাসন-কার্যের বিধিব্যবস্থা প্রজা সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপিত করেন। সেই সঙ্গে কিরূপে সকলে সং, সাধু ও পবিত্র জীবন যাপনে সমর্থ হইতে পারে, তৎসংক্রান্ত উপদেশনিচয়ও প্রকটিত হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে চৌদ্দটি ঘোষণা দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করা হয়। ঘোষণাগুলি পাহাড়ের গায়ে খোদিত হইয়াছিল। খোদিত ঘোষণাসমূহ এখনও অনায়াসে পঠিত হইয়া থাকে।

৫। তাঁহার রাজত্ব কালের ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইলে পর, খৃঃ পূঃ ২৬২ অব্দে, তিনি স্তম্ভের সঙ্গে পুনরায় নূতন একাদশটি অনুজ্ঞা মুদ্রিত করেন। প্রাণীহত্যার পদ্ধতিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। এই একাদশ অনুজ্ঞায় এই প্রাণীহত্যাসম্বন্ধেই নূতন বিধান প্রচারিত হইয়াছিল। শেষোক্ত ঘোষণা মুদ্রণের দুই বৎসর পরে, তিনি গৈরিক বসন পরিয়া সন্ন্যাসী হন। যদিও তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তথাপি সিংহাসন ত্যাগ করেন নাই। সম্ভবতঃ রাজ্যের অধিকাংশ কার্য-ভার পুত্র ও মন্ত্রীদিগের হস্তে ত্রস্ত হইয়াছিল।

৬। অশোক অতি বিস্তৃত ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। সম্ভবতঃ ভারতে ইতঃপূর্বে কখন কোন রাজা ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্যের উপর আধিপত্য করেন নাই। এমন কি, পরবর্তী সময়ের, মহান্ আকবরের সাম্রাজ্যও, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা বড় হইবে না। অশোকের অধিকার উত্তরপশ্চিমদিকে হিন্দুকুশ পর্বত-মালার প্রান্তে যাইয়া ঠেকিয়াছিল; অর্থাৎ বর্তমান সময়ে সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্থান ও আফ্গানিস্থান নামে পরিচিত, সমস্ত ভূভাগ অশোক রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উত্তরে কাশ্মীর ও নেপাল ইহার অন্তর্ভুক্ত। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর রাজ্য অশোক কর্তৃক স্থাপিত হয়। পূর্বদিকে অশোক-রাজ্য বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত প্রাস করিয়াছিল। অশোক গোদাবরী ও কৃষ্ণা-

নদীর মধ্যবর্তী তেলেগু দেশ বা অন্ধ্ররাজ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রাজ্য তদেণীয় রাজ্য কর্তৃক শাসিত হইত সত্য, কিন্তু অশোক তাঁহাদিগের রক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। দক্ষিণ দিকে, বোধ হয়, পলার নদীই তাঁহার রাজ্যের প্রান্তসীমা ছিল। অশোকের পর্লত-খোদিত ঘোষণাপত্রে, এই সময়ে দক্ষিণভারতে চারিটি স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। সেই চারি রাজ্যের দুটি পশ্চিম-ঘাট গিরির পূর্ববর্তী পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য, এবং দুটি পশ্চিম উপকূলস্থিত কিরাল পুত্র অথবা মালবার এবং সতাপুত্র বা কানাড়ার তুলুদেশ।

৭। অনেক কাল হইল, রাজা অশোক-নির্মিত বড় বড় অট্টালিকা সমূহের প্রায় সমস্তই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যে সকল স্তম্ভের অঙ্গে তাঁহার অনুজ্ঞা-লিপি বা ঘোষণাপত্র মুদ্রিত করিয়া-ছিলেন, সেগুলি এখনও অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে। কতিপয় স্তম্ভের উচ্চতা ৫০ ফুট এবং ওজন ৫০ টনের উপরে। এই সকল স্তম্ভ সাম্রাজ্যের প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের ঘোষণাপত্র বা অনুজ্ঞা-লিপির কতক খোদিত হইয়াছিল পর্লতের অঙ্গে, কতক প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভে ও কতক গুহার গায়ে। এই সকল খোদিতলিপি হইতেই আমরা অশোক-রাজ্যের ইতিহাস অবগত হই। খোদিত লিপিগুলি যেন সর্বসাধারণেই পাঠ করিতে সমর্থ হয়, এই উদ্দেশ্যে উহা প্রাকৃত বা দেশ-প্রচলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

৮। ধর্ম বা সদাচার। রাজা অশোক খোদিতলিপি বা ঘোষণা দ্বারা তদীয় প্রজাসাধারণের মধ্যে যেক্রপ ধর্মনীতি প্রচার করিয়া-ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এই :—

(১) কোন প্রাণী হত্যা করিবে না।

(২) পিতা, মাতা ও শিক্ষককে ভক্তি ও বয়োবৃদ্ধকে সম্মান করিবে।

(৩) সত্যকথা কহিবে ।

(৪) অন্তের কুৎসা করিবে না । নিন্দা দ্বারা অপরের ধর্ম ও ধর্ম-
বিশ্বাসের উপর আঘাত করিবে না । মন্দ কথা মুখে আনিবে না ।

(৫) হৃদয়, মন ও জীবনে বিগুণ ও পবিত্র থাকিবে ।

(৬) ভৃত্য ও দাসদিগের প্রতি সদয় ও বদান্ত হইবে ।

৯। কোন প্রাণী, এমন কি ক্ষুদ্রতম কীটটিকেও হত্যা বা আঘাত করা মহাপাপ । ইহাই সকল বিধিব্যবস্থার মূল বিধান । অশোক এতৎ সম্পর্কে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস উপদেশ দ্বারা যেমন অন্তকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তেমন নিজেও সেই বিশ্বাসের অনুরূপ কার্যদ্বারা উহার গৌরব বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন । তদীয় রাজত্বের প্রারম্ভে রাজ-পরিবারের ভোজ-ব্যাপারে হাজার হাজার প্রাণী হত্যা হইত । এই সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতে পাইতে, মাত্র তিনটিতে পরিণত হয় । রাজকীয় ভোজে দুটি ময়ূর ও একটি মৃগ নিহত হইত । অবশেষে, এই তিনটি মাত্র প্রাণী হত্যাও রহিত হইয়া যায়, এবং আমিষ ভোজন এক-
বারেই পরিত্যক্ত হয় । মৃগয়া অশোকের পিতা ও পিতামহের সর্ব-
প্রধান আমোদজনক অন্তর্ধান ছিল । রাজা অশোক মৃগয়া সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । তৎকৃত ব্যবস্থাগ্রন্থে নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রাণী হনন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল । যে সকল জাতির প্রধান আহার মাংস, মাত্র তাহারাই কএক প্রকার পশু হত্যা করিতে পারিত । কিন্তু এই প্রাণী হত্যাও বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট ৫৬ দিন নিষিদ্ধ ছিল ।

১০। প্রজাসাধারণকে সন্যাসহার শিক্ষা ও পরস্পরের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দান, সমস্ত রাজকর্মচারীরই নিয়মিত কার্যের এক অঙ্গ স্বরূপ ছিল । তাঁহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত এবং এই কর্মের জন্য কতিপয় দিন পৃথকরূপে নির্ধারিত থাকিত ।

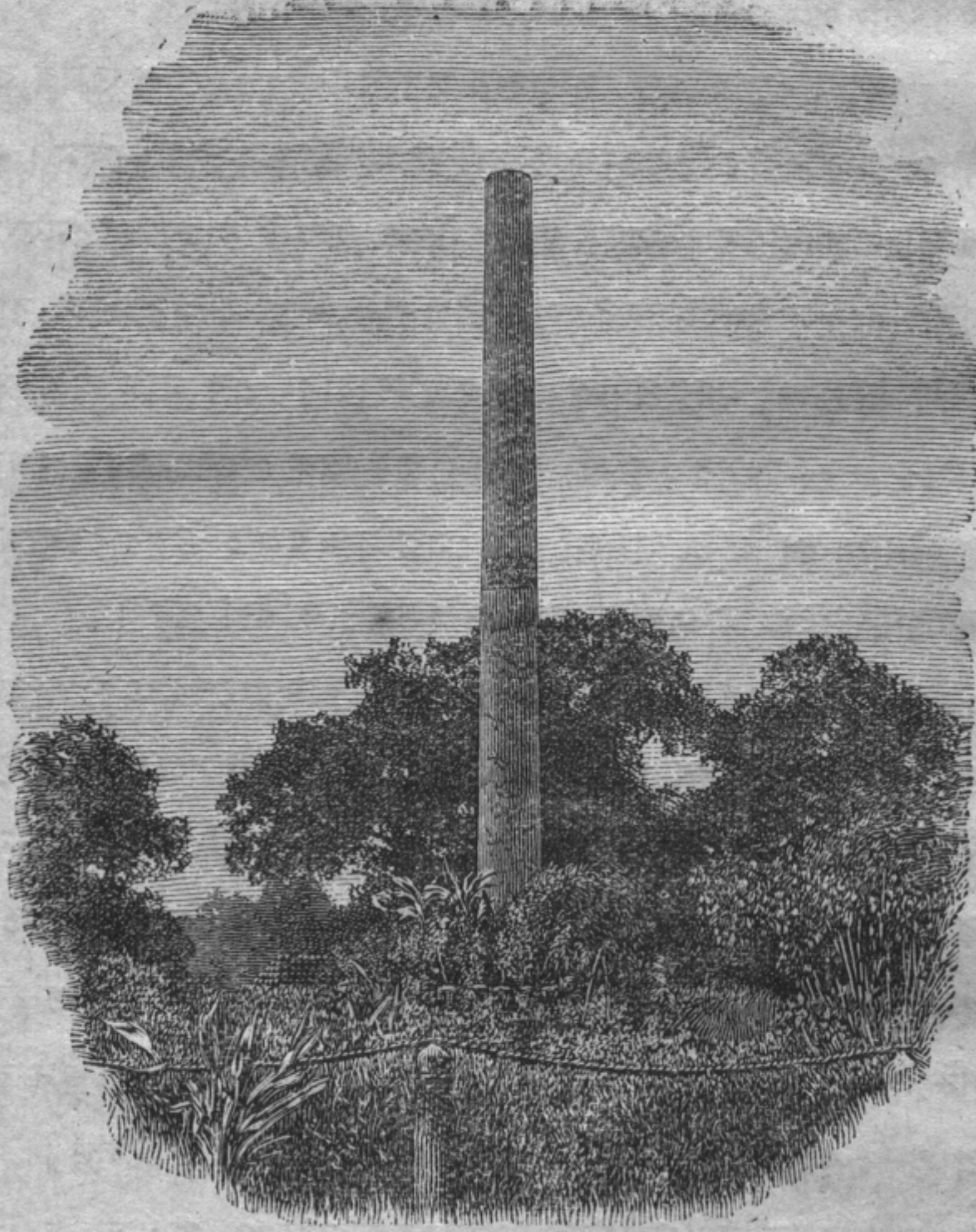
১১। অশোকের রাজ্যে পথিকদিগের সুখ-সুবিধার জন্ত বিশেষ

সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । রাজা অশোকের প্রস্তরলিপিতে লেখা আছে, “আমি মনুষ্য ও পশুদিগকে, রোদ্দের সময় ছায়া দানের জন্ত, পথে পথে অশ্বখ বৃক্ষ রোপণ করাইয়া রাখিয়াছি ; স্থানে স্থানে আম্র-বাগান করাইয়াছি ; প্রত্যেক অর্ধ ক্রোশ (অর্থাৎ দুই দুই মাইল অন্তরে) কূপ খনন ও বিশ্রাম-আগার নিৰ্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছি ; এবং তৃষ্ণার্ত মানুষ্য ও পশুদিগের জলপানের জন্ত উপযুক্ত স্থান নির্দেশ ও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি ।” যেমন মানুষ্য, তেমন পশু প্রভৃতির জন্তও বহু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সকল চিকিৎসালয় শুধু অশোকের অধিকৃত সাম্রাজ্য মধ্যেই ছিল এমন নহে, স্বাধীন রাজ্য-গুলিও এই শ্রেণীর চিকিৎসালয়ে বঞ্চিত ছিল না ।

১২। রাজা অশোক তাঁহার ধর্মকেই জগতে একমাত্র সত্য ধর্ম বলিয়া সরলপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন । অন্তরাও এই পরম-পবিত্র সত্য ধর্মের ফলভাগী হউক, এই সাধু-ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া, তিনি দেশ-দেশান্তরবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতিনিবহের নিকট, এই সত্য ধর্ম প্রচারের জন্ত বহুসংখ্যক প্রচারক প্রেরণ করেন । দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্য-সমূহ, সিংহল, (সিলোন), সিরিয়া, মিশর, তুর্কস্থান ও তদীয় রক্ষণাধীন রাজ্য অন্ধ্রদেশ এবং তিব্বত ও আফ্গানিস্থানে প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল । অশোক তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহেন্দ্রকে সিংহল বা সিলোনে প্রচারকরূপে পাঠাইয়া দেন । মহেন্দ্র একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন । তিনি সিলোনের তদানীন্তন রাজা তিচ্ছা (Tissa) কর্তৃক বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হন । বৌদ্ধধর্ম কালে সিলোনের প্রধান ধর্মরূপে গণ্য হইয়া উঠে এবং এখনও ইহাই সিলোনের প্রধান ধর্ম । মহেন্দ্র এই স্থানেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন । এখনও তিনি সিলোনে স্বর্গগত মহাত্মা বা মহাপুরুষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন ।

১৩। অশোক স্বয়ং কঠোর পরিশ্রম করিতেন । তিনি বলিতেন

“আমি আমার যাহা করা আবশ্যক, তাহা করিয়াছি মনে করিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না।” সম্ভবতঃ প্রস্তরখোদিত লেখাগুলির সমস্তই তাঁহার নিজের রচনা । কারণ, ঐ সকল খোদিত অক্ষরে তাঁহার আত্ম সম্পর্কে যাহা লেখা আছে, কোন কর্মচারী কখনই



এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভ ।

অমন স্পষ্টাক্ষরে তাহা বলিতে সাহসী হইতে পারে না । সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে, যে সকল রাজা ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন,

তঁাহাদিগের মধ্যে রাজা অশোক সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও, শ্রেষ্ঠতম নৃপতি-
দিগেরই যে অন্তর, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

১৪। অশোকের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে, মৌর্য রাজবংশ বিলুপ্ত
হইয়া যায়। ইহার পর অত্র দুটি রাজবংশ মগধে রাজত্ব করেন। কিন্তু
তঁাহাদিগের নাম ভিন্ন আর কিছুই জানা যায় না। অশোকের প্রায়
দুই শত বৎসর পরে, অকুগণ মগধ রাজ্য অধিকার করেন।

১৫। অর্থাৎ অশোকের এক সম্প্রদায় গঙ্গার তটবর্তী দেশ ত্যাগ করিয়া
মহানদী ও গোদাবরীর উপত্যকায় যাইয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তঁাহা-
রাই অকু নামে পরিচিত। অকুরা ঐ দিকে একটি রাজ্য স্থাপন করেন।
তেলিঙ্গানা সহ দাক্ষিণাত্যের পূর্বভাগ শত শত বৎসর এই রাজ্যের
শাসনাধীন ছিল। অদ্য পর্য্যন্ত তেলেগু ভাষার এক নাম অকু ভাষা।
খৃষ্টের প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে, তদানীন্তন অকুরাজ্য মগধ রাজ্যটিকে
নিতান্ত হীনবল দেখিতে পাইয়া, বহু সৈন্য সামন্ত সহ উত্তরাভিমুখে যুদ্ধ-
যাত্রা করেন; এবং মগধরাজ্য জয় ও হস্তগত করিয়া লন।

১৬। ইহার পরে ৩০০ বৎসরকাল অকু রাজবংশের এক শাখা মগধ
ও সমস্ত পূর্বভারত শাসন করেন এবং দাক্ষিণাত্য ঐ বংশেরই অত্র এক
শাখার শাসনাধীন থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, এই সময়টাই
খৃষ্টাব্দের প্রথম ৩০০ বৎসর কাল। প্রথমে বেক্টিয়ারি গ্রীক, তৎপরে
সিথিয়ানেরা পঞ্জাবে ও ভারতের উত্তরপশ্চিম ভাগ পরাজিত করিয়া
আপনাদিগের শাসনাধীন রাখিয়াছিল। অকুরাজবংশে ২৪ জন রাজার
নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তঁাহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। অকু
রাজাদিগের প্রভাবে সিথিয়ানেরা ভারতের মধ্য ও পূর্বভাগে প্রবেশ
লাভ করিতে পারে নাই।

(১৮)

ইণ্ডো সিথিয়ান ।

১। মধ্য এসিয়ায় যে সকল জাতি বাস করিত, গ্রীকেরা তাহা-
দিগকে সিথিয়ান এবং তাহাদিগের বাসভূমিকে সিথিয়া বলিতেন। মধ্য
এসিয়ায় সিথিয়ানদিগের বহু সম্প্রদায় ছিল। যুগ-যুগান্ত পূর্বে, আর্যেরা
যে ভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সিথিয়ান সম্প্রদায় গুলিও সেই
ভাবে, একটির পর একটি, ভারতে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ প্রায়
১৫০ অব্দ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৫০০ পাঁচ শত বৎসরের
উর্দ্ধকাল, তাহারা এইরূপে ভারতে আগমন করিতে থাকে। তাহারা
ভারতে প্রবেশ করিয়া ক্রমে কাশ্মীর, আফ্গানিস্থান, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ,
গুজরাট ও মধ্য ভারতের পশ্চিম অংশে অধিষ্ঠিত হয়। বোধ হয় প্রথমতঃ
তাহারা ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া পঞ্জাব ও গ্রীক রাজগণের অধিকৃত
রাজ্যের পার্শ্বে পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়াছিল এবং অবশেষে,
ক্রমে সমস্ত দেশ জয় করিয়া লইয়াছিল।

২। শক ।—সিথিয়ান সম্প্রদায়নিবহের মধ্যে শক নামে পরিচিত
সম্প্রদায়ই প্রথম ভারতে আগমন করে। ভারতে প্রবেশ করিয়া
তাহারা সিন্ধু প্রদেশ, মালোয়া ও পশ্চিম ভারতে আপনাদিগের পথ
করিয়া লয়। এই অঞ্চলে (Western Satrap) পাসাত্য শাসনকর্ত্তা
নামে পরিচিত, শূন্যবর্ষ শক রাজবংশ মালোয়ার উজ্জয়িনীতে রাজধানী
স্থাপন করিয়া, প্রায় ৪০০ শত বৎসর কাল, রাজত্ব করিয়াছিল। ৪০০
খৃষ্টাব্দে মহাপ্রতাপশালী হিন্দুরাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তক এই রাজবংশ
উৎসন্ন হইয়া যায়।

৩। কণিষ্ক, কুশল নামক অপর একটা ইণ্ডোসিথীয় সম্প্রদায়ের
একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ৪৫ হইতে ২২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায়

১৮০ বৎসর কাল, কুশলেরা উত্তরভারতে রাজত্ব করেন। পুরুষপুর বা পেশোয়ার কণিক্ষের রাজধানী। তিনি পঞ্জাব, কাশ্মীর, এবং সিন্ধু প্রদেশের উপর শাসন-হস্ত পরিচালনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত তুর্কস্থান ও আফ্গানিস্থানও তাঁহার অধিকারে ছিল। কণিক্ষের নামাঙ্কিত তাঁহার সময়ের বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি গৌড়া বৌদ্ধ ছিলেন। ১৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহা কর্তৃক কশ্মীরে এক বৃহৎ বৌদ্ধ-সমিতি আহূত হয়। সমিতির কার্য শেষ হইয়া গেলে, তিনি বৌদ্ধ সম্রাসীদিগকে ধর্মপ্রচারার্থ মধ্য এশিয়া ও চীন দেশে পাঠাইয়া দেন। মধ্য এশিয়া ও চীন দেশ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ দেশ হইয়া পড়ে।

(১৯)

গুপ্ত রাজাদিগের সাম্রাজ্য।

১। বৌদ্ধ যুগের অবসান সময়ে, গুপ্ত নামে পরিচিত এক রাজবংশ মগধ-সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছিলেন। খৃষ্টাব্দ ৩০০ হইতে ৬০০ পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর কাল, তাঁহাদিগের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বংশের দুটি রাজা বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের এক জনের নাম সমুদ্রগুপ্ত, অপর জনের নাম চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য।

এই চন্দ্রগুপ্তের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে মৌর্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত আর এই চন্দ্রগুপ্ত এক ব্যক্তি নহেন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই ইহাকে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য বলা হইয়াছে।

২। সমুদ্রগুপ্ত (খৃষ্টাব্দ ৩২৬—৩৭৫) অতীব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি বৃহৎ এক দল সেনা সহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সমস্ত মধ্যভারত ও দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি যে সকল দেশের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেশের রাজারাই তাঁহার নিকট

যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও রাজ্য আপনার অধিকার-ভুক্ত করেন নাই। কেবল প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। গাঙ্গেয় প্রদেশ অর্থাৎ গঙ্গার উপত্যকাস্থিত সমস্ত রাজ্যের উপরই তিনি প্রভুত্বান্বিত ছিলেন। তিনি যে কেবল ক্ষমতাশালী রাজা এমন নহে, তিনি একজন বড় কবি ও সুদক্ষ বীণাবাদক ছিলেন।

৩। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (খৃষ্টাব্দ ৩৭৫—৪১৩) সমুদ্রগুপ্ত অপেক্ষাও অধিকতর প্রতাপশালী বড় রাজা ছিলেন। তিনি “বিক্রমাদিত্য” অর্থাৎ পরাক্রমে সূর্যাস্বরূপ এই উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি এই নামেই হিন্দু লেখকগণ কর্তৃক, বিবিধগুণের উল্লেখ, সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সম্রাটরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। তিনি বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সিন্ধু নদের উপত্যকা, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, গুজরাট ও মালোয়াতে গমন করেন। এই সমস্ত স্থান বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া শক বা পাশ্চাত্য শাসন-কর্তাদিগের শাসনাধীন ছিল। তিনি শকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদিগের রাজ্য আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লন। এই হেতু, বিক্রমাদিত্যের আর এক উপাধি শকারি বা সিথিয়ান-হস্তা।

৪। বিক্রম সচরাচরই মহান্ বিক্রমাদিত্য নামে অভিহিত হইতেন। তিনি তাঁহার সেই যুগের অন্য সমস্ত হিন্দু রাজা অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য যেমন সাহসী, তেমনই বিদ্যাভুরাগী ও বিদ্বান্। তাঁহার রাজসভা নয়টি পণ্ডিত-বলে অলঙ্কৃত ছিল। এই নয়জন নবরত্ন নামে সর্বত্রপ্রসিদ্ধ। নবরত্নের মধ্যে মহা-কবি কাশিদাস সর্বশ্রেষ্ঠরত্নরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৫। শকুন্তলা, রঘুবংশ, মেঘদূত ও কুমারসম্ভব তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। নবরত্নের অপর রত্ন অমরসিংহ। অমরসিংহ-কৃত, সংস্কৃত ছন্দে রচিত অভিধান অমরকোষ নামে ভারতীয় সংস্কৃত শিক্ষাস্থান মাত্রেই পরিচিত ও আদৃত। চতুর্থ রত্ন ধনস্তুরি চিকিৎসক। পঞ্চম বরকটি।

তৎকালে যে সংস্কৃত বা প্রাকৃত কথ্যভাষারূপে প্রচলিত ছিল, বরুচি সেই ভাষার একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ভাষা প্রাচীন কালের লিখিত সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু ছিল। ষষ্ঠ রত্ন মহান্ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির। বিক্রমাদিত্যের সময়েই পঞ্চতন্ত্র উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র অতঃপর পারসী ও আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। অবশেষে, ইউরোপের নানা ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের জীবনী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত এবং আরও কতকগুলি কাহিনী বিক্রমের উপাখ্যান নামে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল উপাখ্যান এখনও ভারতের গ্রামে গ্রামে কথিত হইয়া থাকে।

৬। বিক্রমাদিত্যের সময়ে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। কবি কালিদাসের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখন দেব-মন্দির ও দেব-বিগ্রহ পবিত্র বস্তুরূপে সম্মানিত ছিল, এবং বহুলোকে হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিত। বিক্রমাদিত্য স্বয়ং শিবের উপাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহার নবরত্নের একজন বৌদ্ধ ছিলেন। তিনিই বৌদ্ধযুগের সর্বশেষ প্রধান রাজা। তিনি যেমন বৌদ্ধ-যুগের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ রাজা, তেমন পরবর্তী হিন্দু বা পৌরাণিক যুগেরও সর্বপ্রথম বড় রাজা। পুরাতন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করে তিনি তাহার সমসাময়িক অন্ত রাজা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য করিয়াছিলেন।

(২০)

হুন । (৪৫০—৫২৮ খৃষ্টাব্দ)

১। হুন নামে পরিচিত মোগলজাতীয় কতকগুলি বহু লোক খৃষ্টীয় প্রায় ৪৫০ অব্দে পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া সেই প্রদেশে অধিষ্ঠিত হয়। হুনেরাই গুপ্তরাজ্যের ধ্বংস সাধন করে। তাহারা ক্রমে যমুনা প্রদেশে

প্রবিষ্ট হইয়া মগধের দিকে ধাবিত হয় এবং তদানীন্তন গুপ্তরাজকে পরাভূত করে ।

২। তাহাদিগের দলপতি বা সর্দারের নাম তোরামন । তোরামন প্রায় ৫০০ অর্কে মহারাজা উপাধি ধারণ করিয়া মালোয়ার রাজা হইয়া ছিলেন । তোরামনের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র মহিরাগুনা রাজা হয় । মহিরাগুনা এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল এবং এত লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিল যে, অবশেষে ৫২৮ খৃষ্টাব্দে মগধরাজ বলাদিত্য, মধ্য-ভারতস্থ এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা যশোধর্ম্মের সহযোগে বৃহৎ একদল সৈন্ত লইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন । তিনি মূলতানের নিকটবর্তী কাহুর নামক স্থানে তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার লোকজন ও সৈন্ত সামন্ত সহ তাহাকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দেন । হুনেরা প্রায় ১০০ শত বৎসর কাল ভারতে ছিল । হুনদিগের অনেকে ভারত স্থানি বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল । ইহার পরেও গুপ্ত রাজবংশ প্রায় দুইশত বৎসরকাল থানেখরে রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

(২১)

বৌদ্ধযুগে ভারতের অবস্থা ।

(খৃঃ পূঃ ৩০০—৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)

১। বুদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি মগধে অবস্থিত ছিলেন এবং মগধেই তত্ত্ব্যাগ করেন । এই হেতু বৌদ্ধগণ কর্তৃক, তাহাদিগের ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান মগধ পুণ্যভূমিক্রমে সম্মানিত ছিল । তাহাদিগের মহান্ গুরুদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্ত । যে স্থানে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধি বা জ্ঞানালোক প্রতিভাত হয়, সেই বুদ্ধগয়া এবং যে তরুতলে তিনি আশীন হইয়া শিক্ষাদান করিতেন, সেই “বোধি” বা “বোতরু” বৌদ্ধদিগের নিকট পবিত্র বস্তুরূপে পরিগণিত । বৌদ্ধধর্ম্মই কালক্রমে অনেক

দেশের প্রধান ধর্ম হইয়া উঠে । ঐ সকল দেশ হইতে শত শত বৎসর পর্যন্ত ধার্মিক বৌদ্ধগণ, তাঁহাদিগের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার জীবন ও মরণ-স্থান দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত, ভারতে আগমন করিয়াছেন । চীন হইতেই অধিকাংশ তীর্থযাত্রীর আগমন হইত, দুটি চীন-তীর্থযাত্রী এদেশে আসিয়া বাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন । এই দুইজনের মধ্যে যিনি প্রথম আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ফাহিয়ান (Fahian) । ফাহিয়ান খৃষ্টীয় প্রায় ৪০০ অব্দে ভারতে আইসেন । দ্বিতীয় জনের নাম হাউএন চ্যাং (Houen Tsang) । হাউয়েন চ্যাং ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন । তাঁহাদিগের লিখিত বিবরণ বড়ই মূল্যবান বস্তু । কারণ, হিন্দুগণ তাঁহাদিগের দেশের কোনই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই ।

২ । গুপ্ত রাজাদিগের শাসন-সময়ে ফাহিয়ান ভারতে আগমন করেন । সমুদ্র গুপ্তের রাজত্ব শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি এদেশে তীর্থ-পর্যটনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি কাবুল হইতে ভারতে আসিয়া, পূর্বাভিমুখে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন ; এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থানে আসিয়া, এই স্থান হইতেই জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র-পথে সিলোন যাত্রা করেন । তিনি ভ্রমণ-পথে পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের বড় বড় নগরগুলি সমস্তই পরিদর্শন করিয়াছিলেন । ফাহিয়ান বলেন—ভারতে উত্তরার্দ্ধে কেহ কোন প্রাণী হত্যা বা মদ্যপান করিত না ; এবং চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি অথবা জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন, অন্য কেহই পেরাজ রক্ষন খাইত না । কেবল চণ্ডালেরাই শিকার, মাংস বিক্রয় ও মাংস ভক্ষণ করিত । রাজার শাসন মৃদুভাবে চলিত । লোকেরা আপন ইচ্ছা অনুসারে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতে পারিত । রাজকীয় বিধি বা আইন-বিরুদ্ধ কর্ম করিলে অপরাধীর অর্থদণ্ড মাত্র হইত । এমন কি, রাজ-

দ্রোহীদিগেরও প্রাণদণ্ড হইত না । কেবল তাহাদিগের ডান হাত খানি কাটিয়া ফেলান হইত । সাধারণ লোকেরা ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রার পরিবর্তে কড়ি ব্যবহার করিত । তিনি প্রায় সকল স্থানেই সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী বা উদাসীনে পরিপূর্ণ বিহারগুলিকে দেশের রাজাকর্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়াছিলেন । রাজাই সন্ন্যাসীদিগকে বিছানা, মাছর, পানাহার ও বস্ত্র প্রদান করিতেন । তিনি ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় দেখিতে পান । চিকিৎসালয় মানুষের জন্তও ছিল, পশুর জন্তও ছিল । এই সকল চিকিৎসালয়ে সুদক্ষ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা কার্য সম্পন্ন হইত । ঔষধ ও পথ্য বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত । ফাহিয়ানের বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় যে, ফাহিয়ানের সময়ে, খৃষ্টীয় প্রায় ৪০০ অব্দে বৌদ্ধ ধর্মই উত্তরভারতের প্রধান ধর্ম ছিল । ফাহিয়ানের প্রায় ২৩০ বৎসর পরে হাউএন চ্যাং (Houen Tsang) ভারতে আসিয়াছিলেন । এই দীর্ঘ সময়ের পরে তিনি এদেশে যাহা দেখিতে ও শুনিতে পান, তাহার এক বিশদ বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছেন । এই বিবরণ ফাহিয়ানের লিখিত বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত । হাউয়েন চ্যাং বিক্রমাদিত্যের সময় অতীত হইবার পরক্ষণেই ভারতে আগমন করেন । তিনিও কাবুলের পথেই আসিয়াছিলেন । তিনি ভারতে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীর ও পঞ্জাবের সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ এবং হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান নগরগুলি পরিদর্শন করেন । ইহার পরে হাউয়েন চ্যাং উড়িষ্যা, কলিঙ্গ ও দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান ; এবং সমগ্র দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করিয়া, পশ্চিম উপকূলে ফিরিয়া আইসেন । অনন্তর তিনি মহারাষ্ট্রদেশ, গুজরাট, রাজপুতনা ও সিন্ধুদেশ পরিদর্শন করেন । এই-রূপে তাঁহার সমগ্র ভারত পরিদর্শন করা হয় । তিনি ভারত পরিদর্শনে ১৫ পনের বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিলেন ।

৩। হাউএন চ্যাং যখন যেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই

এক দিকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও অত্র দিকে বৌদ্ধধর্মের অনুসরণ হইতে দেখিয়াছেন। উড়িষ্যা, কলিঙ্গ ও দক্ষিণভারত প্রভৃতি দেশের কতিপয় অংশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত ও অবশিষ্ট অংশে ব্রাহ্মণধর্ম প্রবল ছিল। হাউএন চ্যাং বলেন যে, তিনি যে সকল রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল রাজ্যের অধিকাংশই সুশাসিত ও ঐ সকলের অধিবাসিবর্গকে সন্তুষ্ট ও সুখী দেখিয়াছেন। কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকেই আপন আপন ক্রটি ও প্রবৃত্তির অনুষ্ঠান করিতে অধিকারী ছিল, এবং যে কোন দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্তি হইত; তাহারই উপাসনা করিতে পারিত। বিদ্বান্গণ সর্বত্রই সম্মানিত ছিলেন।

৪। হাউএন চ্যাং যে সময়ে কনোজ বা কাণ্ডকুজ গমন করেন, সে সময়ে, শীলাদিত্য সেখানকার রাজা ছিলেন। শীলাদিত্যের আর এক নাম হর্ষ। যদিও তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিতেন, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের ধর্মবিশ্বাসকে একই রূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। কনোজে ১০০ বৌদ্ধ বিহার এবং ২০০ হিন্দুমন্দির ছিল। শীলাদিত্য ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ রাজসভা আহ্বান করেন। এই সভায় একশটি রাজা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শীলাদিত্যকে তাঁহাদিগের অধিরাজ (Overlord) বলিয়া স্বীকার করেন। সভাস্থলে রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মণ ধর্মগুরু ও বৌদ্ধ উদাসীনগণ আপন আপন ধর্মের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রথম দিনকার সভায় বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, দ্বিতীয় দিন সূর্য্যদেবের মূর্তি ও তৃতীয় দিন শিবমূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল। শীলাদিত্য এক মহা-ভোজ বা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই মহোৎসব ৭৫ দিন স্থায়ী ছিল। মহোৎসবের অবসানে শীলাদিত্য তাঁহার ধনভাণ্ডার, মণি-রত্নাদি ও আভরণ এবং তাঁহার রাজ-প্রাসাদস্থিত সমস্ত সঞ্চিত ধন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া, বিতরণ করিয়া দেন।

দানকার্য্য সমাধা করিয়া, তিনি আপন শরীর হইতে রাজ-পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলেন এবং বুদ্ধদেব পিতৃগৃহ ত্যাগের সময় যেরূপ ছিন্নবস্ত্রে দীন ভিখারীবেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ ছিন্নবস্ত্রে দীন ভিখারীর সাজে সজ্জিত হন। রাজা শীলাদিত্য প্রতি পাঁচ বৎসরে, একবার এই অনুষ্ঠান করিতেন। গয়ার নিকটবর্ত্তী নলন্দা নামক স্থানে একটা অতি বৃহৎ বুদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারে ১০০০০ দশ হাজার বৌদ্ধ সম্মাসী বাস করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ও বিধি-ব্যবস্থা এবং ভেষজতত্ত্বের অধ্যয়নে তাঁহাদিগের সময় অতিবাহিত হইত।

৫। বৌদ্ধযুগের পূর্বে ও পরে, এদেশে যে শ্রেণীর কবি দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, বৌদ্ধযুগে তাদৃশ কবির অভাৱ ঘটে নাই। যাহা হউক, বিশেষ সতর্কতা ও যত্নের সহিত শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোচনা হইত। হিন্দুগণ নিজেরা আপনাদিগের জন্ত এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন। গ্রীকেরা ভারতে আগমন করিয়া, যেমন হিন্দুস্থানের পণ্ডিতদিগের কাছে নানা বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তেমন আবার হিন্দুরাও গ্রীকগণ হইতে অনেক তত্ত্ব শিখিয়া লইয়াছিলেন।

৬। বৌদ্ধেরা জীবন সম্বন্ধে এতদূর সাবধান ও সতর্ক এবং জীবিত বস্তু মাত্ত্বের প্রতিই এই পরিমাণে সদয় ছিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেক স্থানে, কিবা মানুষ কিবা পশু, উভয়ের জন্তই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভেষজ-তত্ত্বের অনুশীলন বিশেষ মনোযোগের সহিত হইত। চরক ভেষজতত্ত্বের প্রধান লেখক। তিনি তাঁহার গ্রন্থে কিরূপে বিবিধ উদ্ভিজ্জ, খনিজ ও ধাতব দ্রব্য হইতে অসংখ্য ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, বিশদভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক ও আরবেরা চরক হইতে অনেক বিষয় শিখিয়া লইয়াছিলেন। তখন এদেশে বহু অস্ত্রচিকিৎসকও ছিলেন। শুক্রত অস্ত্র-চিকিৎসা তত্ত্বের প্রধান

লেখক । তিনি অশ্বচিকিৎসায় ব্যবহারার্থ, ভিন্ন ভিন্ন রকমের শতাব্দিক ছুরির নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এক গাছি চুলকে কাটিয়া যেন অনায়াসে দুই ভাগ করা যাইতে পারে, তিনি কতিপয় অস্ত্র এই পরিমাণে তীক্ষ্ণধার করিয়া প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ।

৭ । বৌদ্ধযুগের হিন্দুগণ, সেই সময়ের গ্রীকগণ অপেক্ষা পাটীগণিত ও বীজগণিতে অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন । জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আমরা যে সকল পুরাতন হিন্দুগ্রন্থ দেখিতে পাই, সমস্তই এই বুদ্ধযুগের রচিত । গ্রন্থগুলির নাম সিকান্ত । ওনা যায়, সিকান্তগ্রন্থ সর্বসমেত ১৮ খানি । এই সকল সিকান্ত গ্রন্থের মধ্যে যে খানি প্রাচীনতম, সেখানি আলেক্-জাণ্ডারের সময়ের অল্প পরই লিখিত হয় । উহাতে গ্রীকদিগের উল্লেখ আছে । সম্ভবতঃ উহার লেখক, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে গ্রীকদিগের যে অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহাদিগ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন । অন্য এক খানি সিকান্ত গ্রন্থে বেক্টিয়ার গ্রীক ও সিথীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায় । অবশিষ্ট সিকান্ত গ্রন্থগুলি বৌদ্ধযুগের শেষ সময়ে লিখিত হয় । এই যুগের প্রধান জ্যোতির্বিদ আর্য্যভট্ট । আর্য্যভট্ট খৃষ্টীয় প্রায় ৬০০ অব্দে পাটলীপুত্র নগরে বর্ত্তমান ছিলেন । পৃথিবী লাটিমের মত অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, ইহা তিনিই প্রতিপন্ন করেন ; এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণও তিনিই অবগত ছিলেন । তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্বেত্তা বরাহ-মিহির । বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতর রত্ন । ইহার কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । বরাহমিহির বৃহৎসংহিতা নামে জ্যোতিস্তত্ত্ব বিষয়ে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন ।

৮ । এই সময়ে ব্যাকরণ বিশেষ যত্নের সহিত পঠিত হইত ; এবং ব্যাকরণ ও দর্শনবিষয়ে সংস্কৃত বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল । মনুসংহিতা নামে মনুর ব্যবস্থা গ্রন্থ, খৃষ্টের প্রায় সমকালে সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ।

(২২)

পুরাণ ।

১ । পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন । কিন্তু পুরাণসমূহ বলিলে পুরাতন লেখা বা গ্রন্থ বুঝায় । পুরাণ নামে হিন্দুদিগের কতক গুলি গ্রন্থ আছে । অধিকাংশ পুরাণই ১২০০ বৎসরের পূর্বে রচিত হইয়াছে । সুতরাং, সে গুলি আমাদের নিকট খুবই পুরাতন বস্তু বটে, কিন্তু তাহা হইলেও পুরাণ গুলি সমস্তই বেদ, রামায়ণ, ও মহাভারতের বহু পরবর্তী । বৌদ্ধ-ধর্মের সময়ে, বা কি লোপের পরে, এদেশে যে নূতন হিন্দুধর্মের অভ্যুদয় ঘটে, পুরাণে সেই হিন্দু-ধর্মেরই কাহিনী বর্ণিত আছে । তখন পুরাতন বেদোক্ত দেবতা ও বেদোক্ত যজ্ঞাদি বিলুপ্ত হইয়াছিল । মনুর সময়ে, কতিপয় হিন্দু দেব-বিগ্রহের উপাসনা বা মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন । মনু এই সকল অনুষ্ঠানে দোষারোপ করিয়া পুনরায় পুরাতন বৈদিক দেবতার প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যত্ন সকল হয় নাই । পুরাতন বৈদিক ধর্ম এইরূপ যত্ন সত্ত্বেও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যায় । বেদে সূর্য্যের এক নাম বিষ্ণু । সূর্য্য স্বীয় তেজে সৃষ্টির সমস্ত বস্তু সজীব রাখেন । রুদ্র ঘোর অন্ধকারময় বজ্র-সম্বলিত মেঘ । মেঘ হইতে বিদ্যুতের সঞ্চারণ হয় । বিদ্যুৎ-যাহা স্পর্শ করে, তাহাই বিনষ্ট হইয়া যায় । বেদের সেই বিষ্ণু কাল-ক্রমে হিন্দুদিগের এক প্রধান উপাস্ত্র দেবতা হইয়া উঠেন । রুদ্রও “শিব” এই নূতন নামে অত্র আর একটি প্রধান দেবতারূপে গণ্য হন । তৃতীয় দেবতা ব্রহ্মা । বেদে ব্রহ্মা প্রার্থনা বা বাক্যের অধিষ্ঠাতা দেব-রূপে সংস্কৃত হইয়াছেন । পরবর্তী যুগে, সেই ব্রহ্মা সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি-কর্তারূপে হিন্দু ত্রিমূর্তি বা ঐশ্বরিক তিন শক্তির অন্ততম হইয়া পড়েন । বিষ্ণু ও শিবই পুরাণের প্রধান দেবতা । কবি কালিদাসের সময়, খৃষ্টের

পরবর্তী প্রায় ৬০০ অকে, হিন্দু ভারতের সর্বত্রই এইরূপ ধর্মবিধান প্রবল ছিল।

২। পুরাণ অনেকগুলি বলিতে কি, ভারতের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ স্থান, প্রত্যেক বৃহৎ পর্বত ও বড় নদীরই এক একটি স্বতন্ত্র দেবতা ও পুরাণ অথবা আপনার একটা পুরাতন কাহিনী আছে। কিন্তু পুরাণের মধ্যে ১৮ খানিই প্রধান। এই সকল পুরাণের অধিকাংশই, বিক্রমাদিত্যের সময় ও তাঁহার পরবর্তী ২০০ শত বৎসরের মধ্যে, লিখিত হয়। এই ১৮ পুরাণ বা দেব কাহিনীর ৬ খানি বিষ্ণু, ৬ খানি শিব, এবং ৬ খানি ব্রহ্মাবিষয়ক। প্রত্যেক পুরাণই কোন দেবতার নামে নামাঙ্কিত।

৩। পুরাণে দেবতার কাহিনী। এই সময়ে মনুষ্যের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা হইয়াছিল। সেই সকলের নাম ধর্মশাস্ত্র।

৪। বৌদ্ধযুগের অবসানে, এদেশে যে সময় উপস্থিত হয়, উহাকে পৌরাণিক যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ, এই সময়েই পুরাণসমূহ রচিত ও প্রচারিত হয়। সে যুগের এখনও অবসান হয় নাই। এখনও পুরাণের হিন্দু-ধর্মই এদেশে প্রবলরূপে প্রচলিত আছে।

(২৩)

পৌরাণিক যুগের হিন্দু উপদেষ্টা।

১। এই যুগে বিষ্ণু ও শিবের উপাসনাই বড় বড় ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা কর্তৃক এদেশে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের প্রচার-প্রভাব ও শিক্ষাদান মাহাত্ম্যই বৌদ্ধধর্ম উহার প্রাধান্য হারাইয়া, এ দেশের সর্ব প্রধান ধর্মের উচ্চাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে।

২। এই সকল বড় বড় ব্রাহ্মণ-ধর্মের উপদেষ্টাদিগের মধ্যে সর্ব-

প্রথম ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্য । শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণভারতের পশ্চিম উপকূল-স্থিত মালবারে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি কুমারিল ভট্ট নামক একটি ব্রাহ্মণের শিষ্য । কুমারিল ভট্ট, বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত, বিহার হইতে দক্ষিণভারতে আগমন করেন । শঙ্করাচার্য্য সমস্ত

ভারত পর্য্যটন করিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে হিমালয় পর্বতের কৈদারনাথে তাঁহার মৃত্যু হয় । শঙ্করাচার্য্য শিবের উপাসক শিব ছিলেন । তিনি, শিব, মহাদেব অথবা মহান্ ঈশ্বর, এবং তাঁহার পত্নী দেবী বা ঈশ্বরীর উপাসনাই সর্বত্র প্রচার করেন ।



[বর্তমান শ্রীগিরি গুরু]

কতক হিন্দু এই দেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত করিয়াছেন ; এবং কতকে, — প্রধানতঃ অনার্য্য ও তুরানীয়বংশ-সম্প্রদায়েরা এই দেবীকে কালী, — মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন । দক্ষিণভারতে যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্মার্ত্ত সম্প্রদায় নামে পরিচিত । শঙ্করাচার্য্য শ্রীগিরি কান্তি পর্বতে একটি মঠ বা উদাসীনদিগের আশ্রম স্থাপন করেন । এই মঠ বা উদাসীন আশ্রম মহীশূর প্রদেশে তুঙ্গ নদীর প্রস্রবণসান্নিধ্যে পশ্চিম ঘাট পর্বতের গভীরতম বনে অবস্থিত । শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি বা গুরু এখনও এই স্থানে অবস্থান ও লক্ষ লক্ষ শৈব সন্ন্যাসীর ধর্মবিধানের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন । শঙ্করাচার্য্য আরও তিনটি মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । একটি উত্তরে হিমালয়ের

বদরিনাথ, অষ্টটি পশ্চিমে কাটিয়ারের অন্তর্গত দ্বারকায় এবং তৃতীয়টি পূর্বে উড়িষ্যার জগন্নাথক্ষেত্র বা পুরীতে।

৩। এক্ষণে যেখানে মাদ্রাজ নগর, উহারই নিকটবর্তী এক গ্রামে



[রামানুজ]

খৃষ্টীয় প্রায় ১১৫০ অব্দে রামানুজের জন্ম হয়। কোলা রাজ্যের তদানীন্তন প্রধান নগর কাঞ্চী বা কঞ্জিভরাম। কাঞ্চী নগরে এক বড় মন্দির ছিল। ঐ মন্দিরে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ধর্মোপদেষ্টা থাকিতেন। রামানুজের পিতা বালক রামানুজকে অধ্যয়নার্থ ঐ মন্দিরে পাঠাইয়া দেন। রামানুজ শেষে ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্তী শ্রীরঙ্গ পট্টনে

গমন করেন। তিনি সেইখানে বৈষ্ণবধর্মের শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হন; এবং ঐ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারার্থ সংস্কৃত ভাষায় কএক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

৪। কিছু কাল পরে, রামানুজ তাঁহার জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতের সর্বত্র শিব ছাড়িয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিবার নিমিত্ত সকলকে উপদেশ দিয়া বেড়ান। কোলার রাজা শিবের উপাসক ছিলেন। তিনি রামানুজকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন। রামানুজ মহীশূরে চলিয়া যান। মহীশূরের জৈন রাজা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। রামানুজ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির নিকট তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যাহারা রামানুজের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীবৈষ্ণব বলে। তাঁহাদের গুরু কঞ্জিভ-

রামে বাস করেন। রামানন্দ রামানুজের মত অহুসরণ করিতেন। তিনি রামানুজের প্রায় ১০০ এক শত বৎসর পরে, বর্তমান ছিলেন। রামানন্দ বিষ্ণু নামে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার প্রচার স্থান ছিল উত্তরভারত। তিনি প্রধানতঃ বারাণসী বা কাশীধামে বাস করিতেন এবং চতুর্দিক্‌বর্তী সমস্ত দেশে ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। রামানন্দ হিন্দী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনা এবং প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নীচ জাতীয় ১২ বার জন শিষ্য ছিল।

রামানন্দের এই নীচ জাতীয় ১২ জন শিষ্যের একজন কবির।

কবির ১৩৮০—১৪২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। কবির সমস্ত বঙ্গদেশে বিষ্ণু নামে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন। কবিরের সময় মুসলমানেরা সমস্ত উত্তরভারতে বাপ্ত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই এক বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।



[কবির]

৫। তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, এবং পুতল-পূজাকে পাপ বলিয়া নির্দেশ করিতেন। তিনি বলিতেন,—ঈশ্বর এক। কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয়েরই সেই ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য। ঈশ্বর মানুষের হাত-গড়া মন্দিরে অবস্থান করেন না। তিনি সকল মানুষেরই হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন। মানুষের জীবন মায়ী বা কল্পনা মাত্র। মানুষের আত্মা সেই একমাত্র সত্য সনাতন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়া,

জানিয়া এবং তাঁহাকে প্রেম করিয়াই শান্তি লাভ করিতে পারে। কবিরের মৃত্যু হইলে, কথিত আছে,—হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া তাঁহার শব দাহ করিতে এবং মুসলমানেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে চাহিয়াছিল; যখন তাহারা কবিরের শব-আচ্ছাদন উঠাইয়া দেখিল, সেখানে শব নাই;—কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ফুল পড়িয়া রহিয়াছে; তখন ঐ ফুলের অর্দ্ধাংশ হিন্দুরা পবিত্র কাশী-ধামে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করিল; এবং অপরাধী মুসলমানেরা সাদরে গ্রহণ করিয়া মহাসমারোহে কবিরে পুতিয়া রাখিল।

৬। চৈতন্য ১৪৮৬ হইতে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। চৈতন্যও বৈষ্ণব-ধর্মের অন্তর প্রচারক। তিনি বিষ্ণুর উপাসনার সহিত পুরীর সেই মহান্ ঈশ্বর জগন্নাথের উপাসনা যোজনা করিয়া, সমস্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যা ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম ধারণ করেন, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মনুষ্য-দেহে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধের শ্রাম, তিনিও



[বল্লভ স্বামী]

ছিলেন। তিনিও কৃষ্ণমূর্তিতে বিষ্ণুর উপাসনাই প্রচার করিয়া-

বলিতেন যে, সমস্ত জাতিই ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা পবিত্র হইতে পারে। তিনি ইহাও বলিতেন যে, জীবশরীরের এক বিন্দু রক্তপাত ঘটাইলেও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঘোর পাতকের অনুষ্ঠান করা হয়।

৭। চৈতন্য দেবের অব্যবহিত পরে খৃষ্টীয় প্রায় ১৫২০ অব্দে বল্লভ স্বামী উত্তরভারতে বর্তমান

ছিলেন। তিনি বলিতেন সেই এক মাত্র ঈশ্বর বিষ্ণু, প্রার্থনা বা উপবাস, বনবাস বা বিহার-অবস্থানে প্রসন্ন হন না, মানুষ যদি ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উৎসবে ডুবিয়া যায়, তাহা হইলেই বিষ্ণু প্রীত ও সন্তুষ্ট থাকেন। প্রধানতঃ, বড় বড় মহাজন ও বণিকেরা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর লোক স্বভাবতঃই ভোগ-বিলাসের অনুরাগী ও সাংসারিক সচ্ছল অবস্থা হেতু ইহারাই তাদৃশ জীবন-যাপনে সমর্থ।

(২৪)

রাজপুত ।

৩০০—১২০০ খৃষ্টাব্দ ।

১। দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন আর্য্যযুগে, তৎপর হিন্দুযুগের প্রথম সময়ে, ক্ষত্রিয়েরাই সেনা, সেনাপতি ও রাজা ছিলেন। বৌদ্ধ যুগেও, বুদ্ধের শ্রায়, অধিকাংশ রাজা ও সর্দারই ক্ষত্রিয়-সন্তান। কিন্তু এই সময়ে, রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের শ্রায়, কতিপয় শূদ্র জাতীয়কে রাজপদাক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের প্রায় মধ্য সময়ে, খৃষ্টের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু রাজ্যে সিথিয়ান-বা শক জাতীয় রাজাগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

২। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে আমরা সিথিয়ানদিগের বা ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজ্যের কথা বড় একটা শুনিতে পাই না। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রায় ৬০০ অব্দ হইতে প্রায় ১২০০ অব্দ পর্য্যন্ত, ভারতের প্রায় সর্বত্রই আমরা রাজপুতদিগকে রাজ্য শাসন করিতে দেখিতে পাই। এই রাজপুতেরা কে ?

৩। রাজপুতেরা বলেন, তাঁহারাও ক্ষত্রিয় এবং রাম, কৃষ্ণ, এবং প্রাচীন সময়ের অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বংশধর। বহুশিক্ষিত বিজ্ঞ লোকেও এই উক্তি সত্য বলিয়াই অনুমান করেন। রাজপুত শব্দের অর্থ রাজপুত্র এবং প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে এই রাজপুত নাম অসঙ্গত নহে। শক্তিশালী ক্ষত্রিয় জাতি একবারেই অস্তিত্বশূন্য বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহা সম্ভবপর নহে। শিক্ষিত বিজ্ঞদিগের মধ্যে কতেকে আবার ইহাও অনুমান করেন যে, খৃষ্টের পরবর্তী প্রায় পাঁচ শত বৎসর কাল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম বিভাগে শক বা সিথিয়ানগণ দলে দলে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সিথিয়ানদিগের পূর্বে গ্রীকগণ এদেশে আগমন করেন, রাজপুতেরা তাঁহাদিগেরই সন্তান। প্রকৃত কথা বোধ হয় এই যে, কতিপয় রাজপুত সম্প্রদায়, বিশেষতঃ যাহারা হিন্দুস্থানের কেন্দ্রস্থলে, দিল্লী ও কনোজ অঞ্চলে ছিলেন, তাঁহারাও ক্ষত্রিয় সন্তান। কিন্তু রাজপুতনা, মালোয়া ও গুজরাট প্রভৃতি যে সকল রাজ্য শকদিগ কর্তৃক বিধ্বস্ত এবং যে সকল রাজ্যে শকেরা অধিকতর সংখ্যায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের অধিকাংশ রাজপুতই সিথিয়ান। রাজপুতেরা স্বভাবতঃই উচ্চাশয়িক, সাহসী ও রণপ্রিয় বীর ছিলেন। শ্রুতরাং, বুদ্ধের মহা উপদেশ তাঁহাদিগের নিকট ভাল লাগিত না। বৌদ্ধ উপদেশের সার কথা,—কোন জীবিত বস্তুকে আঘাত কিংবা হত্যা করা মহাপাপ। এই বীরজাতি মনের আগ্রহে এই উপদেশের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে নির্জিত করিয়া হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনার্থ প্রয়াসপর রহিয়াছেন। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে বহুসংখ্যক রাজপুত রাজা বর্তমান ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ অব্দ পর্য্যন্ত এই ছয় শত বৎসরই রাজপুতদিগের শাসনকাল।

হারকা নামে পরিচিত ছিল। পরে এই রাজ্য সোরাষ্ট্র নামে অভিহিত হয়। ৪১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩০০ বৎসর কাল, বল্লভী নামক এক রাজবংশ এই স্থানে রাজত্ব করেন। চীন পরিব্রাজক হাউএনচ্যাং যখন সোরাষ্ট্রে উপস্থিত হন, তখন তিনি সেখানে বল্লভী রাজাদিগের অধীন এক অতি ধনশালী পরাক্রান্ত জাতিকে ঐ দেশে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান। খৃষ্টীয় প্রায় ৭৪৬ অব্দ হইতে মুসলমানদিগের সময় পর্যন্ত, সোরাষ্ট্রে রাজপুত রাজাগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার রাজপুত রাজাদিগকে চালুক্য বলা হইত। আনহান্ অথবা আনহান্‌পত্ন—তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। আনহান্‌পত্ন অধুনা পত্ন নামে পরিচিত।

৫। বিক্রমাদিত্যের রাজ্য,—মালোয়া খৃষ্টীয় প্রায় ৭৩০ অব্দ পর্যন্ত, বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারীদিগ কর্তৃক শাসিত হয়। বিক্রমাদিত্যের পরে, এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি শীলাদিত্য। চীন পরিব্রাজক হাউএন্‌চ্যাংএর লিখিত বিবরণীতে ইহার কথা শুনিতে পাই। এই বংশের পর রাজপুতেরা এইখানে রাজত্ব করেন এবং শেষ সময়ে মালোয়াই রাজপুতদিগের প্রধান স্থান হইয়া পড়ে।

৬। কেশরী বা রাজসিংহ নামে পরিচিত একটি রাজপুত রাজবংশ উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেন। কেশরীবংশ খৃষ্টীয় ৪৭৪ হইতে ১১৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উড়িষ্যার পুরাতন নাম অঙ্গরাজ্য। ভুবনেশ্বর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। এই ভুবনেশ্বরে তাঁহারা কতিপয় মন্দির নির্মাণ করেন। এই সকল মন্দির ভারতের উৎকৃষ্টতম সুন্দর মন্দিরসমূহের অন্তর্নিবিষ্ট। এই বংশের সর্বপ্রথম রাজার নাম যযাতি কেশরী। তিনি তাঁহার রাজধানীর নাম ভুবনেশ্বর রাখিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে, যে উড়িষ্যা একদিন বৌদ্ধ ধর্মের হৃদয়রূপ ছিল, সেইখানেই শিব বা ঈশ্বরের আরাধনা হইত এবং উড়িষ্যায় হিন্দুধর্ম বিস্তার হইয়াছিল।



ভুবনেশ্বরের মন্দির।

কেশরীরাজাদিগের পরে ১১৩২ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, চারি শত বৎসর কাল, গঙ্গা রাজা নামে পরিচিত অত্র একটি রাজপুত বংশ উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। গঙ্গাবংশেরই এক রাজা পুরীতে জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত করেন। গঙ্গাবংশীয় রাজারা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

৭। চালুক্য রাজপুতগণ খৃষ্টীয় প্রায় ৫০০ হইতে ১২০০ অব্দ পর্য্যন্ত নর্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত দাক্ষিণাত্য শাসন করিয়াছিলেন। তাহারা দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন—পূর্ব চালুক্য ও পশ্চিম চালুক্য। পূর্ব চালুক্যদিগের রাজধানী গোদাবরী-তটস্থিত রাজমহেন্দ্রী, পশ্চিম চালুক্যের রাজধানী মহারাষ্ট্র দেশীয় কলিয়াণ বা কল্যাণ নগরে ছিল। এই সকল রাজাদিগের শুধু নাম ভিন্ন আর কিছুই জানা যায় না।

৮। বেলানা নামক রাজপুত রাজবংশ খৃষ্টীয় প্রায় ৯০০ হইতে ১৩১০ অব্দ পর্য্যন্ত, মহীশূরে রাজত্ব করেন। ষারসমুদ্রে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। এই স্থানে তাঁহারা হানিবিদের বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করে।

৯। রাজপুতদিগের কাকাটি রাজবংশ তেলিঙ্গানাতে খৃষ্টীয় প্রায় ১১০০ হইতে ১৩২৩ অব্দ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজধানী ওয়ারাঙ্গলে ছিল। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা ওয়ারেঙ্গল অধিকার করিয়া লয়। ওয়ারেঙ্গল শেষে গোলকোণ্ডা নামক মুসলমান রাজ্যের প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছিল।

১০। পাল ও সেন রাজারা প্রায় পাঁচ শত বৎসর কাল, বঙ্গদেশ শাসন করেন। পাল বংশীয়েরা খৃষ্টীয় প্রায় ৮০০ হইতে ১০৫০ অব্দ পর্য্যন্ত এবং সেন বংশীয়েরা খৃষ্টীয় ১০৫০ হইতে ১৩০০ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ১৩০০ সনে মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়া লয়।

১১। যহ্ন রাজপুতেরা বলেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণের বংশ-সম্মত যাদব কুলীয়। তাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশের উত্তরবর্তী দেবগিরিতে খৃষ্টীয় প্রায় ১১০০ হইতে প্রায় ১৩০০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুসলমানগণ দেবগিরি অধিকার ও উহাকে দৌলতাবাদ নামে অভিহিত করে।

১২। রাঠোর, চোহান ও তোমরাগণও রাজপুত রাজবংশ সম্মত এবং রাজপুতদিগের তিনটি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা খৃষ্টীয় প্রায় ১১৯০ অব্দে কনোজ ও আজমীঢ় এবং দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়েই ঘোরি বংশীয় মুসলমানেরা ভারতে আগমন করেন।

(২৫)

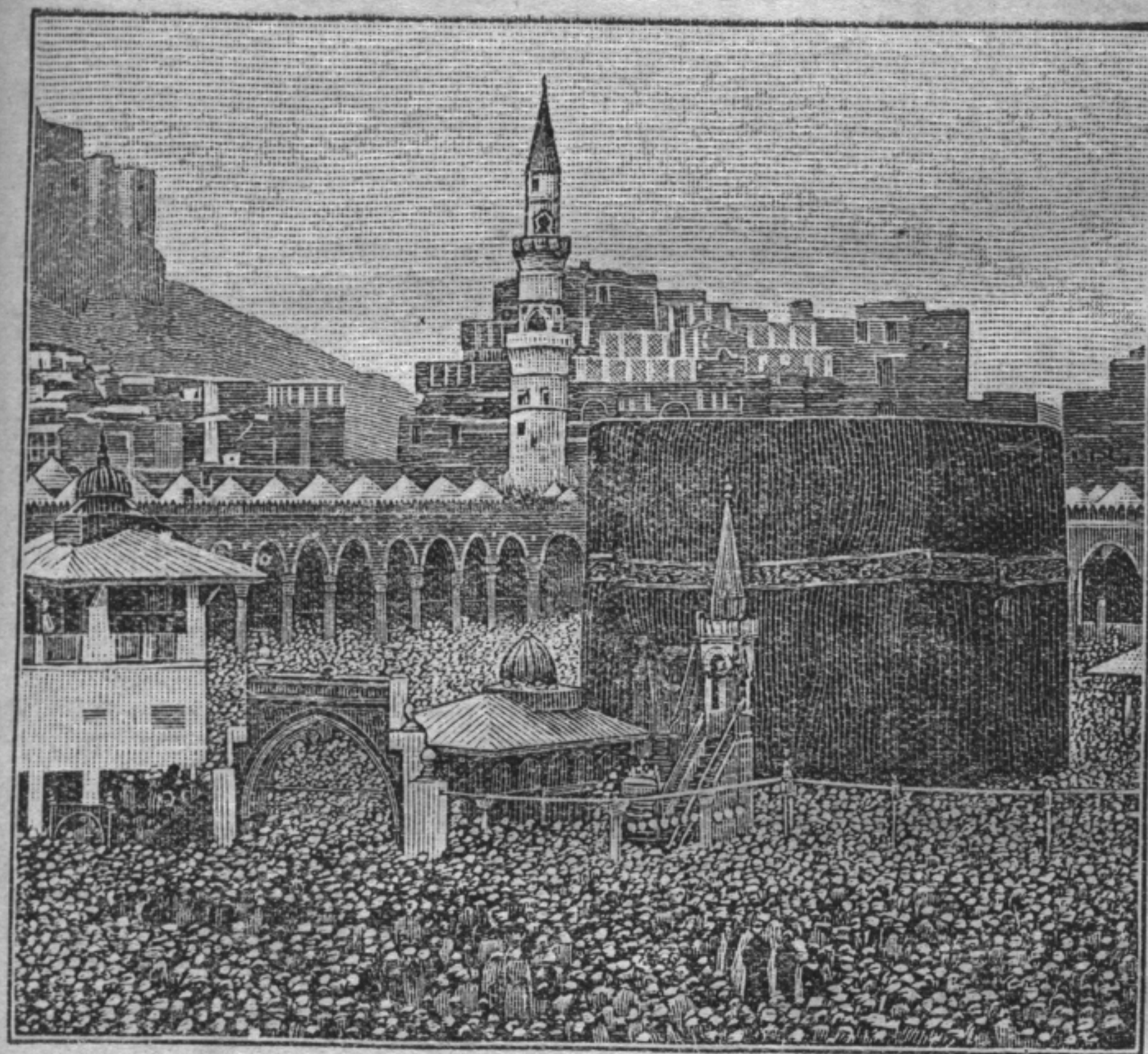
মুসলমান ।

১। আরব দেশের অধিকাংশ স্থানই শুষ্ক ও অনুর্বর মরুভূমি। নদী নাই, হ্রদ নাই; বালুকাময় বড় বড় বিস্তৃত ভূখণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত। বালুকাপূর্ণ প্রান্তরের মধ্যে স্থানে স্থানে হই একটি শ্যামবর্ণ ভূখণ্ড দৃষ্টি-গোচর হয়। উহাতে তৃণ ও শষ্য প্রভৃতি জন্মে, এবং কূপে বা উৎসে জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে আরব দেশে বহু অসভ্যজাতির বসতি ছিল। তাহারা গো ও মেষপাল লইয়া পশুচারণের উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া বেড়াইত। তাহারা যার-পর-নাই প্রচণ্ড প্রকৃতি ও দুর্দান্ত ছিল। সর্বদাই একে অন্যের সহিত যুদ্ধ করিত এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অতি বড় নিষ্ঠুর ও কদর্য রীতি প্রচলিত ছিল।

২। খৃষ্টের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে, আরব দেশে মহম্মদ নামক এক পেগম্বর বা ভগবৎ-প্রেরিত মহাত্মার আবির্ভাব হয়। তিনি আরবদিগের দুর্ব্যবহারে ও কদাচার-দর্শনে মর্মান্বিত হন এবং প্রতিকার-কল্পে যথাশক্তি যত্ন করেন। তিনি আরবদিগকে বলিলেন,—পরস্পর যুদ্ধ বা কাটাকাটি, কলহ ও পুতুল পূজা একান্ত অন্ত্যায় ও অবৈধ কার্য। “ঈশ্বর এক” তিনি এই তত্ত্বও সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমতঃ আরবেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; কতেকে তাঁহাকে হত্যা করার উদ্যোগ করিল। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল থাকিল না, কালক্রমে লোকের মতি ফিরিতে লাগিল। কতকে পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মহম্মদের সহিত যোগদান করিল।

৩। আরবদিগের মধ্যে যাহারা, তাহাদিগের পুরাতন আচার-প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা মহম্মদের শিষ্যদিগকে

আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা অবশেষে পরাজিত হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পূর্বেই প্রায় সমগ্র আরব দেশ তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে। মহম্মদের মৃত্যু ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। কোরাণ সমস্ত মুসলমান কর্তৃকই পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সম্মানিত। মহম্মদের ধর্মই মহম্মদীয়ান বা ইসলাম ধর্ম নামে পরিচিত। মহম্মদীয়ানদিগকে মুসলমান বা ইসলামের শিষ্যও বলা হইয়া থাকে। মুসলমানেরা বলে, — ৬২২ খৃষ্টাব্দে



মক্কার মস্জিদ।

যখন মহম্মদ আরবের প্রধান নগর মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া উহার অগ্র একটি বড় নগর মদিনায় গমন করেন, সেই সময় হইতে তাহা-দিগের ধর্মের প্রারম্ভ। মহম্মদের পলায়ন হিজ্রা বা হিজিরা নামে

পরিচিত। মুসলমানেরা এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, এবং মহম্মদকে সেই ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলিয়া জানে। তাহারা ইহাও বলে যে, সমস্ত মুসলমানই পরস্পর ভ্রাতা ও ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। ইসলাম ধর্মের জাতিভেদ নাই।

৪। আরবেরা এইরূপে এক জাতিতে গ্রথিত, এক ধর্মাবলম্বী ও এক নায়কের অধীন হইয়াছিল, তাহারা এখনও পূর্বের জায় উগ্রস্বভাব ও যোদ্ধা রহিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহাদিগের আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিত না। তাহারা নূতন উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের এই নূতনধর্মের অবিখ্যাসী বা কাফেরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাহাদিগের মতে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন। বিশেষতঃ ঈদূশ ধর্মযুদ্ধে যে সকল মুসলমান নিহত হইবেন, তাহারা অমনি স্বর্গধামে চলিয়া যাইবেন। এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া তাহারা কার্যক্ষেত্রে ব্রতী হইলেন। তাহারা তাহাদিগের বশতা স্বীকার করিল, কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম গ্রহণ করিল না; তাহাদিগের উপর জিজিয়া নামে একটা দুর্ব্বহ টেক্স বা করভার চাপাইবার রীতি অবলম্বন করা হইল।

৫। তাহারা আরবের উত্তরদিগ্বর্তী দেশগুলি আক্রমণ করিয়া সহজেই জয় করিয়া লইলেন। এই যুদ্ধে লুণ্ঠন দ্বারা প্রচুর ধন-সম্পত্তি তাহাদিগের হস্তগত হইল। তাহারা ঈদূশ লোভ বশতঃ অন্যান্য দেশও জয় করিয়া লইবার নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অতএব ক্রমেই এক দেশ হইতে আর এক দেশে অবিশ্রান্ত তাহাদিগের আক্রমণ চলিতে লাগিল। এইরূপে শতক বৎসরের মধ্যেই তাহারা পারস্য, তুর্কস্থান, আফ্গানিস্থান, অর্থাৎ সমস্ত পুরাতন পারস্য সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া লন, এবং এই সমস্ত রাজ্যই মুসলমান রাজ্য হইয়া যায়।

৬। পারস্যের কতকগুলি লোক কিছুতেই আরবদিগের নিকট

মস্তক অবনত অথবা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না । তাহারা তাহাদিগের দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আইসে । ১২০০ শত বৎসরের অধিককাল অবধি, তাহারা এই দেশেই বাস করিতেছে । তাহারা এদেশে পারসী নামে পরিচিত । প্রাচীন আর্যাদিগের ন্যায় তাহারা অগ্নিকে জগদীশ্বরের প্রতিক্রম বলিয়া জানে । পারসীরা এখন প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের পশ্চিম উপকূলে বাস করে । তাহারা স্বভাবতঃই বড় শিষ্ট ও শাস্ত প্রকৃতির লোক এবং বাণিজ্য বাপারে নিপুণ ও দক্ষ । পারসীদিগের অনেকেই ধনশালী এবং পরের হিতামুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে মুক্তহস্ত ।

৭ । উত্তরভারতে উত্তর দিক হইতে বহু শত বৎসর পর্য্যন্ত নূতন জাতি আর তেমন বল-বিক্রম-সহকারে প্রবিষ্ট হয় নাই । ভারতের উত্তরবর্তী দেশ সমূহে আরবদিগের প্রভাব-বিস্তারই ইহার কারণ । পারসিক ও তাতারদিগের সহিত আরবদিগের একরূপ যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে যে, ঐ সকল জাতি ভারতে প্রবেশ করিতে একবারেই অবসর বা সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই ।

(২৬)

দেববিগ্রহভঙ্গক গজনির মহম্মদ ।

১ । প্রায় ৯০০ বৎসর অতীত হইল, আফ্গান ও তুর্ককেরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে । ইহার অনেক পূর্বে সময়ে আর্য, গ্রীক ও সিথিয়ানগণও ইহাই করিয়াছিলেন । তিন শত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াগিয়াছে, আরবগণ আরবের উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত দেশ সমূহ জয় করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে তুর্কস্থান, পারস্য ও আফ্গানিস্থান মুসলমান রাজ্য হইয়া

হইয়াছে। তাহারাও আরববাসী আরবদিগের জায় উগ্রপ্রকৃতি ও তেজস্বী।

২। এই সময়ে, আফ্‌গানিস্থানের প্রধান নগর গজনী। মহামুদ নামক একজন তুর্ক তখন আফ্‌গানিস্থানের রাজা। তাঁহার পিতা পঞ্জাবের রাজপুত রাজা জয়পালের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত করেন এবং সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লন। এই সময়, ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটি সমৃদ্ধতম রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। ভারতের সহিত স্থলপথে ভারতের উত্তরপশ্চিম দিগবর্তী দেশসমূহ এবং ইউরোপীয় নানা দেশের প্রবলরূপে বাণিজ্য চলিতেছিল। ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান বাণিজ্যদ্রব্য, উষ্ট্রের পৃষ্ঠে, আফ্‌গানিস্থানের সঙ্কীর্ণ পার্শ্বতাপথে, ঐ সকল দেশে পরিচালিত হইত। মহামুদ যখন বালক, তখন তিনি তাঁহার পিতৃরাজ্যের মধ্য দিয়া সারি সারি উষ্ট্রশ্রেণীর উপরে বোঝাই করা ভারতের বাণিজ্যদ্রব্য অজস্র চলিয়া যাইতে দেখিতেন। তিনি সেই সওদাগরদিগের সহিত আলাপ করিতেন এবং তাঁহাদিগের কাছে ভারতের বড় বড় নগর ও সমৃদ্ধ মন্দির সমূহের বর্ণনা শুনিতেন। তিনি এই সকল বর্ণনা শুনিয়া বলিতেন যে, তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ও মানুষ হইবেন এবং রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিবেন, তখন তিনি হিন্দু রাজা-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তাঁহাদিগের পুতুল ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড এবং তাহাদিগের মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবেন। আরবেরা অন্ত্যান্ত দেশে যাহা করিয়াছে, তিনি ভারতে তাহাই করিবেন এবং তাঁহাদিগের স্বর্ণ, রৌপ্য ধনরত্ন ও মূল্যবান সামগ্রীনিচয় লুণ্ঠন করিয়া গজনীতে লইয়া আসিবেন।

৩। মহামুদ ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজা হন এবং রাজা হইয়া, তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে, তাহাই কার্য্যে পরিণত করেন। তিনি রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বর্ষা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, অপেক্ষা করিলেন। বর্ষা অতিবাহিত হইলে, এবং পার্শ্বতাপথে যে সকল বরফ যমিয়াছিল,

সেগুলি গলিয়া গেলে, মহামুদ তাঁহার সৈন্যদল ভাবতবর্ষের দিকে চালনা করিলেন। তিনি এই সৈন্যদলের সঙ্গে লুণ্ঠিত বস্তু বহিয়া আনিবার জন্য বহুসংখ্যক উষ্ট্র ও ঘোটক লইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। যে জয়পাল তাঁহার পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, মহামুদ দেখিতে পাইলেন যে, সেই জয়পাল তাঁহার সঙ্গেও যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। কিন্তু মহামুদ ও তাঁহার আফ্গান সৈন্যগণ রাজাকে রণত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন এবং মহামুদ মূল্যবান ধনরত্ন ও দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া, গজনীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা জয়পাল পরাভবজনিত লজ্জা, দুঃখ ও অপমানে ক্রিষ্ট হইয়া, পুত্র আনন্দপালের হাতে রাজ্য সমর্পণ এবং আপনি জলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-বিসর্জন করিলেন।

৪। আনন্দপাল দেখিতে পাইলেন যে, হিন্দুস্থানের ঘোর বিপদকাল উপস্থিত। তিনি উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনোজ, দিল্লী ও আজমীর প্রভৃতি স্থানের বড় বড় রাজপুত রাজাদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া, তাঁহাদিগের সকলকেই আফ্গান সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। আফ্গান সুলতান তখন ভারতে ছিলেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন, সুলতান আগামী বর্ষে পুনরায় ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তাঁহার আহ্বানে সকলেই আগমন করিলেন। পঞ্চাবে এক অতি বৃহৎ রাজপুত সৈন্যদল সমবেত হইল। কিন্তু শীত-প্রধান উত্তরদেশের আফ্গানগণ হিন্দুস্থানের উষ্ণ-প্রান্তর-বাসী রাজপুত অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। ঘোর যুদ্ধের পর আফ্গানেরা রাজপুতদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিল। মহামুদ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নাগরকোটের সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ মন্দির লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিলেন। মহামুদ সমস্ত মন্দির লুণ্ঠন দ্বারা, অতীত যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া ধার্মিক হিন্দুগণ কর্তৃক দেবোদ্দেশে প্রদত্ত, মন্দিরসমূহে সঞ্চিত ষত স্বর্ণ রৌপ্য

ও মণি মুক্তাদি ছিল, সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া পুনরায় গজনীতে ফিরিয়া যান।

৫। এইরূপে মহামুদ ক্রমে সপ্তদশ বার আফগান সৈন্যসহযোগে ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ক্রমশঃ অধিকতর সাহসী হইয়া প্রতি-বারেই কিছু কিছু করিয়া ভারতের অভ্যন্তরে দূরতর প্রদেশে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি যে অঞ্চলে কোন ধনসম্পন্ন নগর বা সমৃদ্ধ মন্দিরের সন্ধান পাইতেন, সেই দিকেই তাঁহার সৈন্য চালনা করিতেন। তিনি দেবমন্দির ভগ্ন করিতেন ও দেববিগ্রহ চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেলিতেন, এবং শত শত বৎসর ব্যাপিয়া মন্দিরের যাজক বা মোহান্তগণ উহাতে যে সকল ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা লুণ্ঠিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেন।

৬। মহামুদ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সর্বশেষ ভারতে আগমন করেন। এই বার তিনি দক্ষিণদিকে সৈন্য চালনা করিয়া গুজরাট প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হন। গুজরাটে ধনসমৃদ্ধির জন্য ভারতের সর্বত্রপ্রসিদ্ধ একটি অতি পুরাতন মন্দির ছিল। এই মন্দিরে সোমনাথ নামক এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহামুদের আক্রমণ হইতে মন্দির রক্ষার জন্য বহু-সংখ্যক হিন্দু সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। মহামুদ সিন্ধু প্রদেশের বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যদিয়া, তিন শত পঞ্চাশ মাইল ব্যাপি সুদীর্ঘ ও অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, মন্দির সমীপে উপস্থিত হন। কিন্তু মন্দির-রক্ষার্থ সমবেত হিন্দু সৈন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বিজয়ী মহামুদ মন্দিরে প্রবেশ করিলে, মন্দিরের যাজকগণ কম্পিতকলে-বরে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া, সোমনাথ নামক বৃহৎ বিগ্রহটিকে অক্ষত রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাকে প্রভূত অর্থদানে প্রস্তুত হন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যাশ্বরে বলেন “আমি পুত্তলবিক্রেতা নহি, পুত্তল-সংহর্তা” ইহা বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার হস্তস্থিত লৌহ গদা

দ্বারা সেই বিরাট্ বিগ্রহের উপর ভীমবলে এমন একটা আঘাত করেন যে ঐ আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ চূর্ণ হইয়া পড়িয়া যায় ।

৭ । এইবার ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার অল্পকাল পরেই, মহামুদের মৃত্যু হয় । তিনি যদিও স্বয়ং এদেশে অধিষ্ঠিত হন নাই, তথাপি পঞ্জাবে উহার প্রধান নগর লাহোরের ভার দিয়া একটি কস্মচারীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন । ইহার পরে, হিন্দুগণ ক্রমান্বয়ে ১৫০ বৎসর কাল ভারত হইতে আফ্গানদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া-ছিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই । মহামুদের উত্তরাধিকারী আফ্গান রাজারা দৃঢ়হস্তে লাহোর আত্ম-অধিকার-ভুক্ত করিয়া রাখেন এবং পুনঃ পুনঃ পঞ্জাব হইতে সুদূরবর্তী গঙ্গার বিস্তৃত প্রান্তরে যে সকল হিন্দুনগর ছিল, তাহা লুণ্ঠন করিতে থাকেন । এই আফ্গান রাজাদিগের দুটি রাজধানী ছিল একটি গজনী আর একটি লাহোর ।

• (২৭)

মহম্মদ ঘোরি ।

১১৮৬—১২০৬ ।

১ । গজনীর তুর্কি রাজগণ প্রায় ১৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করিলে পর, আফ্গানদিগের এক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে পরাস্ত করে । এই আফ্গান সম্প্রদায়, আফগানিস্থানের উত্তরপশ্চিমবর্তী ঘোর নামক এক ক্ষুদ্র প্রদেশে বাস করিত । মহম্মদ সাহাবুদ্দিন নামক এক রাজকুমার তখন এই জাতির শাসনকর্তা ছিলেন । এই মহম্মদ সাহাবুদ্দিনই ইতিহাসে মহম্মদ ঘোর নামে পরিচিত । তিনি গজনীর মহামুদের স্ত্রী অতিশয় সাহসী ও বর্ণপ্রিয় যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন । তিনিও, মহামুদের স্ত্রী, উত্তরভারত আক্রমণে জীবন অতিবাহিত করেন । কিন্তু মহামুদের মৃত ভারতের প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ নগর ও মহামুদের লুণ্ঠনই তাঁহার উদ্দেশ্য

ছিল না, দেশ জয় ও পরাজিত দেশ সমুদায়কে স্বাধিকারভুক্ত করিয়া রাখাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।



[মহম্মদ ঘোরি ।]

২। এই সময়ে, উত্তরভারতে চারিটি বৃহৎ রাজপুত রাজ্য ছিল। তোমরা সম্প্রদায়ের প্রধান নগর দিল্লী, চোহানদিগের আজমীড়, রাঠোরদিগের কনৌজ এবং বাঘিলাদিগের গুজরাট। দিল্লীতে অবস্থিত তোমরা সম্প্রদায়ের অধিনায়ক পুত্রসন্তানে বঞ্চিত ছিলেন। সুতরাং তিনি দৌহিত্রকে উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ

করেন। তদীয় দৌহিত্র চোহান রাজপুতদিগের সর্দার বা অধিনায়ক ছিলেন। এই পরমরূপবান্ ও সাহসী যুবা পুরুষের নাম পৃথ্বীরাজ। মাতামহের মৃত্যুর পরে পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীড় এই উভয় স্থানের রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু রাঠোর রাজপুতদিগের সর্দার জয়চাঁদও তোমরা সর্দারেরই দৌহিত্র। তিনি মাতামহকর্তৃক উপেক্ষিত হওয়াতে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হন এবং ভ্রাতা পৃথ্বীরাজকে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন।

৩। সাহাবুদ্দিন প্রথম বার ভারত আক্রমণে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরবর্তী থানেশ্বরে, দিল্লী, ও আজমীড়ের রাজা পৃথ্বীরাজ অগ্রাগ্র রাজপুত রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, সাহসী রাজপুতসেনাসহ তাঁহার সম্মুখীন হন। যুদ্ধে রাজপুতগণ আফ্গানদিগকে সর্বতোভাবে পরাভূত করে। স্বয়ং সাহাবুদ্দিনও এই যুদ্ধে প্রায় নিহত হইয়াছিলেন। রাজ-

পুতগণ ৪০ মাইল পর্যন্ত পরাজিত আফগানদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যাহারা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া সিকুনদের দিকে পলায়ন করিয়াছিল।

৪। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দিন আর একবার দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এবার তাঁহার সঙ্গে ১৫০০০০ সৈন্য ছিল। সৈন্যদল বলিষ্ঠ আফগান অশ্বে আকৃষ্ট। কিন্তু পৃথ্বীরাজ এবার রাঠোর রাজের সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন না। কোন বন্ধু বান্ধবও তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল না। তিনি তাঁহার চৌহান সর্দারদিগকে সঙ্গে লইয়া থানেশ্বরের মাঠে পুনরায় মহম্মদ ঘোরির সম্মুখীন হইলেন। যথার্থ রাজপুত বীরের ত্রায় তাঁহারা মহাসাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু ফল অন্তরূপ হইল। তাঁহারা দুর্দান্ত আফগান-



[পৃথ্বীরাজ।]

দিগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিলেন, এবং পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। পৃথ্বীরাজমহিষী রাজা জয়চাঁদের কন্যা নিহতপতির মৃতদেহ সহ অলস্ত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহম্মদ ঘোরি দিল্লী অধিকার করিয়া আজমীড়ে উপস্থিত হইলেন। এবং আজমীড় হস্তগত করিয়া প্রভূত লুণ্ঠিত সামগ্রীসহ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি এইরূপে ভারতে যে সকল প্রদেশ জয় করিলেন, সেই সকল প্রদেশের শাসন সংরক্ষণার্থ কুতুবদ্দিনকে নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

৫। পর বৎসর ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দিন ঘোরি পুনরায় ভারতে

আগমন করেন। এবার কনোজরাজ জয়চাঁদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটনা হয়। জয়চাঁদ সাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু চৌহান রাজপুতদিগের সাহায্য না পাওয়াতে, তিনি আফ্গানদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়া, তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, তাঁহার প্রবলপ্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজের স্ত্রায় পলায়নপর ও নিহত হন। ঘোরি সেনাদল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, কনোজ ও বেনারস অধিকার করিয়া লয়। এক বেনারস বা কানীধামেই তাহারা সহস্রাধিক মন্দির ভগ্ন করিয়া ফেলে এবং লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি দ্বারা চারি হাজার উষ্ট্র বোঝাই করিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

৬। রাঠোর রাজপুতগণ, এই ঘটনার পরে, উত্তরভারতের আরও কএক সম্প্রদায় রাজপুতদিগকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসভূমি যমুনা ও গঙ্গার তটপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক, দক্ষিণদিকে চলিয়া যান। এই স্থানে তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এইক্ষণে তাঁহাদিগকে সেই জন্মস্থানের মমতা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। তাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও গৃহপালিত পশুপাল, গো, মেষাদি লইয়া সুদূর দক্ষিণে মারোয়ার অঞ্চলে এবং আরাবলী পর্বতমালার পূর্ব ও পশ্চিম দিগ্বর্তী দেশে প্রস্থান করিলেন। এই প্রদেশ, সেই সময় হইতে, রাজপুতনা বা রাজপুতদিগের রাজ্য বলিয়া পরিচিত।

৭। ইহার পরে, মহম্মদ ঘোরি ও তাঁহার সেনাপতিগণ প্রায় সমস্ত উত্তরহিন্দুস্থান জয় করিয়া লইলেন। বখ্তিয়ার খিলজি নামক জনৈক সেনাপতি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা ও বিহার এবং ১২০৩ সনে বাঙ্গালা জয় করিলেন। তখন লক্ষ্মণাবতী নামক নগর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। আফ্গানেরা তাহাদিগের স্বদেশ 'ঘোর' এই নামের অনুকরণে লক্ষ্মণাবতীর নাম রাখিল গৌর। বাঙ্গালার বৃদ্ধ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন

প্রায় বন্দী হইবার মত হইয়াছিলেন । বৃদ্ধ রাজা মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়াছেন, এই সময়ে, আফ্গানেরা ভীমবেগে তাঁহার পুরীতে প্রবেশ করে। তিনি রিক্তপদে খিড়কীর দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া উড়িয়া অভিযুখে পলায়ন করেন। তিনি উড়িয়ায় জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় লইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ইহার পর, রাজপুতদিগের গুজরাটনিবাসী বাঘিলা-সম্প্রদায় ও গোয়ালিয়রের রাজপুতগণ আফ্গানদিগের নিকট পরাভূত হন। কিন্তু মালোয়ার রাজপুতগণ পরাভূত হন নাই।

৮। মহম্মদ ঘোরি শেষ বার ভারতবর্ষে আসিয়াই নিহত হন। তিনি পঞ্জাবের মধ্যদিয়া চলিয়া যাইবার সময়, একদিন রাজ্যে তাঁহার তাঁবুর অভ্যন্তরে নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় ঐ অঞ্চলের পার্শ্বত্যাগী, গাকরদিগের একদল তাঁবু আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার মৃত দেহ গজনীতে নীত ও সেই স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর, কুতুবুদ্দিন তাঁহার ভারতীয় অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া আপনাকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। মহম্মদ ঘোরিই প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বপ্রথম ভারতবিজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার সৈন্যদল ভারতে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। গজনীর মহামুদের জায় তাঁহারা লুণ্ঠন করিয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে ভারত আক্রমণ করেন নাই।

(২৮)

আফ্গান বা পাঠান রাজগণ ।

১২০৬—১৫২৬।

১। ১২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩২০ বৎসর কাল, আফ্গান রাজগণ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের কএক জন

পাখ্‌টান অথবা পাঠান জাতীয় ছিলেন বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাদিগকে পাঠানরাজ নামে অভিহিত করিয়াছেন । তাঁহাদিগের প্রায় সমস্তই আফ্‌গানজাতিভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সকলই এক সম্প্রদায়ের লোক বা এক বংশের সন্তান নহেন । দাস-রাজা, খিলিজি, টোগলক, সৈয়দ এবং লোদি নামক পাঁচটি পৃথক্ পরিবারের রাজগণ রাজ-সিংহাসনে ক্রমে অধিকৃত হইয়াছিলেন ।

২। একটি একটি করিয়া প্রাচীন হিন্দু রাজ্যগুলি পাঠানদিগের বশতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় । হিন্দুদিগের পক্ষে এই সময়টা অতিবড় ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল । এই সমস্ত সময় ব্যাপিয়া, হিন্দুস্থানের প্রায় সর্বত্র অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল । কোন হিন্দু রাজাই কঠোর প্রয়াস ব্যতীত, আফ্‌গানদিগের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই । অনেকে কোন কালেও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হন নাই । এই সময়, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই, তুর্ক, তাতার, আফ্‌গান ও মোগলদিগের নূতন নূতন সম্প্রদায় তুর্কস্থান, তাতার দেশ ও আফ্‌গানিস্থান হইতে ভারতে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া, দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পুরাতন হিন্দু অধিবাসী এবং যে সকল আফ্‌গান ও তুর্ক এদেশে অধিষ্ঠিত ছিল, এই উভয়ের বিরুদ্ধেই রণ-বাপারে লিপ্ত হইয়াছে ; সুতরাং দেশে কিছু মাত্র শান্তির সম্ভাবনা ছিল না ।

৩। এই হেতু যাহার ঘরে টাকা কোড়ি অথবা মণিরত্ন সঞ্চিত ছিল, সেই, পাছে কোন সৈন্ত সামন্ত সন্ধান পাইয়া বল পূর্বক উহা কাড়িয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে, মাতীর নীচে গর্ত করিয়া, ঐ সকল ধন-রত্ন লুকাইয়া রাখিত । আমাদিগের এই বর্তমান যুগে চারিদিকে সর্বপ্রকারে শান্তি বিরাজমান । পাঠান রাজাদিগের সময়ে হিন্দুস্থানের যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহি । পুরাতন হিন্দু দেব-

মধ্যে যাহারা স্বলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারাও অশ্রদ্ধাশীলবীর প্রতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর ছিলেন ; এবং হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করা ও যাহারা কিছুতেই মুসলমান হইতে সন্মত নহে, তাহাদিগকে হত্যা করা, আপনাদিগের অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের এক অঙ্গ বলিয়া জানিতেন । গরীব দুঃখী লোকেরা প্রাণ-রক্ষার জন্ত বনে জঙ্গলে পলাইয়া যাইত ; স্মরণ্য বহু উর্বর-ক্ষেত্র বিনা চাষে পতিত পড়িয়া থাকিত । বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল । কতকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ; অনেকে বিজেহুদিগের শাসন-কাৰ্য্যালয়ে ও মৈত্রদলে স্থান পাইবার প্রলোভনে পড়িয়া, মুসলমান হইয়াছিল । পাঠানদিগের কতিপয় প্রসিদ্ধ সেনাপতি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হিন্দু ।

৪। যেমন প্রাচীন আধাগণ পঞ্জাব হইতে ক্রমে পূর্বদিকে যমুনা ও যমুনা হইতে গঙ্গার উত্তরপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আফগান, তুর্ক ও পারসিকেরাও তেমনই পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া, সিন্ধুপ্রদেশ হইতে সমস্ত দিল্লী অযোধ্যা, বিহার ও বাঙ্গালা প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন । পারস্ত ও তুর্কস্থানবাসী অশ্রদ্ধা বীরপ্রকৃতিক লোকেরা যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাহাদিগের বন্ধুবান্ধবেরা ভারতে যাইয়া, অতি সহজে আপনাদিগের বাড়ী ঘর বানাইয়া প্রতিষ্ঠিত ও অনায়াসে ধনী ও বড় মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তাহারাও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত, দলে দলে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মুসলমান রাজা ও শাসনকর্তারা হিন্দুস্থানের উর্বরপ্রদেশে ভূমি দান করিয়া তাহাদিগকে আদরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । বর্তমান সময়ে উত্তরভারতে যে সকল বড় বড় মুসলমানপরিবার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদিগের অনেকেই এইরূপে এদেশে আগমন করেন । ঐ সকল দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারগণ সাহসী সঙ্গীদল সঙ্গে লইয়া আসিয়া, সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া

যখন ক্ষমতাপন্ন ও প্রতাপশালী থাকিতেন, তখন তাঁহারা দিল্লীর রাজ-কোষে বার্ষিক কর পাঠাইয়া দিতেন এবং আপনাদিগকে তাঁহার অধীন সর্দার বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট যখন একটু দুর্বল বা হীনশক্তি হইয়া পড়িতেন, তখন প্রত্যেক সর্দারই আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেন এবং কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেন না।

(২৯)

দাস রাজ-বংশ।

১২০৬—১২৯০

১। সর্বসমেত দাসবংশীয় নয়টি রাজা ও একটি রাণী রাজত্ব করিয়াছিলেন। সর্বসাকল্যে তাঁহাদিগের রাজত্ব ৮৪ বৎসর স্থায়ী ছিল। তাঁহাদিগের একজন অতি অল্প কাল মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দাস রাজাদিগের মধ্যে পাঁচ জনই অল্প সকল অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত।



[কুতুব উদ্দিন]

২। এই বংশের প্রথম রাজা কুতুব উদ্দিন। তিনি তুর্ক বংশের সন্তান এবং বাল্য বয়সে ক্রীতদাস ছিলেন। সেই কালের মুসলমানদিগের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, যুদ্ধে যেসকল লোক বন্দী হইত, তাহারা সকলেই বিজেতার দাসশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িত। এই সকল দাসেরা দেশদেশান্তরে প্রেরিত

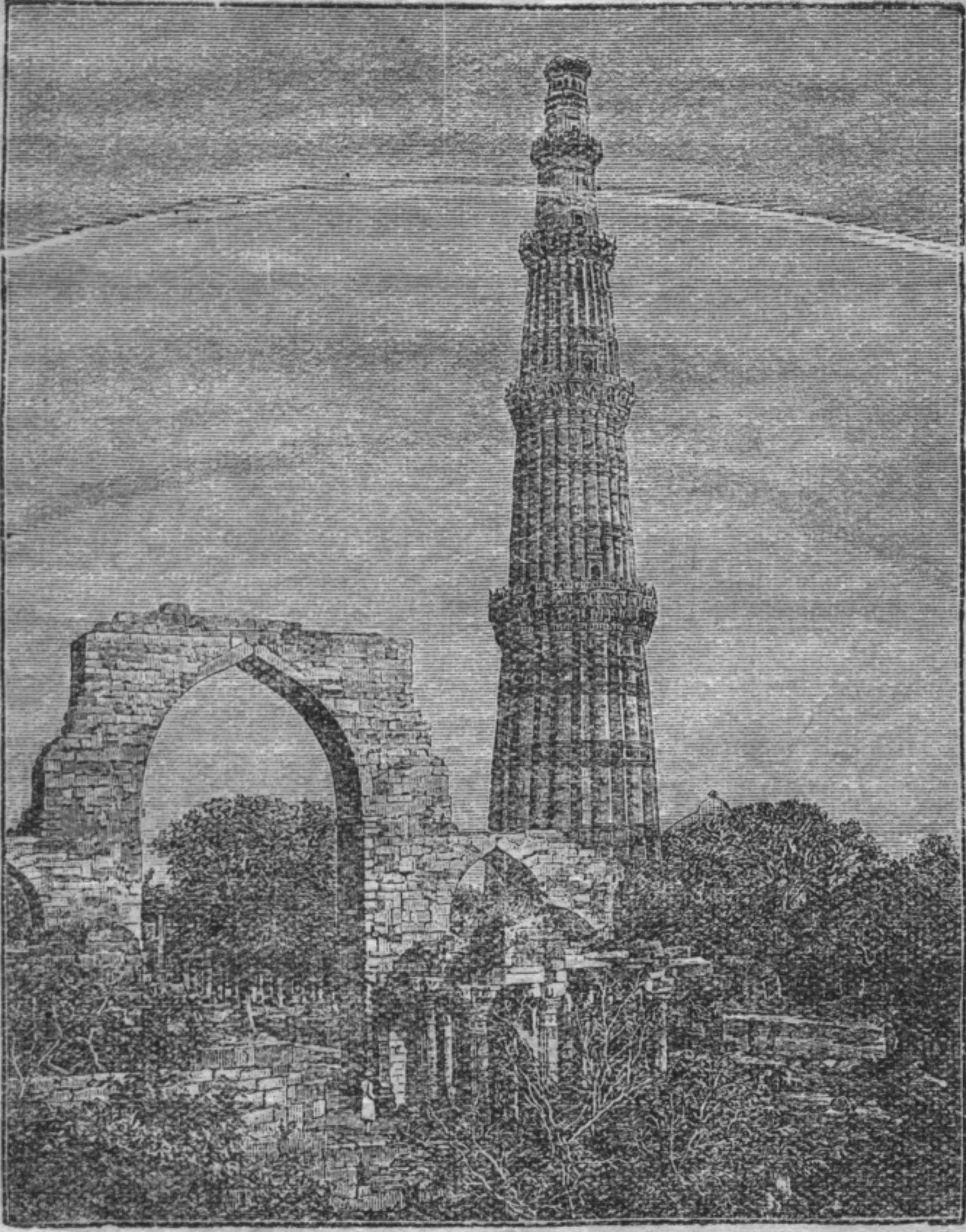
ও বিক্রীত হইত। তাহারা বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিত।

স্বদেশ ও স্বজাতীয় লোক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরদূরান্তরে সরিয়া পাড়াতে, তাহারা তাহাদিগের প্রভুর পরিবার ও লোকজনকেই আপনার জন বলিয়া বুদ্ধিত এবং সর্বতোভাবেই তাহাদিগের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া চলিত। সময় সময়, প্রভু যদি নিঃসন্তান হইতেন, তাহা হইলে বালক দাসদিগকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করিতেন। এইরূপেই দাস বালক কুতুব তাহার প্রভু-পরিবারে পরিগৃহীত হইয়া, একজন প্রসিদ্ধ সেনানায়ক হইয়া উঠেন, এবং অবশেষে একবারে রাজা হইতেই সমর্থ হইয়াছিলেন। দাসরাজদিগের তিনিই প্রথম। দাসরাজাদিগের অনেকেই বালক কালে, কুতুবের ছায়, ক্রীতদাস ছিলেন। এই হেতুই, তাহারা দাসরাজা নামে পরিচিত।

৩। কুতুব সাহসী বীর ও স্ননিপুণ সেনানায়ক ছিলেন। তিনি তাহার কৰ্মচারীদিগের প্রতি এতদূর সদয় ছিলেন এবং তাহাদিগকে ভূমি ও অর্থ দানে তাহার এত দূর অমুরাগ ও উৎসাহ ছিল যে, তিনি সকলের নিকট দাতা কুতুব বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি হিন্দুদিগের প্রতি যার-পর-নাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। পঁচিশটি হিন্দু মন্দিরের প্রস্তর দ্বারা তিনি দিল্লীর নিকট অতি সুন্দর একটি স্তম্ভ বানাইতে আরম্ভ করেন। তাহার নাম অনুসারে এই স্তম্ভকে ‘কুতুব মিনার’ বা কুতুবের মিনার এই নাম প্রদান করা হইয়াছে। ‘কুতুব মিনার’ এখনও বর্তমান আছে। ইহার উচ্চতা ২৫০ ফুট। কুতুব মিনারের ন্যায় উচ্চস্তম্ভ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

৪। তৃতীয় দাস রাজার নাম আল্‌তামাস। আল্‌তামাস দাস রাজা-দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ২৫ বৎসর বয়সে রাজত্ব করেন। তিনিও, কুতুবের ছায়, বাল্যকালে দাস ছিলেন। তিনি শৈশবে স্বয়ং কুতুবের দাসরূপে তাহার পরিবারের মধ্যে পরিগৃহীত হন এবং অবশেষে দাসের লাজন পুছিয়া ফেলিয়া, কুতুব-কন্টার পাণিগ্রহণ করেন।

কুতুবের মৃত্যু হইলে পর, আনুতামাস কুতুবের পুত্র আরামকে নিহত করিয়া,
সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। বখুতিয়ার খিলিজি কুতুবের অধীন



[কুতুব মিনার]

শাসনকর্তারূপে বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করিয়া ঐ দুই প্রদেশের

শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কুতুবের মৃত্যুর পর, তিনি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইতে প্রয়াসপন্ন হন। তিনিও কুতুবের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং, তিনি কেন, কুতুবের অগ্রজামাতা আলতামাসের অধীন হইবেন? কিন্তু অচিরেই যুদ্ধ ঘটনা হইল। যুদ্ধে আলতামাসই প্রবলতর প্রতিপন্ন হইলেন। আলতামাস যুদ্ধে বখতিয়ারকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, আপনার একটি পুত্রকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

৫। আলতামাস যখন দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়, চেঙ্গিজ্ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ তাতার বা মোগল সর্দার মঙ্গোলিয়ার বহু লোকের দ্বারা এক অতি বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিয়া, এশিয়ার অধিকাংশ মুসলমান রাজ্য জয় করিয়া লন। চেঙ্গিজ্ খাঁ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি ভারত আক্রমণের অভিপ্রায়ে সিন্ধুদের তট পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আলতামাস এই পরিমাণ চতুর ছিলেন যে, তিনি এমন প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সম্ভব মনে করেন নাই। তুর্ক-স্থানের জনৈক সর্দার চেঙ্গিজ্ খাঁর ভয়ে পলায়নপর হইয়া, আলতামাসের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন। আলতামাস সাহায্য দানে অসম্মত হইয়া চেঙ্গিজ্ খাঁর প্রীতি সম্পাদন করেন। আলতামাস জীবিত থাকিতে মোগলেরা ভারত আক্রমণ করে নাই।

৬। আলতামাসের পরে, তাঁহার কন্যা সুলতানা রিজিয়াকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হয়। রিজিয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রক্নুদ্দিন প্রথমে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মাত্র সাত মাস কাল রাজত্ব করিলেই, দৃষ্ট হইল যে, তিনি শাসন-কার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই হেতু, তাঁহার পরিবর্তে রিজিয়াকে সিংহাসন দান করা হইয়াছিল। রিজিয়া ভিন্ন আর কখনও কোন রাণী দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার পিতা আলতামাস যখন দূর দেশে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন তিনি কন্যা

রিজিয়া হাতে দিল্লীর ভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। আত্মত্যাগ বলিতেন যে, রিজিয়া পুরুষের প্রাণ ও পুরুষের বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং কতটা রিজিয়া কুড়িটি পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। তিনি রাণী হইয়া, সর্দার তিন বৎসর কাল, দৃঢ়হস্তে ও সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি, অত্যাশ্রয় সম্রাট মুসলমান মহিলাদিগের আশ্রয়, অবগুণ্ঠন পরিচালনা না। পুরুষের পরিচ্ছদে দিল্লীস্থিত আফগান সুলতানদিগের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ্য দরবারে কার্য্য কর্ম দেখিতেন এবং সাক্ষাৎ-



[সুলতানা রিজিয়া]

কার কামনায় যে কোন পুরুষ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইত, তাহার সহিতই দেখা সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিতেন।

৭। রাণী রিজিয়া তদীয় রাজ-দরবারের জনৈক সম্রাট ভদ্র লোকের প্রতি একটু অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার সর্বাধীন সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি জাতিতে আফগান নহেন আবেসেনীয়। ইহাতে রাজদরবারের অশ্রু সমস্ত আফগান সম্রাট ব্যক্তিগণ যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; এমন কি, তাঁহারা এই ক্ষোভে রিজিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। রিজিয়া অতঃপর আত্মরক্ষার্থ একটি তুর্ক সদ্ধারের পাণিগ্রহণ করেন। তুর্ক সদ্ধার তাঁহার পক্ষে বিশেষ সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রিজিয়া ও তাঁহার পতি উভয়েই যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হন।

৮। নাছির উদ্দিন আল্‌তামাসের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। রিজিয়ার মৃত্যুর পরে আল্‌তামাসের অপর এক পুত্রকে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দুই বৎসর রাজত্ব করেন। দুই বৎসর রাজত্ব করিলেই আফ্‌গান অভিজাতগণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া আল্‌তামাসের এক পৌত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। পাঁচ বৎসর পরে, এই পৌত্রও কারারুদ্ধ হন এবং নাছির উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হয়।



[নাছির উদ্দিন]

৯। নাছির উদ্দিন দীন-দরিদ্রের ভ্রাতা, আড়ম্বরশূন্য শান্ত জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার কোন ভৃত্য ছিল না। পত্নীও একটি মাত্র ছিলেন। পত্নী স্বহস্তে নাছির উদ্দিনের জন্য আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সামান্ত বস্তু দ্বারা তিনি ভোজন-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি স্বহস্তে পুস্তক নকল করিয়া যে পারিশ্রমিক পাইতেন, তদ্বারাই তাঁহার দৈনিক আহাৰ্য্যের ব্যয় নির্বাহ হইত। একদিন একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসিয়া, তাঁহার স্বহস্তে নকল করা এক খানি পুস্তকে কতকগুলি ভুল দেখাইয়া দেন। তিনি ঐ ভদ্রলোকের কথা অনুসারে, সেগুলি তখনই সংশোধিত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই, তিনি সেই সংশোধিত লেখা পুছিয়া ফেলিয়া, পূর্বের যেমন ছিল, আবার তেমনই করিয়া লিখিয়া লইলেন। এরূপ করার কারণ কি, কেহ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি উত্তর করিলেন যে, প্রকৃত-প্রস্তাবে সেগুলি ভুল নহে। ভদ্রলোক দয়া করিয়া ভাল ভাবিয়া তাঁহার

ভ্রম-সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই ; এই হেতুই, তাঁহার উপদেশ মতে কএকটা কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

১০। নাছির উদ্দিনের মৃত্যুর পর, তাঁহার মন্ত্রী বা উজির গিয়াস্ উদ্দিন বলবন্ উপাধি গ্রহণ করিয়া, স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তিনিও প্রথম বয়সে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু তিনি সদ্বংশের সন্তান। আনুতামাস তাঁহাকে ক্রয় করিয়া আনেন। তিনি ক্রমে এক পদ হইতে অল্প পদে আরুঢ় হইয়া, অবশেষে আনুতামাসের একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পরে, তিনি একটা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন।

১১। বলবনের রাজত্বকালে, এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মোগলগণকর্তৃক বিতাড়িত বহুসংখ্যক মুসলমান অভিজাত ও সর্দার আশ্রয়-লাভার্থে ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হন। বলবনের রাজদরবারে মোগলের ভয়ে পলায়িত পনরটি রাজকুমার অশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলবন্ তাঁহাদিগের নাম ও পরিচয় অনুসারে দিল্লীর রাজ-পথগুলির নাম [বলবন্]



[বলবন্]

নির্দেশ করেন। কোন পথের নাম করা হয়,—ঘোর দ্বীট, কোনটির নাম, বগদাদ এবং কোনটির নাম, খাইবা বা খিবা দ্বীট ইত্যাদি। এই সময়ে মোগলেরা দলে দলে আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিতে আরম্ভ

করে । কিন্তু পুনঃ পুনঃই তাহারা বলবন্ ও তাঁহার পুত্রগণকর্তৃক যুদ্ধে পরাভূত ও বিতাড়িত হয় । অবশেষে, এক যুদ্ধে বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ নিহত হন । বলবন্ তখন আশী বৎসরের বৃদ্ধ । তিনি, ২২ বৎসর কাল, রাজ্যশাসন করিয়া আসিয়াছেন । এই দুঃসংবাদ তাঁহার নিকট পঁছচিলে, বৃদ্ধ ইহা সহিয়া লইতে পারিলেন না ; এই শোকেই তাঁহার মৃত্যু হইল ।

(৩০)

খিলিজি বংশ ।

১২৯০—১৩২০

১ । খিলিজি বংশের চারি জন রাজা, ৩০ বৎসর কাল, রাজত্ব করেন । তাঁহারা সকলেই আফ্গান, কিন্তু তুর্কি ভাষায় কথা কহিতেন । প্রথমতঃ তাঁহারা তুর্কস্থান হইতে আইসেন । এই খিলিজিদিগের সময়েই মুসলমানেরা প্রথম দক্ষিণভারত আক্রমণ করেন ।

২ । খিলিজি বংশের প্রথম রাজা জেলাল উদ্দিন । তিনি যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন তিনি বৃদ্ধ,—বয়স ৭০ বৎসর । জেলাল, কি শত্রু কি मित्र, সকলের সহিতই শাস্ত্র ও যুদ্ধ ব্যবহার করিতেন । তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলা উদ্দিনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন এবং আপন পুত্রের স্ত্রীর ভাল বাসিতেন । আলা উদ্দিন দাক্ষিণাত্যে রণ যাত্রা করেন । ইহার পূর্বে, আফ্গানেরা দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে নাই । তিনি অতি অল্পসংখ্যক,—মাত্র ৮০০০ সৈন্য সহ বিক্র্য পর্বতের মধ্য দিয়া ৭০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, দেবগিরিতে উপস্থিত হন । মহারাষ্ট্র দেশের রাজা রামদেবের প্রধান নগর দেবগিরির বর্তমান নাম দৌলতাবাদ । খুল্লতাত জেলাল উদ্দিন তাঁহার প্রাণ-সংহারে যত্নবান্, সুতরাং তিনি জেলাল উদ্দিনের ভয়ে দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া যাইতেছেন ;—আলা এই কথা প্রচার করিয়া

দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই হেতু, কোন রাজপুত রাজা তাঁহাকে আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ আলা উদ্দিন দেবগিরি আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। রাজা প্রভূত মুদ্রা ও মণি-রত্ন এবং স্বীয় রাজ্যের একাংশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর, আলা উদ্দিন দিল্লীতে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার স্নেহশীল সদয়হৃদয় বৃদ্ধ খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের এই বীরত্বের সংবাদ পাইয়া, বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি প্রাণের আবেগে প্রায় একাকীই ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত দেখা করিতে গেলেন। বৃদ্ধ, আলা উদ্দিনকে দেখিতে পাইয়া, যেই তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বুকে ছোঁয়া বসাইয়া দিলেন! ইহার পরে আলা তাঁহার মাথা কাটিয়া লইয়া, ছিন্ন-মুণ্ড বল্লমের অগ্রে বিক্রি করিয়া, শিবিরের সর্বত্র ঘুরাইয়া আনিলেন! এই উপায়ে, জেলাল উদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছে, সকলের নিকট ইহা ঘোষণা করা হইল। আলা উদ্দিন দিল্লী প্রবেশ করিয়া, খুড়ার পুত্র দুটিকে হত্যা করিলেন এবং স্বয়ং নিকটকে রাজা হইয়া বসিলেন। জেলাল উদ্দিন যখন নিহত হন, তখন তাঁহার মাত্র ৭ বৎসর রাজত্ব করা হইয়াছিল।

১২২৫—১৩১৫

৩। আলাউদ্দিন নিষ্ঠুর, কঠোরহৃদয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি চারিজন খিলিজি রাজার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরা-

[আলাউদ্দিন খিলিজি]

ক্রান্ত। আলা উদ্দিন ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্য হইতে যে ধন-রত্ন লইয়া আসিয়াছিলেন, তৎসমস্ত সকলকে



বিলাইয়া দিলেন। এই উপায়ে খুল্লতাতের প্রতি তাঁহার সেই নিষ্ঠুরতার কথা কিঞ্চিৎ-মাত্রায় ঢাকিয়া ফেলান হইল। ইহার পরে, তিনি আপনার শক্তি দৃঢ় ও অপ্রতিহত করার মানসে, নানা কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

৪। আলা উদ্দিন প্রথমতঃ উত্তরভারতের রাজপুত রাজাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত, স বিশেষ যত্নবান হইলেন। তিনি ক্রমে তাঁহাদিগের অনেক দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে, ভীমসিংহ চিতোরের রাজা ছিলেন। ভীমসিংহের পত্নীর নাম পদ্মিনী। পদ্মিনী বড় সুন্দরী। আলা উদ্দিন পদ্মিনীর রূপের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে নিজের পত্নী করিয়া লইতে অভিলাষী হইলেন। তিনি বৃহৎ একদল সেনা লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কএক মাস কাল কিছুই করিতে পারিলেন না। অনন্তর, ভীমসিংহের নিকট বলিয়া পাঠান হইল যে, তিনি একবার মাত্র পদ্মিনীকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ভীমসিংহ যদি এই প্রস্তাবে সন্মত হইয়া, পদ্মিনীকে একবার দেখিতে দেন, তাহা হইলেই, তিনি চিতোর আক্রমণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। ভীমসিংহ অবশেষে আলাকে পদ্মিনীর মুখ দেখাইতে সন্মত হন। কিন্তু কথা হয় যে, পদ্মিনী পর্দার অন্তরালে উপবিষ্ট থাকিবেন। দর্পণে তাঁহার মুখের প্রতিবিম্ব মাত্র প্রদর্শিত হইবে। আলা চিতোরে গমন করিলেন, এবং দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া আসিলেন। কিন্তু ভীমসিংহ আলা উদ্দিনকে নিরাপদে তাঁহার শিবিরে পহুচাইয়া দিবার নিমিত্ত, তাঁহার সঙ্গে গমন করিলে, আলা উদ্দিন নিতান্ত নীচের স্ত্রীর তাঁহাকে আক্রমণ ও অবরোধ করিলেন এবং কহিলেন, ভীমসিংহ যদি পদ্মিনীকে না আনিয়া দেন, তাহা হইলে, কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। সুন্দরী রাজপুত-রানী দেখিলেন যে, আলা উদ্দিনের প্রস্তাবে সন্মতি দান ভিন্ন, পতির উদ্ধার সাধনের অন্ত কোন উপায় নাই। অতএব তিনি

রাজপুত্র শিবিকার আরোহণ করিয়া, আলা উদ্দিনের শিবির অভিযুগে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐক্লম বন্ধ করা আরও ৭০০ শত শিবিকা চলিল। বলা হইল যে এই সাত শত শিবিকাতে তাঁহার সাত শত দাসী যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দাসী নহে। প্রত্যেক শিবিকার এক এক জন স্বতন্ত্র রাজপুত্র সর্দার এবং শিবিকাবাহকেরা কুনীর বেশে সজ্জিত রাজপুত্র সেনা। আলা উদ্দিন যেই পদ্বিনী ও ভীমসিংহ উভয়কেই বন্দী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি প্রত্যেক শিবিকা হইতে এক একটি বীরপুরুষ লাফাইয়া পড়িল, শিবিকাবাহকেরাও অসি নিক্ষেপিত করিয়া দাঁড়াইল। এই গোলযোগে ভীমসিংহ ও পদ্বিনী উভয়েই অশ্ব-আরোহণে প্রস্থান করিলেন। আলা উদ্দিন এবার দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই ঘটনার এক কি দুই বৎসর পরে, তিনি পুনরায় বৃহত্তর সৈন্যদলসহ চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। রাজপুত্রেরা এবারকার আক্রমণ সহ করিতে পারিল না। যুদ্ধে বহুসংখ্যক রাজপুত্র বীর নিহত হইল; এবং যখন ইহা স্পষ্ট দেখা গেল যে, দুর্গ নিশ্চিতই শত্রু-হস্তে পতিত হইবে, তখন পদ্বিনী ১৩০০০ হাজার রাজপুত্র-রমণী সহ অগস্ত অনলে প্রাণত্যাগ করিলেন। যে সকল পুরুষ অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উন্মুক্ত-রূপাণ-করে শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিয়া, মহাসংহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। ইহার পর, যশস্বীর আক্রান্ত এবং ৮ মাস ব্যাপী অবরোধের পর গ্রহীত হয়। এইখানে ৪০০ হাজার স্ত্রীলোক আপনাদিগের মণি, রত্ন ও আভরণ সহ অগস্ত অনলে প্রবেশ করে এবং পুরুষেরা শত্রু সেনায় গণিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। রাজপুত্রদিগের অশুভিত এই পদ্ধতির নাম জহর-ব্রত। আলা উদ্দিন রাজপুত্রদিগকে পরাভূত ও গুজরাট ও রাজপুতনার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নগর হস্তগত করার পরে, দাক্ষিণাত্য অগ্র করিতে যান।

৫। আলার প্রধান সেনাপতি কাফুর। কাফুর হিন্দু ক্রীতদাস, তিনি ক্রীতদাস হইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। আলা স্বয়ং উত্তরভারত ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার ভয় ছিল মোগলেরা আসিয়া পাছে আক্রমণ করে, অথবা কোন সর্দার তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে বিদ্রোহী হইয়া স্বয়ং রাজা হইয়া বসিতে প্রয়াস পায়। অতএব, তিনি স্বয়ং না যাইয়া পরাক্রান্ত সৈন্য সহ কাফুরকে পুনঃ পুনঃ দাক্ষিণাত্যে পাঠাইতে লাগিলেন। কাফুরও শেষে বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া প্রভূত লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন।

৬। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে কাফুর দক্ষিণভারতে যাইয়া মহীশূরের কেনারী প্রদেশে প্রবেশ করেন। এইবার তিনি বল্লাল রাজাদিগের রাজধানী দ্বারনমুদ্র নগরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাফুর ঐ নগর অধিকার করিয়া, কুমারিণ অস্তরীপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এই স্থান পর্য্যন্ত যাইয়া প্রচুর ধন সহ তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আইসেন। কাফুর ধন দাক্ষিণাত্যে, সেই সময়ে, কতকগুলি মোগল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই সকল মোগলেরা আলা উদ্দিনের অধীন চাকরী গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পরে, ১৫০০০ বিদ্রোহী মোগলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া, তাহা-দিগের স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করা হয়।

৭। আলা উদ্দিনের রাজত্বকালে আফ্গান অভিজাতদিগকে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। রাজার অনুমতি ভিন্ন, কোন ব্যক্তি তাহার কোন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইতে পারিত না। প্রথমে রাজার নিকট অনুমতি না পাইয়া কোন ব্যক্তি বিবাহ করিতেও সমর্থ ছিল না। আলা উদ্দিন তাঁহার রাজত্বের শেষ সময়ে শাসন-কার্যে নিতান্তই শিথিলহস্ত হইয়া পড়েন। তিনি স্বয়ং সুরাসক্ত হইয়া, সেনাপতি কাফুরের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

৮। কাফুর স্বয়ং রাজা হইবার জন্য একান্ত উৎসুক। তিনি দিল্লী

ছাড়িয়া অত্যাচার যাইতে সম্মত নহেন। আলা উদ্দিন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার। বুদ্ধি বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কাফুর আলা উদ্দিনের দ্বারা তাঁহার (আলার) দুই পুত্রকে কারাবদ্ধ করাইলেন। চিতোর ও গোয়ালিয়রের রাজপুতগণ এবং দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র-সর্দারেরা যখন দেখিতে পাইলেন যে, আলা উদ্দিনের সে দৃঢ় হস্ত এখন আর শাসন-দণ্ড-চালনার সমর্থ নহে, তখন তাঁহাদের সকলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন; এবং আফগানের শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কাফুর অবশেষে বিষ-প্রয়োগে আলা উদ্দিনের প্রাণ সংহার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আলা উদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র-দ্বয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলেন। এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া, কাফুর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। রাজার আফগান-রক্ষী কাফুরের প্রাণ সংহার করিয়া আলার তৃতীয় পুত্র মোবারককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

(৩১)

টোগলক বংশ ।

১৩২০—১৪১৪ ।

১। এই বংশের ক্রমে আট জন রাজা রাজত্ব করেন। এই আট জনের মধ্যে মাত্র দুই জন লোক-সমাজে পরিচিত। এক জন পরিচিত দুষ্কার্যের জঘ, অজ্ঞান প্রসিক্ত শাসনের জঘ। এই দুই জন ঐ বংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি। দ্বিতীয় জনের নাম মহম্মদ টোগলক, তৃতীয়ের নাম কিরোজ টোগলক।

২। টোগলক বংশের প্রথম রাজা গিয়াস্ উদ্দিন। বলবনের একটি তুর্কী ক্রীতদাস ছিল। ঐ ক্রীতদাস এক হিন্দু মহিলার পাণিগ্রহণ করে। গিয়াস্ উদ্দিন তাহাদিগের সন্তান। গিয়াস্ উদ্দিন মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে, তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ, মহম্মদ

টোগলক নাম ধারণ করিয়া, সিংহাসনে অধিরূঢ় হন । জুনা খাঁ মহম্মদ টোগলক নামেই পরিচিত ছিলেন । মহম্মদ টোগলক ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন । তাঁহার রাজত্ব দেশের পক্ষে বিধাতার অভিসম্পাত স্বরূপ হইয়াছিল । দেশের লোকেরা তাঁহাকে খুনী সুলতান বা নরঘাতক রাজা বলিয়া ডাকিত । তিনি এতদূর নিষ্ঠুর ছিলেন এবং এমন অদ্ভুত কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন যে, অনেক হিন্দু তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিতেন । মোগলেরা বহুং সৈন্যদল লইয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল । তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া, রাজকোষে যে অর্থ ছিল, সমস্ত তাহাদিগকে ঘুষ স্বরূপ দিয়া দিলেন ।

৩ । তিনি যখন দেখিতে পাইলেন,—রাজকোষ শূন্য, তখন তামা দিয়া টাকা প্রস্তুত করাইয়া, রোপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তামার টাকা চালাইতে চেষ্টা করিলেন । কেহই তামার টাকা গ্রহণ করিল না দেখিয়া, তিনি টেক্স বা কর পূর্বাপেক্ষা দশগুণ বাড়াইয়া দিলেন । হতভাগ্য কৃষকেরা এই গুরুতর কর-ভার-বহনে অসমর্থ হইয়া, চাষের ভূমি পতিত রাখিয়া পলায়ন করিল । তিনি তখন মানুষ-শিকারে সৈন্য প্রেরণ করিলেন । তাঁহার প্রেরিত সিপাহীরা এক একটা বন বেঠন করিয়া, উহার ভিতরে যত মানুষ পাইল, সককেই বন্ড পণ্ডর ন্যায় বধ করিল ।

৪ । তিনি দুই বার দিল্লীর লোকদিগকে দিল্লী ছাড়িয়া দিল্লী হইতে ৮০০ মাইল দূরবর্তী দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি নগরে যাইয়া বাস করিতে অধ্যমতি করিলেন । দেবগিরির দৌলতাবাদ, অর্থাৎ ধনাগার এই নাম রাখা হইল । তাঁহার বিশ্বাস, যেন এই নামের মাহাত্ম্যেই ইহা একটা সমৃদ্ধ নগর হইয়া উঠিবে । দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে যাইবার জন্য কোন বাঁধান রাস্তা ছিল না । বিক্ষ্য পর্বতের উপরিস্থিত গভীর বনের মধ্য দিয়া যাইতে

দৌলতাবাদে পঁছচিল, তাহাদিগেরও বাসোপযোগি গৃহ দৌলতাবাদে ছিল না। দিল্লী হইতে যাহারা দৌলতাবাদ যাত্রা করে, তাহাদিগের অধিকাংশই পথে মরিয়া যায়। অবশেষে যে কএক জন জীবিত ছিল, রাজা তাহাদিগকে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন।

৫। মহম্মদ টোগলক হিন্দুদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি সৈনিক ও শাসন-বিভাগে যত কার্য্য ছিল, সমস্তই আফ্গানদিগকে দিয়াছিলেন। আফ্গানেরা হিন্দুদিগের ভাষায় কথা বলিতে পারিত না এবং তাহাদিগের সহিত যার-পর-নাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। যদিও তিনি নিজ রাজ্যের সর্দারদিগকেও সংযত রাখিতে সমর্থ ছিলেন না, তথাপি চীন জয়ের কামনায় ১০০০০০ এক লক্ষ সৈন্ত চীনাভিমুখে পাঠাইয়া দেন। হিমালয়ের পথে এই লক্ষ লোকের প্রায় সমস্তই মরিয়া যায়। যে কএক জন প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া আসিয়াছিল, নিষ্ঠুর রাজা তাহাদিগকেও মারিয়া ফেলিয়াছিলেন।

৬। মহম্মদ টোগলকের এইরূপ কুশাসনে উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার অধীন শাসনকর্তাদিগের অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে এবং আপনাদিগের শাসনাধীন দেশকে আপনাদিগের স্বাধীন রাজ্য করিয়া লয়। বঙ্গে ও গুজরাটে স্বতন্ত্র পাঠান রাজ্য স্থাপিত হয়। আলা উদ্দিন খিলজি, তেলিগানা ও কর্ণাটকার হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন। এই রাজ্যস্বয় আবার স্বাধীন হইয়া উঠে। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে হরিহর নামক এক সর্দার কর্তৃক তুঙ্গভদ্রতটে বিজয়নগরে এক বৃহৎ হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে হাসন নামক এক আফ্গান সর্দার বাহমণি রাজ্য নামে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।

৭। মহম্মদ টোগলকের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ টোগলককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পাঠান রাজাদিগের মধ্যে

তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন । তিনি প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন । তাঁহার দ্বারা দেশের উন্নতি কল্পে বহু কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । তিনি নানা স্থানে রাস্তা বাধাইয়া দেন । বহু খাল খনন ও পথিকদিগের জন্য বহুসংখ্যক সরাই নিৰ্ম্মাণ করান এবং তৎকর্তৃক আরবী ও পারসী শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । তদীয় বংশের অধিকাংশ রাজা অপেক্ষাই তিনি প্রজাদিগের সহিত অনেক গুণে ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন । কিন্তু ফিরোজ ও প্রায়ই হিন্দুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন । যে সকল হিন্দু, মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিত না, তাহারাই তাঁহার কোপে পড়িত । হিন্দু-মন্দির ভগ্ন করিয়া, সেই উপকরণে, মুসলমানের মসজিদ নিৰ্ম্মাণ, তিনিও তাঁহার কর্তব্যের এক অঙ্গ বলিয়া জানিতেন । তিনি স্বয়ংই তাঁহার স্বরচিত জীবন-বৃত্তান্তে ইহা বলিয়া গিয়াছেন ।

৮ । ফিরোজের পর, আর চারি জন রাজা রাজত্ব করেন । তাঁহাদিগের রাজত্ব কাল বড়ই সংক্ষিপ্ত । প্রদেশের পর প্রদেশ স্বাধীন হইতে আরম্ভ করে । কতকগুলি রাজপুত্ররাজ্য ও কএকটি দেশ পাঠান রাজার রাজ্য-রূপে স্বাধীন হইয়া উঠে । দিল্লীর শেষ টোগলক রাজার নাম মাহমুদ । মাত্র দিল্লী ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্তী দেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল । তাঁহারই সময়ে তৈমুর নামক প্রসিদ্ধ নায়কের অধীনতায় তাতার বা মোংগলগণ আর একবার ভীমবেগে ভারতে প্রবিষ্ট হয় ।

(৩২)

তৈমুর (THE LAME বা) পদু ।

১ । টোগলক বংশীয় শেষ রাজার রাজত্ব কালে, সমস্ত তুর্কস্থান অনেক শক্তিশালী 'বেগ' বা সর্দারের অধীন ছিল । সর্দারের নাম তৈমুর ।

দৃষ্টি মর্মভেদিনী, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও তীক্ষ্ণ, পায়ে নলি দীর্ঘ এবং অঙ্গুলি



[তৈমুর The Lame]

পুরু ছিল। তিনি খঞ্জ ছিলেন। এই হেতু, তাঁহার এক নাম ছিল 'তামার লেন' অর্থাৎ "তৈমুর The Lame" বা পঙ্গু তৈমুর। এই নামেই তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজে তুর্ক ছিলেন এবং নগরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সামন্ত প্রায় সমস্তই তাতার জাতীয় ছিল। এই হেতু তৈমুরও তাতার বলিয়াই অভিহিত হইতেন। তিনি স্বভাবতঃই বড় নিষ্ঠুর ও কঠিনহৃদয় লোক

ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি যত লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, মনুষ্য-দেহে জগতে আর কেহই তাহা করে নাই।

২। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুর বহু তাতার, তুর্ক ও পারসিক লোক সংগ্রহ করিয়া, এক অতি বৃহৎ সেনা দল গঠন করিয়া লন এবং ঝটিকা-বেগে বহিয়া, উত্তর পশ্চিমদিগ-বর্তী পার্শ্বত্যা পথ দিয়া, হিন্দুস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই ভয়ঙ্কর সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পাঁচশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার পূর্বে বা পরে, কখন ভারতে এরূপ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটে নাই। তখন পাঠানেরা দেশের রাজা, তাহারা মুসলমান। সুতরাং ইসলাম ধর্ম-প্রচার তৈমুরের উদ্দেশ্য, একথা বলিবার পথ নাই। লুণ্ঠন ও হত্যাই তৈমুরের লক্ষ্য ছিল; এবং সর্বতোভাবে ইহাই তিনি করিয়া যান।

৩। তাতার সৈন্যসহ আফ্গানিস্থানের মধ্যদিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ

করিয়া, তৈমুর ধীরে ধীরে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পশ্চাতে মৃতদেহ ও অগ্নিদগ্ধ গ্রাম ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া আসিলেন না । যখন তিনি দিল্লীর নিকট পহুছিলেন, তখন তাঁহার শিবিরে এক লক্ষ বন্দী ছিল । তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এতগুলি বন্দীকে চোঁকি দিয়া রাখা বড়ই কঠিন কৰ্ম্ম । অতএব তিনি পনের বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক বন্দীমাত্রকেই হত্যা করিয়া ফেলিলেন ।

৪ । যখন এই ভয়ঙ্কর সংবাদ দিল্লীতে পহুঁচিল, ভয়ে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল । পাঠান রাজা প্রথমতঃ নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে ঘর রুদ্ধ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন । কিন্তু কিছু দিন পরে, কি যেন বুদ্ধি করিয়া, সৈন্তসহ, নির্কোণের গায়, বহির্গত হইলেন ।

৫ । তৈমুর ভীমবেগে তাঁহার উপর পতিত হইয়া, তাঁহাকে পরাভূত করিলেন । নির্দয় তাতারগণ, ক্রমাগত পাঁচ দিন কাল, যথেষ্টভাবে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইল এবং যাহাকে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিল ও তাহার বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দিল । ইহার পরে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভার ও বন্দীর দল লইয়া, তাহারা হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া পঞ্জাবে ফিরিয়া গেল এবং পঞ্জাব হইতে কাবুলের পথে তুর্কস্থানে প্রস্থান করিল ।

৬ । দিল্লী মর্দিত ও বিধ্বস্ত হইয়া রহিল । তৈমুর মাত্র পাঁচ মাস কাল ভারতে ছিলেন । তাঁহার ভারত-পরিদর্শন একটা ভয়াবহ স্বপ্নবৎ অতিবাহিত হইয়া গেল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানের লোকেরা নিষ্ঠুর, নোঙ্গরা, চোটাল নাসিকা তাতার এবং তাহাদিগের সেই দীর্ঘজজ্ব, খঞ্জ সর্দার ও তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি, মর্ম্মভেদী চক্ষু ও কনকনে কণ্ঠস্বর দীর্ঘকাল স্মরণ রাখিয়া শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল ।

(৩৩)

তৈমুরের পরবর্তী ভারতের অবস্থা।

১৪০০—১৫০০।

১। সৈয়দ তৈমুর হিন্দুগান ত্যাগ করিয়া যাইবার পর, ৩৬ বৎসর কাল, দিল্লীর রাজা নাম মাত্র ছিল। পঞ্জাবের গবর্নর সৈয়দ খিজর খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তিনি মাত্র দিল্লী নগরে ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্তী কএক মাইল ব্যাপী ভূমির রাজা ছিলেন। তিনি ৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে, তাঁহার পুত্র সৈয়দ মোবারেক রাজা হইয়াছিলেন। বার বৎসর রাজত্ব করিবার পরে, মোবারেক নিহত হন এবং ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র সৈয়দ মহম্মদকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। তাঁহার সময়ে মালোয়ার সুলতানকর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হইয়াছিল। পঞ্জাবের গবর্নর বেহলুম খাঁ লোদী দিল্লী আক্রমণে সুলতানের সহায় হইয়াছিলেন। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে সুলতানের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র আলা উদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি দিল্লী শাসনে সুবিধা বোধ না করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন লোদী গবর্নরের হাতে সপিয়া দেন এবং স্বয়ং আপন রাজ্যে চলিয়া যান। তিনি সেইখানে ২৮ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া শান্তিতে পরলোক গত হন।

২। লোদী রাজা (১৪৫০—১৫২৬) বেহলুম খাঁ লোদী রাজা হইয়া, তাঁহার শাসনাধীন পঞ্জাবপ্রদেশ দিল্লী রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইলেন। সমস্ত সৈয়দ রাজা অপেক্ষা তিনি অত্যধিক প্রতাপশালী শাসনকর্তা ছিলেন। ২৬ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর তিনি জোয়ানপুর রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ বেষ্টন করিয়া পূর্বদিকে বিস্তৃত ছিল। তিনি পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ আপনার শাসনাধীন করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতি-

হাসিকেরা তাঁহার শাসন-কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন। বাহু আড়ম্বর ও



রাজকীয় জাঁকজমকের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিল না। তিনি এই সকল আড়ম্বর নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, শাসন-ক্ষমতা বা শাসন-প্রণালীর গুণে, তিনি যে রাজ্যের রাজা, এই কথা যাবৎ তিনি সকলকে বুঝাইতে সমর্থ, তাবৎ এই সকল আড়ম্বর নিতান্তই নিরর্থক। তিনি ১৪৫০

[বেহলুম লোদী।]

খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৮ সন পর্য্যন্ত, ৩৮ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

৩। সেকেন্দর লোদী, জোয়ানপুরের পরবর্তী দেশ অধিকার করিয়া, পিতা হইতে প্রাপ্ত রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের প্রতি একান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। সেকেন্দর বহু হিন্দুর প্রাণ সংহার করেন, অসংখ্য হিন্দু-দেব মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং তীর্থ যাত্রা ও গঙ্গানানাদি নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু, মুসলমান প্রজাদিগের সহিত তাঁহার সম্বাবহারের ক্রটি ছিল না। তিনি রাজধানী দিল্লী হইতে উঠাইয়া আগ্রায় লইয়া যান। ১৪৮৮ হইতে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৯ বৎসর তাঁহার রাজত্ব।

৪। এই বংশের তৃতীয় এবং শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদী মাত্র ৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ইব্রাহিম লোদী যেমন অহঙ্কারী, তেমনই নিষ্ঠুর। তাঁহার কু-শাসনে সমস্ত রাজ্য উপদ্রুত হইয়াছিল। তাঁহার এক সহোদর

ভ্রাতা জোয়ান পুরের গবর্ণর ছিলেন। তিনি তাঁহাকে হত্যা করেন ; এবং অন্য ভ্রাতাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। প্রথম লোদী রাজদ্বয় যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি অল্পদিনেই তৎসমস্ত হারাইয়া বসিলেন। বড় বড় আফ্গান অভিজাতেরা দিল্লীর সুলতানকে তাঁহাদিগের শাসনকর্তা রাজা বলিয়া জানিতেন না, অধিরাজ্ঞ্যানে সম্মান করিতেন। তাঁহারা তাঁহার আমীর বা সর্দাররূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন ; এবং রাজ-দরবারে সম্মানে অভ্যর্থিত হইতেন। তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত সুলতান রাজ্য-শাসনে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু, ইব্রাহিম লোদী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসিলে, সেই সকল সর্দারদিগকে দরবার গৃহে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন। শুধু দাঁড়ান নয়, তাঁহাদিগকে সামান্য ভৃত্যের গ্ৰাম, বন্ধুস্থলে হাত ঘোড় করিয়া থাকিতে হইত। তিনি প্রথমে কথা না বলিলে, তাঁহাদিগের তাঁহার নিকট কিছু বলিবার অধিকার ছিল না। এইরূপ ব্যবহারে, আফ্গান অভিজাতেরা যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের কএক জন সুলতানের আজ্ঞাপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সুলতান কর্তৃক নিহত হন। ইহাতে সর্দারদিগের অনেকেই বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই বিদ্রোহীদিগের মধ্যে চিতোরের রাজপুত রাজা সংগ্রাম সিংহ ও পঞ্জাবের গবর্ণর দৌলত খাঁ লোদীও ছিলেন। তাঁহারা কাবুলের মোগল রাজা বাবর সমীপে দূত পাঠাইয়া, তাঁহাকে দিল্লী আক্রমণার্থ অনুরোধ করেন। বাবর আহ্লাদসহকারে এই প্রস্তাব পরিগ্রহ করিয়া, ইব্রাহিমকে আক্রমণ করিলেন। ইব্রাহিম যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হইলেন। হিন্দুস্তান মোগল রাজের হাতে গড়াইয়া পড়িল।

৫। এই সময়ে, সমস্ত উত্তর ও মধ্যভারতে মুসলমান সর্দারগণের অধীন কতকগুলি রাজ্য ছিল। এই সর্দারদিগের প্রায় সকলেই আফ্গান, এবং সকলেই পূর্বে ঐ সকল রাজ্যের গবর্ণর বা শাসনকর্তা

নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন । পঞ্জাব, বাঙ্গালা, জোয়ানপুর, গুজরাট মালোয়া এবং মুলতান বা সিন্ধুপ্রদেশ এই সমস্তই নিজ নিজ পাঠান শাসনকর্তার অধীন ছিল । আরাভলি পর্বতমালার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগ্‌বর্তী রাজপুতনা ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে । এই সকল রাজ্যের মধ্যে উদয়পুর বা চিতোরই সর্বপ্রধান রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল ।

৬। দাক্ষিণাত্য দুইটি বৃহৎরাজ্যে বিভক্ত হয় । মধ্যভাগে বাহমণি নামে পরিচিত পাঠান অধিকার । দক্ষিণ দিকে বিজয়নগরের বৃহৎ হিন্দুরাজ্য । সমগ্র দক্ষিণভারতই এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । কোন্‌ সময়ে ও কিরূপে আফ্‌গানেরা দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিরূপে বাহমণি ও বিজয়নগর রাজ্য গঠিত হয় এবং অবশেষে দাক্ষিণাত্য কিরূপে মুসলমান শাসনকর্তাদিগের অধীন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহারই আলোচনা করিব ।

(৩৪)

বাহমণি ও বিজয়নগর রাজ্য ।

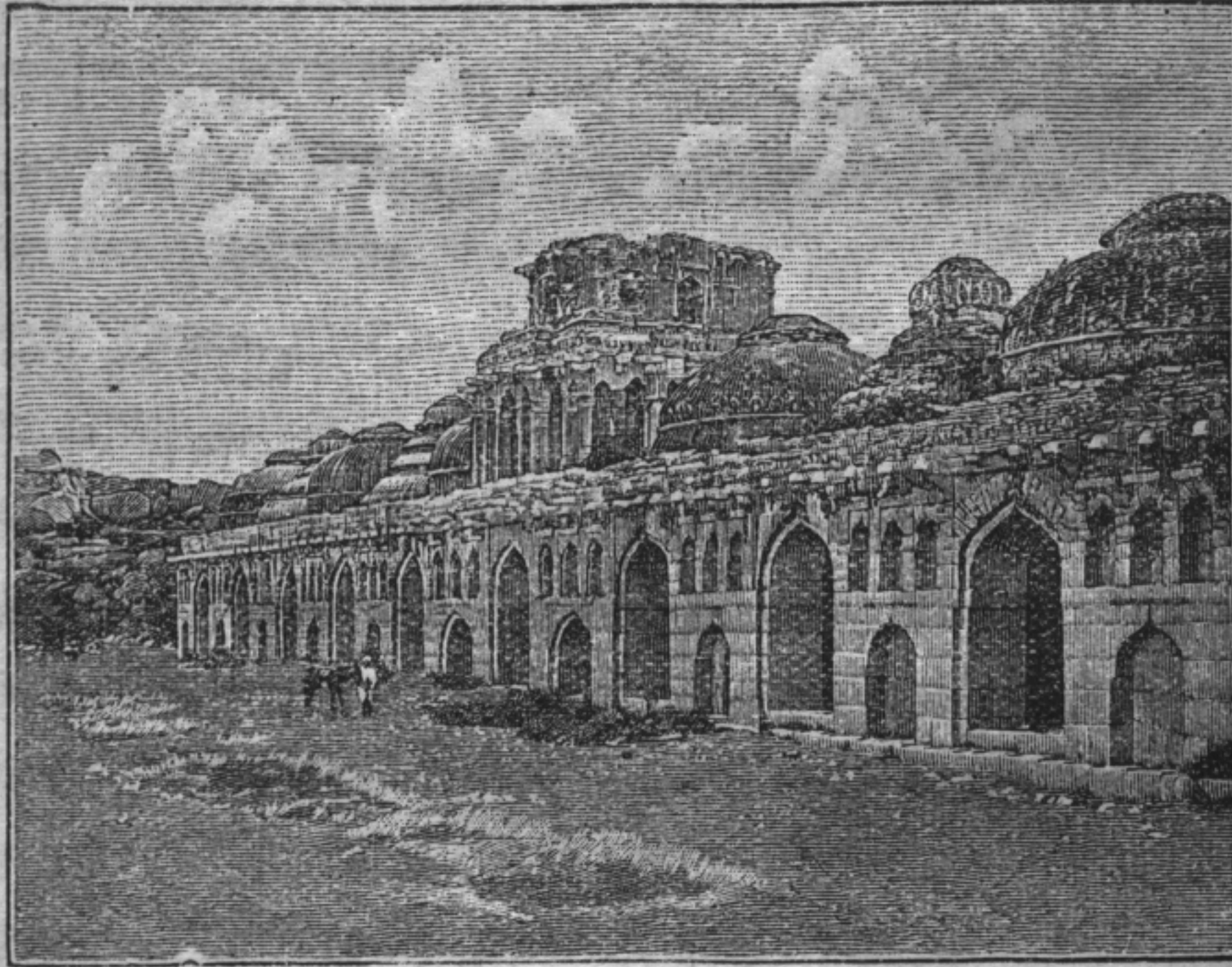
১। মহম্মদ টোগলকের সময়ে, তাঁহার কু-শাসনে দাক্ষিণাত্যস্থিত সমস্ত মুসলমান গবর্ণরই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন । তাঁহাদিগের প্রধান নাসিক বা চালুক হাসনগঙ্গা । হাসনগঙ্গা ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে কুলবর্গে রাজধানী স্থাপন করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন । তাঁহার রাজ্যই বাহমণি রাজ্য নামে পরিচিত হয় ; এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত,—১৬০০ বৎসর কাল, বর্তমান থাকে । বর্তমান হায়দরাবাদের প্রায় সমস্তই এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । বাহমণি রাজারা টোগলক, সৈয়দ ও লোদীদিগের সমকালে রাজত্ব করেন ।

২। হাসন দরিদ্র আফগান। হাসন তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর কাল, দিল্লীনিবাসী গঙ্গা নামক এক ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। একদিন, হাসন মাটির নীচে প্রোথিত কতকগুলি টাকা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই টাকা তিনি আব্বুসাং না করিয়া, তাঁহার প্রভুকে আনিয়া দেন। ব্রাহ্মণ গঙ্গা তাঁহার এই সাধুতার যার-পর-নাই প্রীত হইলেন। দিল্লীর দরবারে ব্রাহ্মণের একটু পরিচয় ছিল। তিনি হাসনের এই সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ দিল্লীবাজ হইতে তাঁহার জন্য শত অশ্বারোহীর নামকতা পদ যোগাড় করিয়া দিলেন। মহম্মদ টোগলক যখন দেব-গিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপনের চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গীয় সেনাদলের মধ্যে হাসন ছিলেন। হাসন সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। অন্যান্য বহু আফগান সর্দারের নাম, হাসনও দাক্ষিণাত্যে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের গবর্ণর বা শাসনকর্তাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পরে, যখন তিনি স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব প্রভু গঙ্গাকে আপনার সর্বপ্রধান 'মন্ত্রী'র পদে নিযুক্ত এবং স্বয়ং "মুলতান হাসন গঙ্গা বাহমণি" এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। বাহমণ বা বামণ ব্রাহ্মণ শব্দেরই অপভ্রংশ। হাসনের পরে বাহমণি রাজ্যে অন্য যে সকল রাজা হইলেন, তাঁহারা সকলেই হাসনের অনুকরণে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিয়োগ এবং হিন্দু প্রজার প্রতি সহ্যবহার করিয়াছিলেন।

৩। বাহমণি-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালে, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-ভাগে এক বৃহৎ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেনাপতি কাফুর ওয়ারেঙ্গল অধিকার করিলে, বুকা রায় ও হরিহর নামক দুই ভ্রাতা ঐ স্থান হইতে পলাইয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যান। এই দুই ভ্রাতা কর্ণাটক তুংভদ্রা নদীর উভয় তীরে বিজয় নগরে এই হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বিজয় নগর রাজ্যে সেই কালে সর্বাধিকার বহু। ১৫ প্রজাবান্ধু ছিলেন।

হইয়া উঠে। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়; এবং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২৩০ বৎসর ইহা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই রাজ্যের রাজারা কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজা ছিলেন। এই ক্ষুদ্র রাজাদিগকে নায়ক বা গবর্ণর বলা হইত। তাঁহারা বিজয় নগরের রাজাকে কর দান করিতেন। মহীশূরের নায়কই এই সকল নায়কদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বড় বড় মন্দির, প্রাসাদ ও দুর্গনিবহের যে ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়; তৎপ্রতি লক্ষ্য



বিজয় নগরের হস্তিশালা।

করিলে, বিজয়নগর একদিন কিরূপ একটা প্রকাণ্ড নগর ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। ইহাই হিন্দুদিগের গৌরব ও বিদ্যাবুদ্ধির শেষ অধিষ্ঠান। বিজয়নগরের রাজারা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রভাবেই হিন্দুধর্ম সমগ্র দক্ষিণভারতে বৌদ্ধ ও জৈন-

ধর্মের স্থান অধিকার করিয়া লয়। প্রথম দুই রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সেই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ মাধব আচার্য্য। বিষ্ণু ও অন্ত্যাত্ম হিন্দু দেবতাদিগের উপাসনা-পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্তনের জন্য মাধব আচার্য্য বহু যত্ন করেন।

৪। প্রথমতঃ বাহমণি ও বিজয়নগরের রাজারা পরস্পর সখ্য-
হুত্রে বদ্ধ ছিলেন, এবং দিল্লীর মুসলমান রাজাদিগের বিরুদ্ধে পরস্পর
পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বহু হিন্দু সৈন্ত,—প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রগণ
বাহমণি রাজার সৈন্ত দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। মুসলমান সেনারাও
আবার বিজয়নগরের সৈন্তদলে থাকিত। কিন্তু যখন উভয় রাজ্যই
প্রবল হইয়া উঠিল, এবং দিল্লীরাজের ভয় প্রশমিত হইয়া আসিল,
তখন আর এতাব রহিল না। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ-আরম্ভ
হইল। বাহমণি ও বিজয়নগরের মধ্যে অনেকগুলি ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটনা
হইয়াছিল।

৫। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বাহমণি রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। চারিটি বড় আফ-
গান সর্দার এই রাজ্যের চারি অংশের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারা
একে একে বাহমণি সুলতানের বশতা অস্বীকার করেন। মাত্র
বিদারের চতুর্দিক্‌বর্তী ভূভাগ সুলতানের অধীন থাকে। তদানীন্তন
বাহমণি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া, অবশেষে স্বয়ংই
সুলতান হইয়াছিলেন।

(৩৫)

দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য।

১৫০০—১৬৫৭।

১। বাহমণি রাজ্যের পতন হইলে, উহা হইতে পাঁচটি পাঠান
রাজ্যের উৎপত্তি হয়। দাক্ষিণাত্যের সেই পাঁচটি পাঠান রাজ্য এই।—
কেন্দ্রস্থলে বিদার, উত্তরদিকে বিহার ও আহামদ নগর
এবং দক্ষিণদিকে বিজাপুর ও গোলকণ্ডা রাজ্য। বিজাপুর,

আহামদনগর এবং বিয়ার প্রাচীন হিন্দুরাজ্য,—দেবগিরি বা মহারাষ্ট্র প্রদেশ লইয়া গঠিত ।

২। বিজাপুর রাজ্য ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশে মহারাষ্ট্র দেশে যুসুফ আদিল শাহ কর্তৃক স্থাপিত হয় । যুসুফ তুরস্ক সুলতান সুলতানের পুত্র । পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার ভাতা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন । মাতা পুত্রের জীবন রক্ষার্থে তাঁহাকে পারস্যদেশে পাঠাইয়া দেন । তিনি ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়া, বাহমণি রাজ-দরবারে আনীত হইয়াছিলেন । বাহমণি রাজার অধীন হইয়া তিনি এক পদ হইতে অল্প পদে উন্নতি লাভ করিতে করিতে, অবশেষে বিজাপুরের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া যান । তদানীন্তন বাহমণি রাজা কিরুপ হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি অচিরেই ইহা বুঝিতে পাইয়া, আপনাকে বিজাপুরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন । এই বংশের আলি আদিল নামক এক রাজা চাঁদবিবি নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । চাঁদবিবি আহামদ নগরের নিজাম শাহের কন্যা । চাঁদবিবি রাণীরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তিনি রাজ-কার্যে স্বামীর সহায়তা করিতেন ; এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব-আরোহণে স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী থাকিতেন । সকল লোকের নিকটই চাঁদবিবি উচ্চ সম্মানে সম্মানিত ছিলেন । মোগলরাজ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র শিবাজী মহারাষ্ট্র দেশের রাজা হইয়া, বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভূমি অধিকার করিয়া লন । ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব স্বয়ং বিজাপুর আক্রমণ ও অধিকার করেন । আদিলশাহ রাজ-বংশ লোপ প্রাপ্ত হয় ।

৩। বে বৎসর বিজাপুর রাজ্য স্থাপিত হয়, সেই ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দেই আহামদ নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । নিজাম শাহ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । নিজাম শাহের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহাকে বালককালে দাস-রূপে গ্রহণ ও মুসলমান করা হয় । নিজাম শাহ আহামদ নগর নির্মাণ করেন ;

এবং ৭ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের পর দৌলতাবাদ অধিকার করিয়া
 লেন। মোগল সম্রাট আকবরের পুত্র মুরাদ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আহামদ নগর
 আক্রমণ করেন। এই সময়ে, আহামদ নগরে কোন রাজা ছিলেন না।
 নগরের লোকেরা রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজারক্ষার জন্য চাঁদবিবিকে
 অনুরোধ করিয়া পাঠান। চাঁদবিবির বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর। তিনি
 আহামদ নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, দুর্গ প্রাচীরের সংস্কার করিয়া সৈন্ত-
 দলের নামকতা গ্রহণ করেন এবং মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত,
 তাহার আত্মীয় বিজাপুরের রাজাকে তাহার সহায় হইতে অনুরোধ
 করিয়া পাঠান। মোগলেরা দুর্গ প্রাচীরের নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া
 প্রাচীর উড়াইয়া দেয়; এবং ঐ স্থান অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে ঐ পথে
 বেগে অগ্রসর হয়। কিন্তু চাঁদবিবি স্বয়ং সাজোয়ার সজ্জিত হইয়া নিষ্কাশিত
 অগ্নি-করে ঐ স্থানে ছুটিয়া যান এবং শত্রুদিগের অগ্রবর্তী দলকে পশ্চাৎ
 হঠাইয়া দেন। আহামদ নগরবাসী, স্ত্রীলোককে ঐরূপ সাহসের সহিত
 যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, যার-পর-নাই লজ্জা অনুভব করে এবং এমন প্রচণ্ড-
 বেগে মোগল সেনার উপর পতিত হয় যে, তাহারা সে বেগ সহ্য করিতে
 না পারিয়া পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য হইয়া পড়ে। চাঁদবিবি
 রাত্রিকালেই মোগলদিগের কৃত সেই সুড়ঙ্গ ভরিয়া ফেলেন। পরদিন
 বিজাপুরের রাজা তাহার সাহায্যার্থ আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ
 আসিয়া পড়ে। মোগল সেনাপতি মুরাদ চাঁদবিবির সহিত সন্ধি স্থাপন
 করেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ঐ রাজ্যের বিহার নামক অংশ আকবর প্রাপ্ত
 হন; কিন্তু আহামদ নগর অস্পৃষ্ট রহিয়া যায়। বড়ই দুঃখের বিষয়,—এই
 সাহসিক বীরপ্রাণা রাণী অবশেষে এক বিদ্রোহের হস্তে নিহত হইয়া-
 ছিলেন। ইহার পরে, স্বয়ং আকবর দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া
 আহামদ নগর দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া
 গেলেই শাসনিক আকবর নামক এক সর্দারের সহায়ত পলায়ন অধিকার

করিয়া লয় । এই রাজ্য সম্রাট সাজিহানের সময়ে, মালিক আশ্বরের পুত্রগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে মোগলহস্তে সমর্পিত হইয়াছিল ।

৪ । গোলকণ্ডা রাজ্য কুতুব শাহ নামক জনৈক পারসিক কর্তৃক ১৫১০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় । তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ হায়দরাবাদ নগর নির্মাণ করেন । ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব গোলকণ্ডা অবরোধ করিয়াছিলেন । গোলকণ্ডা বিশেষ বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু দীর্ঘকাল আক্রমণ সহ করিতে পারে না । অবশেষে এই রাজ্য মোগল কর্তৃক অধিকৃত ও মোগল সাম্রাজ্যের এক অঙ্গ হইয়া যায় ।

৫ । কাশিম বারিদ বিদার রাজ্য স্থাপন করেন । কাশিম বারিদ প্রথমে দাস ছিলেন । তিনি শেষে বাহমণি রাজা মাহমুদের মন্ত্রী হন । তিনি মাহমুদকে কারাগারে বন্দী করিয়াছিলেন । এই বংশীয় সপ্তম রাজার রাজত্বকালে বিজাপুরের সুলতান এই রাজ্য অধিকার করিযা লন । অবশেষে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব বিদার দুর্গ হস্তগত করেন ।

৬ । পঞ্চ রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম রাজ্য বিরার । এই রাজ্য ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ইমাদ্ উল্ মুলক কর্তৃক স্থাপিত হয় । ইমাদ্ উল্ মুলক কানারী ব্রাহ্মণের সন্তান । বিজয় নগরের সহিত বাহমণি রাজার যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধে কানারী ব্রাহ্মণ-বালক বন্দিক্রমে গৃহীত হয় । বন্দী-বালক মুসলমান হইয়া যথাসময়ে উচ্চপদে আরোহণ করে, কালে বিরারের গবর্ণর হয় এবং অবশেষে একবারে বিরারের রাজ-পদে আসীন হইয়াছিল । ইলিচপুরে তাহার রাজধানী ছিল । আহামদ নগরের রাজা ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বিরার রাজ্য জয় করেন । অবশেষে সম্রাট আকবর কর্তৃক, তাঁহার রাজত্ব কালের শেষ সময়ে, উহা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায় ।

৭ । ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের চারি জন মুসলমান রাজা পরস্পর-মিলিত হইয়া হিন্দুরাজ্য বিজয় নগর আক্রমণ করেন । বিজয় নগর

তখন রাম রাজা নামক এক অতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দান্তিক রাজার অধীন ছিল। এই বৎসর, কৃষ্ণা নদীর তটে তেলিকোট নামক স্থানে প্রবল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে পরাজয় করে। লক্ষ লক্ষ লোক নিহত এবং বিজয়নগর রাজধানী সর্বাংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণবর্তী সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া হিন্দু নায়ক বা পলিগারেরা বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীন শাসনকর্তা ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা ই আপনাদিগের শাসনাধীন রাজ্য সমূহের রাজা হইয়া বসিলেন।

(৩৬)

মোগল সম্রাট্।

১। মোগল বা মুঘল আর মঙ্গল একই কথা। মোগলদিগের বাসভূমি মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলিয়া মধ্য এশিয়ার তুর্কস্থান ও চীনের মধ্যে অবস্থিত।

২। তুর্কস্থান প্রাচীন সময়ে আৰ্য্য জাতির বাস-ভূমি ছিল। তুর্কস্থান ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে উচ্চ পর্বতশ্রেণী বিরাজমান। কালক্রমে কতকগুলি মোগল এই পর্বত-মালা অতিক্রম করিয়া, তুর্কস্থানে প্রবেশ করে। তাহারা তুর্কস্থানে যাইয়া অবশিষ্ট যে আৰ্য্যেরা ছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাঁহাদিগের সহিত আৰ্য্যদিগের বিবাহ সংঘটিত হয়। তাহারা আৰ্য্যদিগের ভাষা শিখিয়া লয়; এবং আৰ্য্যদিগের সহিত মিশিয়া একজাতি হইয়া যায়। তাহারা ই তুর্ক জাতি নামে অভিহিত হয়। মক্কাবিসারী বণ্টতাতার হইতে এই তুর্কগণ সম্পূর্ণ পৃথক্। তাহারা তাতারদিগকে জঘন্তজ্ঞানে ঘৃণা করিত। আদি তুর্কদিগের জায় তাহারাও মুসলমান ছিল। কিন্তু তাহারা নাম মাত্র মুসলমান। যাহা হউক, ভারতের লোকেরা তুর্ক ও মোগলে কি পার্থক্য, জানিত না। উত্তর অঞ্চল হইতে যে মুসলমান ভারতে আগমন করিত, তাহাকেই তাহারা মোগল বলিয়া বুঝিয়া লইত। আমরা এক্ষণ

যে মোগল সম্রাটদিগের কথা বলিতে যাইতেছি, এই হেতুই, তাঁহাদিগের নামে মোগল আখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে । তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গোলিয়ার মোগল নহেন । তাঁহারা তুর্কস্থানের তুর্কি এবং মোগল সম্রাটের পরিবর্তে, তাঁহাদিগের তুর্কসম্রাট নামে অভিহিত হওয়াই অধিকতর সঙ্গত ছিল ।

৩ । ভারতের সমস্ত মুসলমান রাজগণের মধ্যে এই মোগলেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন । এই বংশের পনের জন রাজা রাজত্ব করেন । তন্মধ্যে প্রথম ছয় জনই পরবর্তী অবশিষ্ট সমস্ত অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ । অন্তেরা নিতান্তই হীনশক্তি ছিলেন । প্রসিদ্ধ ছয় জনের নাম বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ও আওরঙ্গজেব ।

(৩৭)

বাবর ।

১৫২৬—১৫৩০ ।

১ । তৈমুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার রাজ্য অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে । কোকান্দ নামক তুর্ক স্থানের একটা ক্ষুদ্র প্রদেশ দীর্ঘকাল পরে বাবরের পিতার হস্তগত হয় । বাবরের পিতা তৈমুরের প্রপৌত্র অর্থাৎ পৌত্রের পুত্র ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর, বাবর পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন । বাবর তখন ত্রয়োদশ বৎসরের বালক ।

২ । সিংহাসনে অধিকৃত হওয়ার পর হইতেই, বাবরকে তাঁহার খুল্লতাতে সহিত জীবনব্যাপি যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইতে হয় । তিনি রাজ্য-হারা হন । কিন্তু তুর্কস্থানের কতিপয় পর্য্যটক সর্দার ও সেই সর্দারদিগের অধীন বা দলভুক্ত লোকেরা বালক বাবরকেই তাঁহাদিগের রাজা

কুড়ি বৎসর কাল, বাবর এক স্থান হইতে আর এক স্থানে, অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়ান । এই পর্যটন-সময়ে প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে । কখন যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, কখন বা প্রাণভয়ে লুকাইয়া গিয়াছেন । তিনি তাঁহার তুর্কসঙ্গিগণসহ, প্রতিনিয়তই বাহিরে, খালি মাটিতে, খোলা বাতাসে পড়িয়া ঘুমাইয়াছেন । অনেক সময়, ঘোড়ার পিঠে গদির উপরই তাঁহাদিগের সমস্ত দিন কাটিয়া গিয়াছে ।

৩। বাবর দেখিতে পাইলেন যে তুর্কস্থানে অনেক সর্দারই তাঁহার ঞ্চায় সাহসী বীর । সুতরাং সেখানে বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনই সম্ভাবনা নাই ।

তিনি বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলেন ; নগরের



পর নগর তাঁহার হস্তগত হইল ; আবার সেই সকল নগর তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গেল । তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই থাকিলেন । কোন অংশেই পূর্ণা-পেক্ষা লাভবান হইতে পারিলেন না । অতএব, তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া বাহতে মনস্থ করিলেন । তাঁহার দলের লোকদিগেরও, তাঁহার ঞ্চায়, কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না । সুতরাং তাহারা আহ্লাদ সহকারে তাঁহার অনুসরণ

[বাবর ।

করিতে সম্মত হইল । তিনি সঙ্গিগণসহ পর্বতের মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া, আফ্গানিস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

৪। আফগানেরা সমরপ্রিয় ও সাহসী ; কিন্তু উত্তর দেশ হইতে আগত তুর্কি যোদ্ধারা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ও সাহসী ছিল । বাবর অল্পকালের মধ্যেই, কাবুল ও গজনীর কর্তা হইয়া বসিলেন । এইস্থানে তিনি কএক বৎসর রাজত্ব করিলেন । পাঠানদিগের বল-পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি চারিবার পঞ্জাবে গমন করেন এবং প্রত্যেক বারেই রাজ্যের কিয়দংশ হস্তগত করিয়া এক এক জন সর্দারের শাসনাধীন রাখিয়া আইসেন । ক্রমে তিনি আপনাকে সমস্ত ভারত জয়ের পক্ষে সমর্থ মনে করিলেন । এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বস্ত সর্দারদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হইল । তাঁহারা এক বাক্যে তাঁহাকে এই কার্যে উৎসাহ প্রদান করিলে ।

৫। এই সময়ে, বাবরের বয়স চল্লিশ বৎসর । তাঁহার সৈন্যসংখ্যা মাত্র তের হাজার ; কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক সৈন্যই শত বার শত যুদ্ধে বর্তমান থাকিয়া, দৃঢ় ও পরিপক্ব হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই তাহাদিগের দলপতির অনুসরণে প্রকুলমুখে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছে । বাবর সাহস সহকারে এই সেনাদল সহ পঞ্জাবের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া সোজা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন ।

৬। পাঠান রাজা ইব্রাহিম্ লোদী লক্ষ সেনা লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন । কিন্তু তাঁহার আফগান সেনাগণ হিন্দুস্থানের ঠিক দেশে দীর্ঘ বাস নিবন্ধন পূর্ব পুরুষদিগের সেই শোণ্য বীৰ্য্য হারাইয়াছিল । আর্য্যেরা যখন উত্তরের শীতপ্রধান উচ্চ ভূমি হইতে অবতরণ করিয়া, গ্রীষ্মপ্রধান দক্ষিণ দেশের অধিবাসীদিগকে ঝটিকা বেগে উড়াইয়া লইয়া যান, সেই সময় হইতে, দক্ষিণদেশীয় ও উত্তরদেশীয়দিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধ ঘটনাই ফল একরূপ হইয়া আসিয়াছে । পাঠান সেনারা কোন অংশেই অনলসদৃশ তুর্কদিগের প্রতিযোগিক্রমে দাঁড়াইবার যোগ্য ছিল না । তুর্কিরা নবাগত অথচ উগ্রপ্রকৃতিক এক দুর্দান্ত জাতির

অন্তর্ভুক্ত। বাবর সেই দুর্দান্ত বর্ষাবৃত অশ্বারোহিণ সহ নির্ভয়ে আফ-
গানদিগের সেনা সমুদ্রের উপর
পতিত হইলেন। তিনি আফ-
গান-বাহের সম্মুখ দিয়া কিছু
দূর অগ্রসর হইয়া, চকিতের ত্রাস
সহসা ঘুরিয়া, ভীমবেগে পশ্চাৎ-
ভাগ আক্রমণ করিলেন। ইব্রা-
হিমের সেনা এ বেগ সহ
করিতে পারিল না;—ছত্রভঙ্গ
হইয়া পলায়ন করিল। স্বয়ং
ইব্রাহিম নিহত হইলেন। তাঁহার



[ইব্রাহিম লোদী]

মৃতদেহ ও কুড়ি হাজার অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে মৃত-অবস্থায় নিপতিত
রহিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথের মাঠে এই ভয়ঙ্কর
যুদ্ধ হয়।

৭। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, বাবর কেবল দিল্লী-রাজ্যের অধিকারী
হইলেন। হিন্দু স্থানে পাঁচটি বৃহৎ মুসলমান রাজ্য ছিল। ইহা ছাড়া রাজ-
পুতনায় বহু রাজপুত সর্দার ছিলেন। বাবর প্রথমতঃ সৈয়দ ও লোদী
রাজগণ যে সকল রাজ্য হারাইয়াছিলেন, তৎসমস্ত ফিরিয়া পাইবার জন্ত
যত্নবান হইলেন। তিনি স্বয়ং দিল্লীতে অবস্থিত রহিলেন। পুত্র হুমায়ুনকে
সুদূর সেনাদল সহ পূর্ব দিকে এবং তাঁহার অতি বড় বিশ্বস্ত সর্দারদিগকে
ঐরূপ সেনা সহ অত্যাগ দিকে পাঠাইয়া দিলেন। হুমায়ুন সত্বরেই
জোয়ানপুর অধিকার করিলেন; এবং লোদীদিগের অধিকারে যে
সকল রাজ্য ছিল, ছয় মাসের মধ্যেই, তৎসমস্ত পুনরায় দিল্লীরাজ্যের
অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। লোদী রাজারা দিল্লী ও আগ্রায় যে প্রভূত
অর্থ রাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই অর্থ রাশি বাবরের হস্তগত হইল।

তিনি এই অর্থের অতি সামান্য অংশ নিজের জন্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত বিতরণ করিয়া দিলেন । সৈন্যদিগকে মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করা হইল । সেনাদলে তিনি বৃহৎ বৃহৎ দানের অনুষ্ঠান করিলেন । আফ্গানিস্থানের প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী, ও শিশুকে উপহার পাঠাইয়া দেওয়া হইল । তুর্ক-স্থানে ও পারস্ত দেশে তাঁহার যে সকল বন্ধু-বান্ধব ছিল, এই দান-কার্য্যে, তিনি তাঁহাদিগকেও বিস্মৃত হইলেন না ।

৮। ভারতের রাজপুতরাজগণ স্বাধীন রহিলেন । অতঃপর, বাবরকে রাজপুতদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল । চিতোর বা উদয়পুরের রাজা সঙ্গ বা সংগ্রামই, এই সময়ে, সর্কাপেক্ষা প্রতাপবিত রাজপুতরাজা ছিলেন । সঙ্গ মালোয়ার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন । রাজপুতনার অল্প সমস্ত রাজপুত রাজারাই তাঁহাকে আপনাদিগের অধিনায়ক-রূপে সম্মান করিতেছিলেন ।

৯। রাজা সঙ্গের সহিত মহম্মদ লোদী যোগদান করিলেন । মহম্মদ লোদী ইব্রাহিম লোদীর সহোদর । তিনি এক্ষণ আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন; আফ্গান অভিজাতদিগের সর্দার হাসন খাঁ এবং যে সকল সর্দার পুনঃ আফ্গান বা লোদীরাজ্য-প্রতিষ্ঠায় উৎসুক, তাঁহাদিগের অনেকে আসিয়া সঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন । আগ্রা হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী সিক্রি নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল । বাবর বড় মদ্যপ্রিয় ছিলেন । এই যুদ্ধের পূর্বে তিনি শপথ করিলেন যে, যদি ঈশ্বর তাঁহাকে এই যুদ্ধে জয়ী করেন, তাহা হইলে, তিনি আর কখনও মদ্য পান করিবেন না । মদ্যপানের জন্ত শিবিরে যত স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পেয়ালা ছিল, সমস্ত ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করা হইল । যত মদ্য ছিল, সমস্ত মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া হইল । রাজার ব্যবহারের জন্ত এইক্ষণ যে সকল মদ্য গজনী হইতে আসিয়া সেই সকল মদ্যের ভাণ্ডে ভরণ দ্রবীভূত হইয়া পানের অযোগ্য করিয়া

রাখা হইল। বাবর কতিপয় সেনাকে একটু হীনসাহস হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যদিগকে একত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া উদ্দীপক ভাষায় বলিলেন—“পৃথিবীতে যে জয়ধারণ করিয়াছে, তাহাকেই একদিন মরিতে হইবে। জগতে চিরজীবী একমাত্র সেই জগদীশ্বর। শীঘ্র হটক, অথবা বিলম্বে হটক, আমরাদিগকে একদিন অবশ্যই মরিতে হইবে। এখনই যদি আমরাদিগের সেই নিয়তি নিকটবর্তী হইয়া থাকে, তবে এস আমরা আমাদের নাম, প্রতিপত্তি ও ধর্মের জন্ত প্রকৃত বীরের মায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি। অপমান ও লজ্জার ভার মস্তকে লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, যশের সহিত মৃত্যু সহ্য গুণে শ্লাঘা। তোমরা আমার সঙ্গে, পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, তোমরা কেহই শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। যদি আমরা সাহস সহকারে যুদ্ধ করি, জগদীশ্বর আমাদের সহায়, আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব।” তাহার সর্দারেরা, এই বক্তৃতার পরে, সকলেই কোরাণ স্পর্শ করিয়া, যুদ্ধে জয়লাভ অথবা প্রাণত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। সঙ্গ রাজা পরাভূত, পলায়িত এবং অল্পকাল পরেই কালকবলে পতিত হইলেন। হাসন খাঁ নিহত হইলেন। বাবর জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাবর অতঃপর সিক্রির নাম রাখিলেন “ফতেপুর” অর্থাৎ বিজয়নগর। দিল্লী জয় করিয়া, হিন্দুস্থানের প্রভুপদে আসীন হইবার জন্ত, রাজপুতদিগের ইহাই শেষ উদ্যম; ইহার পরে আর কখন তাহারা একরূপ চেষ্টা করেন নাই। তাহাদিগের স্বীয় রাজ্য রাজপুতনায় অবস্থিত থাকিয়া, কেবল রাজপুতনার রক্ষাবিধানেই যত্ন করিয়াছেন।

১০। পর বৎসর, বাবর চাঁদেরির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। চাঁদেরি, মালোয়ার প্রান্তবর্তী রাজপুতদিগের একটি অতি দৃঢ়গঠিত দুর্গ। দুর্গ-রক্ষার জন্ত রাজপুতেরা যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কিন্তু অবশেষে বাবর কর্তৃক দুর্গ অধিকৃত হয়। বশুতা স্বীকার কিংবা শত্রুর নিকট দয়া ভিক্ষা রাজপুতদিগের চিরন্তন রীতিবিরুদ্ধ। তাঁহারা তাঁহাদিগের পত্নী ও পুত্রকন্যা দিগকে হত্যা করিয়া, উলঙ্গ-রূপাণ-করে উন্নতের গায় বহির্গত হইলেন এবং শত্রুর সহিত অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

১১। প্রথমে বাবরের নাম ছিল জাহির উদ্দিন ; কিন্তু তুর্ক স্থানের সর্দারগণ তাঁহাকে বাবর নামে সম্বোধন করিতেন। শেষে তিনি এই নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। বাবর শব্দের অর্থ সিংহ। তিনি প্রকৃতই সিংহের গায় সাহসী ও বলবান্ ছিলেন। তিনি দুইটি দীর্ঘকায় পুরুষকে দুই কক্ষে লইয়া, উচ্চ প্রাচীরের উপর দিয়া, দৌড়াইয়া যাইতে পারিতেন ; যে কোন নদী তাঁহার সম্মুখে পড়িত তিনি সাঁতারিয়া পার হইয়া যাই-তেন এবং অশ্বারোহণে প্রতিদিন একশত মাইল গমনে সমর্থ ছিলেন।

১২। যদিও সমর-অঙ্গনই তাঁহার প্রাণপ্রিয় ক্রীড়াভূমি ছিল, তিনি প্রকৃতিতে নিষ্ঠুর ছিলেন না। যুদ্ধে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক লোকদিগকে তিনি কখনও হত্যা করেন নাই। মনুষ্য হত্যা, দেবমন্দির ধ্বংস এবং দেশ লুণ্ঠনের জন্ত তিনি ভারতে আসেন নাই ; সদাশয় ও জ্ঞানী রাজার গায় দেশশাসন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রতিনিয়তই আত্মবাক্যের সম্মান রক্ষা করিতেন, এবং কখন কোনরূপ নীচ কার্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। তিনি সর্বদাই আনন্দময় ও চিত্তে প্রফুল্ল থাকিতে ভাল বাসিতেন। বাবর স্বহস্তে নিজের যে জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে এক স্থানে বলিয়াছেন,—“আমি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কখন আশাত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়ি নাই, অথবা অলস বা উদাসপ্রাণে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই।” আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন “যে কার্যের সাহায্য পাবে অনায়ে কলঙ্ক স্পর্শ হয় যাহার ক্রিয়াকর্ম তাহা

১৩। বাবর দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করেন নাই। দিল্লীতে



হুমায়ূনের পীড়া।

মাত্র চারি বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পরেই, তিনি নিতান্ত দুর্বল ও
রুগ্ন হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র হুমায়ুনও রোগ শয্যা
শায়িত হন। কিছুদিন মধ্যেই হুমায়ুনের শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি
রহিত হইয়া যায়, মৃত্যু নিশ্চয় বলিয়াই আশঙ্কা জন্মে। এই সময়ে
একটি ধার্মিক কৰ্মচারী বাবরকে বলেন,—“আপনি যদি আপনার নিকট
সৰ্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ যাহা আছে জগদীশ্বরের নামে তাহা উৎসর্গ
করিয়া, তাঁহার সমীপে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আপনার
পুত্রের জীবন-রক্ষা হইতে পারে। আপনি আশ্রিতে যে সুবহুৎ হীরক-
খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করুন।” বাবর
বলিলেন,—“না আমার আত্মজীবন ঐ বহুৎ হীরা অপেক্ষা আমার নিকট
অধিকতর মূল্যবান্ পদার্থ, আমি ঈশ্বরের পাদপদ্মে উহাই উৎসর্গ
করিব।” এই বলিয়া তিনি পুত্রের রোগশয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া
এই প্রার্থনা করিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়া, তৎ-
পরিবার্তে তাঁহার জীবন গ্রহণ করুন। ইহার পরে, তিনি বলিয়া উঠি-
লেন,—“আমি ইহার গতি ফিরাইয়া দিয়াছি।” বোধ হয় যেন, জগদীশ্বর
তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিলেন। কারণ, এই দিন হইতেই পুত্র হুমায়ুন
ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠিলেন।
আর পিতা বাবর ক্রমে দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া, অবশেষে মৃত্যুমুখে
নিপতিত হইলেন।

(৩৮)

হুমায়ুন।

১৫৩০—১৫৫৬।

১। মৃত্যুর অল্প সময় পূর্বে বাবর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে
কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, “বাবা, ঈশ্বর যদি আমার সিংহাসন

তোমাকে দান করেন, তাহা হইলে, আমি তোমাকে এই ভার দিতেছি, তুমি তোমার সহোদরদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিও ।” হুমায়ুন পিতার এই আদেশ মক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ এই আজ্ঞা-পালন তাঁহার নিকট তেমন দুৰূহ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ; কারণ, তিনি তাঁহার সহোদরদিগকে ভাল বাসিতেন এবং কখনও তাহাদিগের কোন অনিষ্ট কামনা করেন নাই । তাঁহার পিতা তাঁহাকে যেমন ভাল বাসিতেন, তেমনই বিশ্বাস করিতেন । তিনি প্রতিনিয়তই বলিতেন,—“হুমায়ুনের মত আমার বন্ধু এ জগতে আর কেহই নাই ।”

২। হুমায়ুন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর । কামরান, হিন্দাল ও আদুরি তাঁহার এই তিন সহোদর ছিলেন । হুমায়ুন প্রত্যেক ভ্রাতাকে রাজ্যের এক এক অংশ দান করিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন । তিনি কামরানকে আফগানিস্থান ও পঞ্জাব দান করিয়াছিলেন ।

৩। বাবর তাঁহার শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবার সময় প্রাপ্ত হন নাই । সমগ্র দেশব্যাপী আফগান সর্দারেরা যেই তনিতে পাইলেন যে, বাবরের মৃত্যু হইয়াছে, অমনি তাঁহারা অঙ্গধারণ করিয়া তাঁহার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন । হুমায়ুনকে গুজরাটের পাঠান সুলতান বাহাদুর শাহের সহিতই সঙ্গাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল । তিনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাশ্মীর নিকট সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন । বাহাদুর শাহ এই স্থানে তারি আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে সমুদ্র বাহিয়া ডিউ নামক বন্দরে যাইয়া উপস্থিত হন । ডিউতে পর্তুগীজদিগের বসতি ছিল । তিনি পর্তুগীজদিগের আশ্রিত হইয়া রহিলেন ; কিন্তু অল্পকাল পরেই পর্তুগীজগণ কর্তৃক নিহত হইলেন ।

৪। ইহার পরে হুমায়ুন গুজরাটস্থিত চম্পানিয়রের গিরি-ভূগর্ভ আক্রমণ

করেন। চারি মাস ব্যাপী অবরোধের পর দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি রাত্রিকালে প্রান্তর হইতে প্রাচীরের ত্রায় যে পর্বত উত্থিত হইয়াছিল, সেই পর্বতের গায়ে বড় বড় প্রেক পুতিয়া সেই প্রেকের উপর ভর করিয়া পর্বতে আরোহণ করেন এবং এই উপায়ে দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লন। দুর্গ জয়ের পর, হুমায়ুন বিদ্রোহী আফ্গান সর্দারদিগের বিরুদ্ধে রণ-যাত্রা না করিয়া, নিতান্ত অদূরদর্শীর ত্রায়, দীর্ঘ সময় ঐ স্থানে অবস্থান এবং বৃথা



[হুমায়ুন।]

আমোদ-উৎসবে সময় নাশ ও অনর্থক অর্থ-ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

৫। ইহার পরে, তাঁহার ভ্রাতা কুমার আফরির হাতে গুজরাতের ভার অর্পণ করিয়া, তিনি মালোয়ার গমন করিয়াছিলেন। মালোয়ার যাইয়া মালোয়ার আফ্গান সর্দারকে ভাগাইয়া দিয়া সেখানেও আবার ঐরূপ আমোদ-উৎসবে সময় কাটাইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে, দিল্লী হইতে সংবাদ আইসে যে, পূর্বদিগ্‌বর্তী সমস্ত দেশ বিদ্রোহী হইয়াছে। জোয়ানপুর, বিহার ও বাঙ্গালায় আফ্গান অভিজাতেরা আপনাদিগকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং আগ্রার অতি নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান সর্দারেরাও যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে।

৬। সের খাঁ নামক বড় আফ্গান ভূস্বামী বিদ্রোহীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন যখন দক্ষিণে গুজরাট ও

মালোয়ার যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন পূর্বদিকে সের খাঁ আপনাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া লইতেছিলেন। তিনি একটি একটি করিয়া বিহারের সুদূর দুর্গগুলি অধিকার করেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেলে, সের খাঁ একবারে বাঙ্গালা ও বিহার, এই উভয় প্রদেশের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন।

৭। এ পর্য্যন্ত হুমায়ুন তাঁহার কোন সংবাদ লন নাই। হুমায়ুন গুজরাট হইতে আগ্রা ফিরিয়া আসিলেন। আগ্রা আসিয়া তিনি ষৎসরের কাল কিছুই করিলেন না, ভোগ-বিলাসে সময় কাটাইয়া দিলেন। ইহার পরে, তাঁহার ফিরিয়া যুদ্ধে মন দিবার অবকাশ ঘটিল। এদিকে হুমায়ুন গুজরাট হইতে চলিয়া আসিতে না আসিতেই, সেই অঞ্চলের আফগানেরা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কুমার আশ্বরি তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে সম্যক সমর্থ ছিলেন না। তাহারা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। গুজরাট ও মালোয়া যেমন হস্তগত হইয়াছিল, তেমনই আবার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। হুমায়ুন এখন দেখিলেন, যে সকল দেশ তিনি হারাইয়াছেন, সেগুলির পুনরুদ্ধারার্থ দৃঢ় যত্ন করা আবশ্যক। কিন্তু কাল-স্রোতে এখন বাবরের সেই প্রসিদ্ধ সৈন্যদিগের অনেকেই মৃত বা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছে; হুমায়ুন আফগানিস্তান ও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ভ্রাতা কামরাণের নিকট সৈন্যের জন্য লিখিলেন, কিন্তু কামরাণ সৈন্ত পাঠাইতে অসম্মত হইলেন। সুতরাং, হুমায়ুনের সেনাদল এক্ষণে নব্য যুবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য যে, এই সকল যুবক রণ-কার্য্যে একবারেই সুশিক্ষিত ছিল না।

৮। হুমায়ুন এই শ্রেণীর সৈন্ত ও ভ্রাতা হিন্দাল ও আশ্বরিকে সঙ্গে লইয়া পূর্বদিকে রণযাত্রা করিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ বেনারসের নিকটবর্ত্তী চুনার দুর্গ আক্রমণ পূর্বক অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ছয় মাসের অবরোধের পরে, কেবল এই দুর্গ মাত্র অধিকৃত হইয়াছিল।

সের খাঁ তখন বাঙ্গালায় ছিলেন। এই ছয় মাস কাল হাতে পাইয়া, সের খাঁ বাঙ্গালার সুদূর গিরিছর্গ রোটায়ে যাইয়া সৈন্য সামন্ত ও ধন-সম্পত্তি সহ অবস্থিত হইলেন। তিনি জানিতেন, এই স্থানে তিনি সর্বাংশে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। সের খাঁ বাঙ্গালার পথ খোলা রাখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে, হুমায়ুন তাঁহার দলবল সহ দিল্লী রাজ্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িলে, তিনি সহজেই তাঁহাকে দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বিপাকে ফেলিতে পারিবেন। হুমায়ুন অনায়াসে বাঙ্গালার প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কেহই তাঁহার প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি একবারে বাঙ্গালার তদানীন্তর রাজধানী গোড় নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গোড়ে যাইয়া, তিনি তাঁহার ভ্রাতা হিন্দালকে একদল সেনাসহ নূতন সেনা সংগ্রহের জন্য আগ্রা পাঠাইয়া দিলেন।

৯। গোড় নগরে, হুমায়ুন, নিতান্ত অপরিণামদর্শীর ন্যায়, তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস অনুসারে, এক বৎসর কাল বৃথা আমোদে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে সের খাঁ যে সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রস্তুত আছেন, একথা ভুলিয়া গিয়া, হুমায়ুনের ন্যায়, তাঁহার সেনানায়কেরাও বৃথা উৎসবে সময় কাটাইয়া দিলেন। সের খাঁ গুপ্ত চরের মুখে এই অবস্থা অবগত হইয়া, তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া রোটায়ে ছর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে যে সকল পথ ও গিরিবন্ধ ছিল, সমস্ত অবরোধ করিয়া, হুমায়ুনকে তাঁহার দিল্লীরাজ্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ও দিকে হিন্দাল ভ্রাতার নিকট সাহায্য পাঠাইবার পরিবর্তে, দিল্লী আক্রমণ করিয়া, আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১০। এতটা হইয়া যাওয়ার পরে, হুমায়ুন তাঁহার যে কিছু সৈন্য-সামন্ত ছিল, তাহা লইয়া বাঙ্গালা হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তখন

বর্ষা ঋতুর মধ্য সময়। জলে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। জল-কাদা পূর্ণ দুর্গম পথে অভিযান যার-পর নাই কষ্টসাধ্য ও ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হুমায়ুনের বহু লোক-জন অরাক্রান্ত হইল, ঘোড়াগুলি পালে পালে মরিয়া যাইতে লাগিল, এবং সন্ধ্যা দ্রব্য সামগ্রীর অধিকাংশ নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে সৈন্ত চালনা করিয়া, একটা গিরিবন্ধের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথের একদিকে রাজমহলের পাহাড়শ্রেণীর এক প্রান্ত, অন্য দিকে গঙ্গা নদী। ইহাই বাঙ্গালা হইতে বিহারে প্রবেশের পথ। সের খাঁ এই পথের স্থানে স্থানে গভীর পরিখা খনন করিয়া ও পথের এপাশে ওপাশে প্রাচীর গাঁথিয়া, একদল বলশালী আফগান সেনাসহ উহা অরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১১। হুমায়ুন দেখিলেন যে, আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এই অবস্থায় থাকিলে, তিনি একবারেই জন-বল-শূন্য হইয়া পড়িবেন। অতএব, তিনি সের খাঁর নিকট দূত পাঠাইয়া, সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সের খাঁ বলিলেন যে, যদি বাঙ্গালা ও বিহার রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাকে ঐ দুই প্রদেশের রাজা করা হয়, তাহা হইলে, তিনি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহকে অধিরাজরূপে কর মাত্র দিবেন, এতদ্ব্যতীত ঐ দুই প্রদেশের উপর দিল্লীর আর কোনই কর্তৃত্ব থাকিবে না। হুমায়ুন এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। সন্ধি হইয়া গেল। হুমায়ুনের লোকজনেরা তাহাদের গায়ের সাজোয়া খুলিয়া ফেলিল, এবং দ্রব্য-সামগ্রী সমস্ত একত্র করিয়া মোট বাকিয়া, গঙ্গার উপর পুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গা পার হইতে পারিলে, পর দিনই তাহারা স্বর্গহে উপস্থিত হইতে পারিবে। রাত্রি উপস্থিত হইলে, হুমায়ুন ও তাঁহার ক্রান্ত সৈন্তদল সত্বরেই স্বর্গহে গমন করিতে পারিবেন ভাবিয়া, মনের আনন্দে গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন। রাত্রি দুটার সময় অন্ধকার থাকিতে থাকিতে আফগানেরা হুমায়ুনের নিদ্রিত শিবির আক্রমণ করিল;

এবং যে তাহাদিগের সম্মুখে পড়িল, তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিল ।
হুমায়ুন নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতগতি অশ্বরোহণ করিয়া,



দিল্লার বাদশাহ ।

যুদ্ধ করিতে করিতে, নদীতটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহার কএকটি বিশ্বস্ত অনুচরও এই নৈশ-ইত্যাহইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া আগ্রা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সের খাঁ প্রথমতঃ বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করিয়া লইলেন। বাঙ্গালার যে মোগল-সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন ; এবং এইরূপে এদিককার সমস্ত নিক্রপদ্রব ও নিষ্ফলক করিয়া রাখিয়া, হুমায়ূনের পশ্চাতে আগ্রা অভিমুখে রণ-যাত্রা করিলেন।

১২। সের খাঁ তাঁহার সেনাদল সহ উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হইল। প্রথম আক্রমণেই হুমায়ূনের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হুমায়ুন লাহোরে পলায়ন করিলেন। তিনি দশ বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়া এইরূপে বিপন্ন হন। তাঁহার আশা ছিল, ভ্রাতা কামরাণ তাঁহার সহায় হইবেন। কিন্তু কামরাণ হুমায়ুনকে সাহায্য দানের পরিবর্তে পঞ্জাব প্রদেশ সের খাঁকে সমর্পণ করিয়া, স্বাধীনরাজ্যরূপে রাজত্ব করিবার অভিলাষে, কাবুলে চলিয়া গেলেন। হিন্দালও হুমায়ুনকে ত্যাগ করিলেন। হুমায়ুন, দুই বৎসর কাল, সিন্ধুর মরুভূমিতে মহাবিপদ ভোগ ও অশেষ কষ্টে পরিশ্রমণ করিয়া, অবশেষে পারস্ত অভিমুখে প্রস্থানপর হইলেন।

১৩। সিন্ধুদেশ দিয়া চলিয়া যাইবার সময়, পথে হুমায়ুন হামিদা বেগম নাম্নী একটি পারসিক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। মরুভূমির মধ্যে সিন্ধুদেশস্থিত অমরকোটের বিজন দুর্গে ১৫৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয়। তুর্কিরাজ্যকূলে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে, কোন রাজকুমারের জন্ম হইলে, তাঁহার পিতা রাজা, মনের আনন্দ-প্রকাশার্থ, তাঁহার সর্দারদিগকে মূল্যবান স্বর্ণভরণ ও মণিমুক্তাদি দান করিতেন। কিন্তু বিপন্ন হুমায়ূনের না ছিল তখন কোন মণিমুক্তা, না ছিল কোনরূপ স্বর্ণসম্পদ। এ সকল দূরে থাকুক, তখন তাঁহার দৈনন্দিন আহার্যেরও কোন সংস্থান ছিল না। তিনি এ আনন্দে কি

দান করিবেন? কিন্তু তাঁহার পকেটে ক্ষুদ্র একখণ্ড যুগনাভি বা কস্তুরী ছিল। কস্তুরীর সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়। তিনি ঐ কস্তুরীটুকু বাহির করিয়া, তখনও যে কএকটি বিশ্বস্ত লোক তাঁহার সঙ্গে ছিল, উহার একটু একটু তাহাদিগকে দান করিলেন, এবং বলিলেন—“ইহার স্মৃতি সৌরভে বায়ু যেরূপ সুরভি হইয়া উঠিতেছে, আমি আশা করি, আমার এই পুত্র যখন রাজা হইবে, ইহার যশঃ-সৌরভেও সেইরূপ জগৎ ব্যাপ্ত হইবে। আমি ইহার নাম রাখিলাম আকবর, অর্থাৎ মহান্। কারণ, এ পুত্র কালে অতি বড় রাজা হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।” হুমায়ুন যখন পারস্য দেশে পঁহুঁচিলেন, পারস্যরাজ শাহ টহমাস্প তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পারস্য দেশীয়দিগের ন্যায় মুসলমান ধর্মের সিয়ামত গ্রহণ করিতে হইল। পারস্যরাজ কিছুদিন তাঁহাকে আপন দরবারে স্থান দিয়া রাখিলেন। ইহার পরে, তাঁহাকে ১২০০০ পারসিক সেনা দান করা হইল। হুমায়ুন এই সেনাদল লইয়া, প্রথমে আফগানিস্থানে যাইয়া ভ্রাতা আকবরের হস্ত হইতে পুত্র আকবরকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। ইহার পর, দশ বৎসর কাল, তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহারা তাঁহার ক্ষমতাবীণ হইয়া পড়েন। তাঁহার সর্দারেরা তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ দিতেছিল। কিন্তু তিনি হত্যার পরিবর্তে সর্বদাই তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং



[হামিদা বেগম ।]

পুনঃ পুনঃ হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কখনও তাহা বিশ্বত হন নাই। তিনি বারংবার কামরাণের নিকট সৌহার্দ ও প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কামরাণ কিছুতেই সৌহার্দস্থাপনে সন্মত হন নাই।

১৪। এই সময়ের মধ্যে সের খাঁর মৃত্যু হয়। সের খাঁর পরে ক্রমে তিন জন রাজা হন। এই তিনের শেষ জন দুর্বলপ্রকৃতি ও শাসনকার্যে অক্ষম ছিলেন। হুমাযুন এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, এক দল সেনাসহ দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবারকার সেনাদল যেমন সাহসী, তেমনই কষ্টদ্রিষ্ট ও দৃঢ়। তিনি দিল্লী ও আখা পুনরুদ্ধার করিলেন। পনর বৎসর হইল, তিনি এই রাজ্য হারাইয়াছিলেন। কিন্তু হুমাযুন ফিরিয়া আসিয়া বেসী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। একদা অপরাহ্নে, তিনি তাঁহার প্রাসাদের সোপানের উপর হাঁটিতে ছিলেন, এই সময় সন্নিহিত মসজিদ হইতে আজানের আহ্বান অর্থাৎ মায়াহু-নমাজ বা প্রার্থনার সময় উপস্থিত, এই শব্দ ধ্বনিত হইল। হুমাযুন ইহা শুনিয়া, প্রার্থনার জন্ত ঐ স্থানেই দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তিনি যে যষ্টির উপর ভর দিয়াছিলেন, মসৃণ মার্বেলে তাহা পিছলিয়া গেল, তিনি ঐ স্থান হইতে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি এমন ভয়ানক আঘাত পাইলেন যে, এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল।

১৫। হুমাযুন খুব সাহসী পুরুষ ছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অসংখ্য তাঁহার সাহসিক বীর-কর্মই ইহার প্রমাণ। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার জায় কন্ঠ ছিলেন না, মনের সঙ্কল্পও তেমন দৃঢ় ছিল না। প্রথম বয়সে তিনি অত্যধিক ভোগ-রত, বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন; শেষ বয়সে তিনি অহিফেণ বা আফিম ভক্ষণে অভ্যস্ত হন, ইহাতে একটু বেসী বল ও দুর্বলমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে ভাল

বাসিতেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন । তিনি যদি ভাইদের সহিত এতদূর সাক্ষর ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে কখনও ভারত-রাজ্য হারাইতে হইত না । জউহার নামক তাঁহার জনৈক ভ্রাতা তাঁহার একখানি জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিয়াছিল । সে জীবনবৃত্তান্ত এখনও বর্তমান আছে ।

(৩৯)

সুররাজগণ ।

১৫৪০—১৫৫৫ ।

১। আফগানদিগের এক সম্প্রদায়ের নাম সুর । সুর-সম্প্রদায় পেশোয়ার হইতে আইসে । সের শাহ এই সুর-সম্প্রদায়ের লোক । সের শাহ ও তাঁহার পরবর্তী চারি জন এই হেতু সুর-বংশীয় রাজ্যরূপে পরিচিত । সের শাহের আদি নাম ফরিদ খাঁ । তাঁহার পিতামহ, বেহলোল লোদীর সময়ে, সৈন্তদলে কর্মপ্রার্থী হইয়া, ভারতে আগমন করেন । তাঁহার পিতা জোয়ানপুরের সুলতানের অধীন অখারোহী সৈন্তের নায়ক ছিলেন ; এবং বিহারে তাঁহাকে ক্ষুদ্র একটি জমিদারী প্রদান করা হইয়াছিল । ফরিদ খাঁ এক দিন সুলতানের সহিত শিকারে যাইয়া, তরবারির এক আঘাতে একটা বাঘ মারিয়া ফেলেন । বিস্মিত সুলতান সেই স্থানেই তাঁহাকে “সের খাঁ” এই উপাধি প্রদান করিলেন ।

২। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ কালে তিনি ‘সের শাহ’ অর্থাৎ ব্যাঘ্ররাজ এই উপাধি গ্রহণ করেন । সের শাহ ব্যাঘ্রের ত্য্যাবলবান্ ও কশ্মঠ, কিন্তু বড় কুটিল ও ক্রুর প্রকৃতির লোক ছিলেন । তিনি শত্রুর প্রতি কখন কখনা প্রদর্শন করেন নাই । যুদ্ধ ব্যাপারে তিনি যদি দেখিতে পাইতেন যে, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ-দ্বারা লাভবান্ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে, কখনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেন না ।

৩। সের শাহ রাজা হইয়া শাসন-কার্যে বিলক্ষণ দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পূর্ববর্তী মুসলমান রাজারা এত বড় ছিলেন যে, ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদিগের অনভ্যস্ত ছিল। তাঁহারা নিজেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে ভাল বাসিতেন না। প্রায় সমস্ত ব্যাপারই তাঁহাদিগের সর্দার ও কর্মচারীরা হাতে সমর্পণ করা হইত। তাঁহারা



[সের শাহ ।]

সর্দার ও কর্মচারীদিগকে অন্ধের আশ্রয় বিখ্যাস করিতেন। এই সকল কর্মসচিবেরা প্রথমতঃ খুব সাহসী, কঠোর ও দৃঢ় থাকিলেও, অল্প কাল পরেই, আরাম, আলস্য ও আমোদপ্রিয় হইয়া উঠিতেন। তাঁহারা কেবল পান, আহার, ও নিদ্রায়ই সময় অতিবাহিত করিতেন; এবং নিজেরা কর্ম না করিয়া, তাঁহারাও আবার তাঁহাদিগের অধীন ভূতাদিগের হস্তে কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

৪। সের শাহ শাসন-কার্যে এই প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রত্যেক বিষয়েই স্বয়ং দৃষ্টি রাখিতেন। সের শাহ যদিও বড় রাজা হইয়াছিলেন, কখনও অলস ছিলেন না। দীনদরিদ্র যেমন স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তিনিও তেমন, চির-কর্মনিষ্ঠ কাজালের আশ্রয়, পরিশ্রম করিতেন। নিজে যেমন খাটিতেন, অধীন কর্মচারীদিগকেও তেমনই ভাবে খাটাইতেন। তিনি অল্প সমস্ত আফগান রাজা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কারণ, প্রজাপালন ও রক্ষণই রাজার যে ধর্ম ও কর্তব্য, ইহা তিনি বিলক্ষণ-

রূপে অবগত ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, বরং রাজ্য-শাসন-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগের অনেককে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৌদরমল নামক একজন হিন্দুর উপর রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল।

৫। কেহ যেন বঞ্চিত না হয়, এই হেতু, সৈন্তদিগকে বেতন দানের সময়, প্রায় প্রতিনিয়তই তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব এবং আগ্রা হইতে মালোয়া পর্য্যন্ত পথের আগা গোড়া সমস্ত স্থানেই তিনি সরাই নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সরাই সমূহে পথিকেরা, বিনা ব্যয়ে, পানাহার প্রাপ্ত হইত। এই পথের সৰ্ব্বত্র তিনি ডাকের ঘোড়া নিযুক্ত করিয়া, এক দেশ হইতে আর এক দেশে, চিঠি পত্র প্রেরণের অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পথের প্রত্যেক পার্শ্বে ফলের গাছ লাগান এবং কিছু কিছু দূর ব্যবধানে কুপ ধনন করান হইয়াছিল।

৬। সের শাহ মালোয়া ও মারোয়ার রাজ্য জয় করেন। মালোয়া-স্থিত রেইজিন দুর্গের রাজপুতদিগের প্রতি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুত সর্দার পুরাণমলকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, সে যদি বশুতা স্বীকার করে, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে তাহার লোক-জন স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পত্তি লইয়া শান্তিতে ও বিনা বাধায় চলিয়া যাইতে দিবেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পুরাণমল ও তাহার লোক জন ঘেই দুর্গ হইতে বহির্গত হইল, সের শাহ অমনই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিতেন,—“শত্রুর সহিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কখন সঙ্গত নহে”। পর বৎসর সের শাহ বুন্দেলখণ্ডস্থিত কাঁলিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধ-সময়েই তিনি নিহত হন।

সুলতান ইসলাম বা সেলিম শাহ ।

৭। যখন সের শার পরলোক প্রাপ্তি হয়, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বহু দূরদেশে অবস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি প্রথম বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেবল তাঁহার ভ্রাতার প্রত্যাগমন পর্যন্ত শাসন করিবেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না;—সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে একটা ভূসম্পত্তি প্রদান করা হইল। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই, সেলিম তাঁহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করাতে, তিনি বিহার অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। অতঃপর আর কেহ তাঁহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইল না। কতকগুলি আফগান-অভিজাত বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, সেলিম তাঁহাদিগকে দৃঢ়হস্তে শাসিত ও দামিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে, আর কোনরূপে শান্তিভঙ্গ ঘটে নাই। পিতার স্থায় সেলিমও সুন্দররূপে শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলবান, সুশ্রী ও চৌকস লোক ছিলেন, এবং সর্বদা কৃতবিদ্যা ও বিজ্ঞ লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি নয় বৎসর রাজত্ব করেন।

৮। সেলিমের মৃত্যুর পর, তাঁহার শিশু পুত্র ফিরোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র তিনটি দিন রাজত্ব করার পরেই, ফিরোজ তাঁহার খুল্লতাত মোবারিজ খাঁ কর্তৃক নিহত এবং মোবারিজ আদিল শাহ নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আসীন হন।



[সেলিম শাহ]

তিনি যে রাজ-পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য, স্বীয় কার্য দ্বারা অচিরেই তাহা প্রমাণিত করিলেন। তিনি রাজকোষের সমস্ত অর্থ বৃথা আমোদে উড়াইয়া দিলেন এবং হিমু নামক নীচ জাতীয় একটা হিন্দুকে তাঁহার প্রধান সূহৃদ্ব ও মন্ত্রী বানাইয়া লইলেন। চারিদিকেই অভিমানী আফ-গান অভিজাতগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। হুমায়ুন তাঁহার অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের এই উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, কাবুল হইতে দিল্লী অভিমুখে অভিযান করিলেন, এবং অচিরেই দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার অল্পকাল পরেই, হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। একথা পূর্ব অধ্যায়েই উল্লিখিত হইয়াছে।

(৪০)

আকবর ।

১৫৫৬—১৬০৫

১। ভারতীয় মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে আকবর সর্কশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পূর্ণ নাম জোলাল উদ্দিন মহম্মদ ; কিন্তু জন্মসময়ে পিতা হুমায়ুন তাঁহাকে “আকবর” উপাধি দান করেন। ‘আকবর’ নামের প্রকৃত অর্থ “অতি মহান্” এবং প্রকৃতই তিনি অতি মহান্ রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। আকবর যখন ভারতের রাজা, ঠিক সেই সময়েই মহতী রাণী, কুইন এলিজাবেথ ইংলণ্ডের রাজ্ঞী। প্রায় ৩০০ বৎসর অতীত হইল, এই উভয়েই পরলোকগত হইয়াছেন।

২। যখন হুমায়ুনের মৃত্যু হয়, তখন আকবর ত্রয়োদশ বৎসরের বালক মাত্র। চারিদিকে অসংখ্য শত্রু। একমাত্র বিশ্বস্ত সেনাপতি বিরাম তাঁহার অবলম্বন ও সহায়।

বিরাম একজন সাহসী তুর্কি সর্দার। বিরাম হুমায়ুনের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তিনি ষোল বৎসর বয়স হইতে হুমায়ুনের অধীন কর্ম্মে

নিযুক্ত ছিলেন। বিরাম সর্বপ্রথম হিমুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। হিমু মহারাজা বিক্রমাদিত্য, উপাধি গ্রহণ করিয়া, দিল্লী আক্রমণ উদ্দেশে বিহার হইতে একদল সৈন্যসহ যুদ্ধ যাত্রা করে। সে যেই শুনিতে পাইল যে, বিরাম বালক সম্রাট সহ লাহোরে আছেন, অমনই সে আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া, লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিল। বিরাম তাহার সম্মুখীন হইলেন। পানিপথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। হিমু মহাসাহস ও পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু তাহার সেনাদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং সে স্বয়ং আহত ও বন্দী হইল। হিমু বন্দি-



[আকবর]

ভাবে আকবর-সমীপে আনীত হইলে, বিরাম আকবরকে হিমুর প্রাণ সংহারার্থ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বীরপ্রকৃতি সম্রাট বালক নিরস্ত্র ও আহত ব্যক্তির উপর অস্ত্রাঘাত করিতে পারিলেন না। শেষে বিরাম স্বহস্তে হিমুর প্রাণ বধ করিলেন। বিরাম পাঁচ বৎসর কাল দৃঢ়হস্তে ও বিশেষ অঁটা অঁটির সহিত দেশ শাসন করিয়াছিলেন।

৩। দিল্লী ও পঞ্জাব এই সময়ে এই দুটি প্রদেশ মাত্র মোগল-রাজ্য-ভুক্ত ছিল। তখন বাঙ্গালা, বিহার, জোয়ানপুর, সিন্ধু, গুজরাট, মালোয়া ও খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু ক্ষমতাপূর্ণ পাঠান রাজ্য বর্তমান ছিল এবং রাজপুত রাজগণ রাজপুতনা শাসন করিতে ছিলেন।

৪। আকবরের বয়স এক্ষণে আঠার বৎসর। তিনি কর্কশস্বভাব প্রাচীন রাজ-প্রতিনিধির আজ্ঞা পালন করিতে করিতে নিতান্ত তান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী এবং দরবারের সমস্ত মোগল অভিজাতগণও ইহাতে একান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই আকবরকে স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণের জন্ত পরামর্শ দিলেন। বিরাম ক্ষমতা ত্যাগ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, কিন্তু যুবক



[বিরাম]

সম্রাট্ অটল ও দৃঢ়। বিরাম অবশেষে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আকবর বিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—তিনি রাজ-দরবারে কোন উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইতে অথবা কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্ত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, না প্রচুর পেন্সন লইয়া সজিদল সহ মক্কা মহম্মদের সমাধি স্থানে তীর্থ যাত্রা করিতে অভিলাষী? বিরাম শেষোক্ত প্রস্তাব পরিগ্রহ পূর্বক মক্কা যাত্রা করিলেন। কিন্তু মক্কার পথে তিনি জনৈক আফ্গান কর্ত্ত্বক নিহত হন। কএক বৎসর পূর্বে এই আফ্গানের পিতাকে বিরাম হত্যা করিয়াছিলেন।

৫। আকবর এক্ষণে তাঁহার আপন ইচ্ছামত কৰ্ম্ম করিবার সুযোগ প্রাপ্ত ও স্বাধীন হইলেন। বাল্য বয়সে কাবুলের শীতপ্রধান পার্কত্যা ভূমিতে বাস করাতে তিনি খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ় হইয়াছিলেন; এবং সর্ব্বাংশেই একান্ত চতুর, চৌকস, দূরদর্শী ও বিবেচক ছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যদি তাঁহার রাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী করিতে

হয়, তাহা হইলে, হিন্দুদিগকে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহায় করিয়া লইতে হইবে । যে বংশ-সম্ভূত ও যে ধর্ম্মালম্বীই হউক না কেন, সমস্ত হিন্দুস্থান-বাসী লোকসমূহকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিয়া, সেই জাতির শীর্ষস্থানে তিনি স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । প্রথমতঃ তাঁহার নিজ সর্দাররা বাহাতে সম্পূর্ণরূপে বশে থাকে এবং দিল্লী রাজ্যে বাহাতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তাঁহাকে তজ্জগুই বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন করিতে হইল ।

৩। বিরাম রাজ-প্রতিনিধির পদ পরিত্যাগ করিলে, আকবরের আপন সর্দারদিগের মধ্যেই তিন জন, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আঠার বৎসরের বালককে পরাভব করা সহজ । অতএব, তাঁহারা যে সকল প্রদেশের শাসন-কর্তা ছিলেন, সেই সকল প্রদেশের স্বাধীন রাজা হইতে প্রয়াসপর হইলেন, তাঁহাদিগের এক জন জোয়ানপুরের খান জমান, আর এক জন মালোয়ার আদম খাঁ, এবং তৃতীয় জন গুর্রার আসফ্ জান । গুর্রা উড়িষ্যা ও বৃন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য । কিন্তু আকবর সহরেই ইহা প্রতিপন্ন করিলেন যে, বালক হইলেও তিনি মানুষের উপর শাসনদণ্ড চালাইতে ও প্রভুত্ব করিবার জগুই জনসাধারণ করিয়াছেন । তিনি খান জমান হইতে অধিক দূরবর্তী নহেন, ইহা দেখিতে পাইয়া প্রধান সেনাদল পশ্চাতে রাখিয়া, মধ্য রাজ্যে মাত্র ১০০০ লোক সহ গঙ্গা পার হইলেন, এবং ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যাষে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন । আকবর অত নিকটে কোন স্থানে আছেন, পূর্বে তাঁহারা ইহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত হইতে পারেন নাই । ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি তিনটি বিদ্রোহী সর্দারকে সম্পূর্ণরূপে নির্যাতন করিলেন । এইরূপে তাঁহার ২১ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি দিল্লীরাজ্যের সম্পূর্ণ প্রভু হইয়া বাসিলেন ।

৭। দিল্লী রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে পর, তিনি রাজপুতদিগের

সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন । এই সময়ে ভারতে নানকল্পে একশত রাজপুত রাজা বর্তমান ছিলেন । আকবর এই রাজপুত রাজাদিগকে সৌহার্দবদ্ধ বন্ধু ও সহায় করিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহকারিতায় উত্তরভারতের পাঠান রাজ্যগুলি জয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন । বৃহৎ ও দৃঢ় একদল সেনাসহ রাজপুতনার রণ-যাত্রা করা হইল । তিনি প্রথমে সর্কাপেক্ষা বলশালী রাজপুত রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । আকবর কিরূপ বলশালী ও সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পাইয়া ভীত হইলেন । অথচ তাঁহার স্বাভাবিক মহত্বে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করিয়া পারিলেন না । কারণ, রাজপুতেরা উদারচেতা বীর । বীরপুরুষ মাত্রই তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতির আশ্রয় । আকবর তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন । যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াও, তাঁহাদিগের সহিত একান্ত সদয় ব্যবহার করা হইল । তিনি তাঁহাদিগের রাজ্য তাঁহাদিগেরই হাতে রাখিয়া কেবল তাঁহাকে তাঁহাদিগের অধিরাজ বা সম্রাটরূপে সম্মান করিতে বাধ্য করিয়া লইলেন ।

৮ । কিন্তু রাজা সঙ্গের পুত্র মেওয়ার অধিপতি উদয়সিংহ কিছুতেই আকবরের সহিত সন্ধি স্থাপনে সন্মত হইলেন না । তিনি আকবরের সহিত তাঁহার গৃহের কোন মহিলাও বিবাহ অনুমোদন করিলেন না । আকবর তাঁহার রাজধানী চিতোরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন । উদয়সিংহ চিতোররক্ষার্থ সাহসী বীর-যুবা জয়মলকে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং আরাভালি পর্বতে পলায়ন করিলেন । চিতোর রাজপুতনার সর্বপ্রধান নগর এবং রাজপুতনার অন্ততম দৃঢ়তম দুর্গ । দুর্গের উপরে উঠিবার নিমিত্ত পাহাড়ের অঙ্গে খোদিত একটি মাত্র পথ । এই পথ ক্রমশঃ উর্দ্ধবিন্যস্ত চারিটি দ্বারে পরিবৃত্ত ছিল । আকবর

করিতে পারিলেন না। এক দিন রাত্রিতে জয়মল দুর্গের প্রাচীরে দাঁড়াইয়া বিপক্ষকৃত একটা

পরিখা-পূরণ-কার্যে স্বপক্ষীয় দিগকে সাহায্য করিতেছিলেন। আকবর এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাহার (Straight shooter) বা 'সরল-লক্ষ্য' নামক বন্দুক লইয়া আসিতে অমুমতি করিলেন। বন্দুক আনীত হইলে, তিনি এমন দৃঢ় ও স্থির লক্ষ্য করিয়া, গুলি ছুড়িলেন যে, গুলি জয়-



[উদয় সিংহ]

মলের ললাট ভেদ করিল। জয়মল মৃত ও ভূপতিত হইলেন। সেনা-নাগকের মৃত্যুতে রাজপুতেরা হীনসাহস ও হতাশ হইয়া পড়িল। তাহারা আর দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। তাহাদিগের চির-চলিত 'জহর' নামক নিষ্ঠুর-নীতির অমুসরণে, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা করিয়া, পুরুষেরা সকলে তাহাদিগের শোকপরিচ্ছদ পীত-বসন পরিধান করিল; এবং তরবারিকরে মহাবেগে বহির্গত হইয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দিল। এইরূপে চিতোরের সম্মুখে ৮০০০ হাজার রাজপুত বীর তাহাদিগের বীর-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিল।

৯। উদয়সিংহ কখন আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহও তদ্রূপ দৃঢ় ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকার্যে বিরত হন নাই। প্রতাপসিংহ যাবৎ না চিতোর উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাবৎ স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে ভোজন, খড় ভিন্ন অস্ত্র শয্যা শয়ন করিবেন না এবং দাড়ি গোঁফে তা দিবেন

না, এই প্রতিজ্ঞা করেন; কিন্তু তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। অবশেষে, তিনি এক নূতন নগর স্থাপন করিয়া, পিতার নাম অনুসারে, উহার নাম উদয়পুর রাখিয়া-
 ছিলেন। উদয়পুরের রাণারা আজ তকও উপরে পাত না রাখিয়া স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য পাত্রে ভোজন ও নীচে খড় না বিছাইয়া কোনরূপ শয্যাশয়ন করেন না। এখনও তাঁহারা দাড়িতে গোঁফে তা দেন না।
 রাণারা বিশুদ্ধ রাজপুতবংশ-
 সম্ভূত বলিয়া সম্মানিত।



[প্রতাপসিংহ]

তাঁহারা যে কখনও মুসলমানের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই এবং তাঁহাদিগের বংশের কোন মহিলাকে যে কখন মোগলসম্রাটের ঘরে বিবাহ দেন নাই, ইহাই তাঁহাদিগের বিশেষ অভিমানের কথা ও গৌরবের বিষয়।

১০। ইহার পর আকবর রাজপুত মহিলাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের পিতা ও ভ্রাতাদিগকে মোগল-সেনার মধ্যে বড় বড় কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপে আকবর শাহের কুটুম্ব ও স্নহৎ হইয়া উঠেন। এই সকল মহিলার একজন জয়পুরের রাজা বিহারী মলের কন্যা। বিহারী মলের পুত্র ভগবান্দাস আকবরের একজন প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। অতঃ সেনানায়ক মানসিংহ। মানসিংহ সম্পর্কে ভগবান্দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র; কিন্তু শেষে তাঁহার পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। জয়পুর রাজকন্যাই আকবর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের জননী। সেলিম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আকবর যোধপুরের রাজকন্যা যোধা বাইর সহিত

তাহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এইরূপে মাত্র মাত বংশের
অবসানেই আকবর রাজপুতনার
প্রভু এবং উদয়পুরের রাণা
বাতীত, সমস্ত রাজপুত রাজা-
দিগের অধিরাজ হইয়া বসিলেন।



[যোধ বাই]

১১। আকবর রাজপুত-
দিগকে হাত করিয়া এবং সহায়
সুহৃৎ ও সহকারিরূপে হিন্দু-
দিগকে প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে
ক্রমে হিন্দুস্থানের পুরাতন
পাঠান রাজ্যগুলি জয় করিয়া
লইলেন। তিনি বিহার, বাঙ্গালা,
উড়িষ্যা, কাশ্মীর, সিন্ধু,
মালোয়া গুজরাট, খান্দেশ,
কাবুল, ও কান্দাহার জয় করিলেন। আকবর তাহার দীর্ঘ রাজত্বের
শেষ সময়ে, বিদ্যা পর্বতের উত্তরবর্তী সমস্ত হিন্দুস্থান ও উত্তরভারতবর্ষ
এবং দাক্ষিণাত্যের বেরার, আহমদনগর ও খান্দেশের উপর শাসন-দণ্ড
চালনা করিতেছিলেন। একসময়ে, সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয়ের কল্পনা তাহার
মনে জাগিয়াছিল। আহমদনগরের নিজাম শাহি রাজাদিগের একজন
পরলোক গত হইলে, চারি জন সর্দার সিংহাসন দাবি করেন। একজন
আকবরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। আকবর তাহার পুত্র কুমার
মুরাদকে তাহার সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। রাণী চাঁদবিবি কর্তৃক
আহমদনগর বিশেষ সাহসিকতার সহিত পরিরক্ষিত হইয়াছিল।
আহমদনগরের বিবরণে একথা উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে বেরার
রাজ্য আকবরের হস্তে সমর্পিত হয়। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং

দাক্ষিণাত্যে গমন করেন । তিনি আহমদনগর ও আসির ঘর্ডর্গ জয় এবং খান্দেশ রাজ্য আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লন । বিজাপুর ও গোলকণ্ডার রাজা উপটোকন সহ তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন । অতঃপর আকবরের চতুর্থ পুত্র কুমার দানিয়ালের সহিত বিজাপুর রাজ-কন্টার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হয় ।

১২ । আকবর ৪৫ বৎসর যাবৎ ভারত শাসন করিতেছেন, পিতার এই দীর্ঘ রাজত্ব, যেন কুমার সেলিমের নিকট একটু বিরক্তিকর ও অসহনীয় হইয়া উঠিল । খৃষ্টীয় প্রায় ১৬০০ অব্দে, তিনি স্বয়ং সিংহাসন আক্রমণের জন্ত যত্নবান্ হন । তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর । তিনি এই সময়ে আজমীরের গবর্নর । তাঁহার স্থালক রাজা মানসিংহ তাঁহার এই আজমীর-শাসনকার্যে সহায় ছিলেন । কিছুদিন পরে, কোন আফ্গান সর্দার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, মানসিংহকে বাঙ্গালায় যাইতে হইল । মানসিংহ বাঙ্গালার গবর্নর হইলেন । মানসিংহ চলিয়া গেলে, সেলিম দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতা দাক্ষিণাত্যে এবং বড় বড় সেনাধ্যক্ষেরা সকলে দূর দূর প্রদেশে অবস্থিত আছেন ; এই সুযোগ বুঝিয়া, তিনি এলাহাবাদ অভিমুখে অভিযান করিলেন । সেলিম অযোধ্যা ও বিহার যে ধনসম্পত্তি ছিল, তৎসহ ঐ দুই রাজা আক্রমণ এবং আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন । তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে তাঁহার পিতা ষথার্থ মহম্মদীয় ধর্মের শত্রু এবং আবুল ফাজলের সাহায্যে মুসলমানেরা যাহাতে কোরাণের উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলে, তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্ আছেন, অতএব তাঁহার আর দীর্ঘকাল সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত নহে । এই কথা প্রচার করিয়া, সেলিম মুসলমানদিগকে তাঁহার সহিত যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন । পুত্রকৃত এই সকল অনুষ্ঠানের কাহিনী যখন আকবরের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি পুত্রের নিকট সমস্ত ঐ কথা জানিয়া একথা বলি দিলেন ।

এই যে, তিনি নিতান্ত নির্যোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন ; তথাপি তিনি যদি কিরিয়া প্রকৃত কর্তব্য-পথের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাকে মার্জনা করিতে প্রস্তুত আছেন। এই পত্র লিখিয়াই আকবর দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। কেহই সেলিমের পক্ষে যোগদান করিল না। সেলিম বুঝিতে পাইলেন যে, তাঁহার পক্ষে সাম্রাজ্য-শাসনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তিনি তখন তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য হৃৎ প্রকাশ করিয়া, পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পিতা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর বানাইয়া পাঠাইলেন।

১৩। কিন্তু সেলিম প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার এই আচরণে হৃৎখিত হন নাই। কারণ, ইহার পরই তিনি বৃদ্ধ পিতার প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিবে, ইহা উত্তমরূপে জানিয়া এবং বুঝিয়াও অতি বড় নিদারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বসিলেন। ইহাতে বস্তুতই আকবরের প্রাণ এতদূর ক্লিষ্ট ও আহত হইয়াছিল যে, অগ্র্য কিছুতেই তেমনটি হওয়া সম্ভবপর নহে। নরসিং রাও বুদ্ধেলখণ্ডস্থিত একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের সর্দার ছিলেন। সেলিম নরসিং রাওকে অর্থদ্বারা বশ করিয়া লন। আবুলফাজল বাদশাহের নিয়োগক্রমে অল্পসংখ্যক রক্ষী সহ গোয়ালিয়ার যাইতে ছিলেন। সেলিম নরসিং রাওকে আবুলফাজলের গতিপথে লুকাইয়া থাকিয়া, তাঁহার প্রাণ বধ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। এইরূপে কৃতবিদ্যা, সুপণ্ডিত, চিরবিশ্বস্ত সূজন আবুলফাজলের মৃত্যু ঘটে। আবুলফাজল আকবরের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন ভৃত্য ছিলেন। আকবর তাঁহাকে আপন সহোদর ভ্রাতার স্থায় ভালবাসিতেন। তিনি আবুলফাজলের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন এবং দুদিন কিছু খাইলেন না ; এমন কি, জল স্পর্শ পর্য্যন্তও করিলেন না ; নিদ্রাও তাঁহার চক্ষে আসিল না। কাশা কর্ত্তক এই

হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল, অবশ্যই তখন তিনি ইহা জানিতে পারেন নাই । সেলিম স্বয়ং নিজের যে জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, সেই জীবন-বৃত্তান্তে এই দুষ্কার্য্যে যে তাঁহার হাত ছিল, এ কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে । এই হত্যা তদীয় জীবনের একটি সদনুষ্ঠান বলিয়া তিনি গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । শেষে আকবর ইহা শুনিতে পাইয়া, বলিয়াছিলেন,— “সেলিমের যদি রাজা হইবার এতই সাধ ছিল, সে আবুলফাজলকে রাখিয়া আমাকে হত্যা করিল না কেন ?”

১৪ । আকবর যত বয়োবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণটি অধিকতর কোমল ও দয়াপরবশ হইয়া উঠিল । তিনি বহু যুদ্ধ-কার্য্যে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু কখন কোন দেশ উৎসন্ন অথবা লুণ্ঠন দ্বারা কোন জাতিকে দুর্দশাগ্রস্ত করেন নাই । তাঁহার পুত্র সেলিমের নব্য বয়সে বড়ই নির্ভুর প্রকৃতি ছিল । সেলিম কোন ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, জীবন্ত অবস্থায়, তাহার গায়ের চর্ম্ম তোলাইয়া প্রাণ বধ করিয়াছিলেন । আকবর এই সংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠেন এবং বলেন—“আমি একটা মৃত মেঘেরও চর্ম্ম উত্তোলন করিতে দেখিলে কষ্ট অনুভব না করিয়া পারি না, সেই আমারই পুত্র সেলিম, কি অশ্রদ্ধা একটা জীবিত মানুষের প্রতি এমন রোমহর্ষণ ও ভয়াবহ নির্ভুর ব্যবহার করিল !”

১৫ । আকবর মুসলমানের ঈশ্বরী লালিত-পালিত হইও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি হিন্দুদিগের প্রতি একান্ত মৃদু ও ভদ্র ব্যবহার করিতেন । তিনি বলিতেন প্রত্যেক ধর্ম্মেই ভাল জিনিষ কিছু আছে, এবং যাহারা প্রকৃতই ঈশ্বরে ভক্তিমান, তাহারা মুসলমানের মসজিদ হিন্দুর মন্দির, কিংবা খৃষ্টানের গির্জা যেখানেই যাউক না কেন, সেই খানেই ঈশ্বরের স্তুতি অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয় । আকবরের

পারিত। আকবরের কোন মুদ্রায় এই কথাটি মুদ্রিত ছিল—“আমি
কার্য্য করাই ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিবার প্রশস্ত উপায়। যে সত্যের সরল
পথে চলে, সে কখনও পতিত বা বিনষ্ট হয় না।”

১৬। জাতিতে ও ধর্ম্মে মুসলমান নহেন, আকবরের এইরূপ
বহু পত্নী ছিলেন। আকবর যে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতিই সমানে
সদয় ব্যবহার করিতেন, ইহাই তাহার প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই।
তাঁহার প্রত্যেক হিন্দু পত্নীরই নিজের একটি পুরোহিত ও মন্দির
ছিল; এবং প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামত ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন।
আকবর, সময় সময়, ললাটে হিন্দুর জাতীয় চিহ্ন তিলক ধারণ করিতেন
এবং হিন্দুর উপবীত বক্ষে দোলাইয়া ঠিক যেন একটি হিন্দুর আয় সজ্জিত
হইতেন।

১৭। আকবর নিজে লেখা পড়ায় পণ্ডিত ছিলেন না, শৈশবে
তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর খুল্লতাের
হাতে বন্দিভাবে ছিলেন। খুল্ল-
তাত তাঁহাকে কোনরূপ শিক্ষা
দান করেন নাই। সুতরাং,
অনেক কাল পর্য্যন্ত আকবর
লিখিতে কিংবা পড়িতে শিখেন
নাই। কিন্তু তিনি পুস্তক পড়াইয়া
শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন।
তাঁহার একটা বৃহৎ পুস্তকালয়



[হিন্দুর বেশে সজ্জিত আকবর] ছিল। এই পুস্তকালয়ে পাঁচ
হাজারেরও অধিক সংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। চিত্র তাঁহার
অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বহু ছবি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।
আকবর উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও কবিতা শুনিতে ভাল বাসিতেন।

১৮। আকবরের দরবারে বহুপ্রসিদ্ধনামা ও কৃতবিদ্যা লোক বাস করিতেন, তাঁহারা রাজকীয় শাসন-কার্যে আকবরের সহায় স্বরূপ ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্মালম্বী লোকের সম্বন্ধে যাহাতে সুশাসনের ব্যবস্থা হয়, তাহারা তদ্বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতেন। আমরা ভগবান্দাস ও জয়পুরের রাজা মানসিংহের কথা বলিয়াছি।

তাঁহাদিগকে বাদশাহী সেনা দণ্ডে সৈন্তাধ্যক্ষ ও প্রদেশের শাসনকর্তা বা গবর্নর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারা হিন্দু। মানসিংহ প্রথমতঃ বাঙ্গালায় তৎপর বিহারের গবর্নর হন। শেষে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের গবর্নর করিয়া পাঠান হয়। অবশেষে তিনি কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মানসিংহ আকবরের জন্ত উড়িষ্যা জয় করেন। সমস্ত সেনাধ্যক্ষদিগের মধ্যে তিনিই আকবরের



[ভগবানদাস]

সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আবুলফেইজ বা ফেইজি ও আবুল ফাজল এই দুই ভ্রাতা আকবরের সর্বপ্রধান মুসলমান সচিব বা কর্মচারী ছিলেন। আকবর তাঁহার রাজত্ব কালের দ্বাদশ বৎসরে, ফেইজিকে কর্মে নিযুক্ত করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে, ফেইজি তাঁহার কনিষ্ঠ আবুল ফাজলকে সম্রাট সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজলের বয়স তখন মাত্র ১৮ বৎসর। আকবর তখনই তাঁহাকেও কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এই দুই ভ্রাতা আকবরের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা আকবরকে যেমন

ভাল বাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন। আকবরও তাঁহাদিগকে



[মানসিংহ]

প্রিয়তম বন্ধুর তায় ভালবাসিতেন ও আদর করিতেন। আবুল ফাজল আত্ম-জীবন দান করিয়া কিরূপে সেই বন্ধুতার ঋণ শোধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। একটা বাহিরের লোক কুমার সেলিম অপেক্ষাও আকবরের অধিকতর ভালবাসার পাত্র ও বিশ্বাসভাজন, সেলিমের প্রাণে ইহা সহ হয় নাই। সেলিম তাহাকে উত্তরোত্তর অধিকতর ঘৃণা ও ঘেঁষ করিতে আরম্ভ

করেন। এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। অবশেষে, তিনি তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া নিশ্চিত হইয়াছিলেন।

১৯। আবুল ফাজল আকবরের জীবনব্যাপী বন্ধু। আবুলফাজল যেমন কৃতবিদ্যা ও সুশিক্ষিত সভাসদ তেমন সাহসী ও রণ-নিপুণ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সর্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও সর্বপ্রধান মন্ত্রীর পদে অধিকৃত



[আবুল ফাজল]

ছিলেন। তিনি 'আকবর নামা' বা আকবরের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থের এক অংশের নাম 'আইন আকবরি' অথবা আকবরের কৃত বিধিব্যবস্থা। এই অংশে আকবরের দরবার, শাসন-ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিবরণ আছে ; এবং ইহা ঐ সময়ের একখানি সর্বোৎকৃষ্ট বিশদ বর্ণনা। আবুল ফাজল সম্রাট আকবরে,—তঁাহার সেই আরাধ্য জনে, কোনই দোষ দেখিতে পান নাই। সুতরাং, তদীয় গ্রন্থ তঁাহার প্রিয় বাদশাহ বা সম্রাটের একটা সুদীর্ঘ কীর্তি-কাহিনী বা গুণ-গাথায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

২০। রাজা তোদরমল পঞ্জাবনিবাসী হিন্দু। তোদরমল অনেক কাল পূর্বে দের শাহের চাকরী করিয়াছিলেন। তিনি হিসাবের কর্মে অত্যন্ত নিপুণ ও সুদক্ষ ছিলেন ; এবং ভূমিপরিমাপ, ও কর-আদায়-সম্পর্কিত ব্যাপারে তঁাহার গ্রাম জাতসার লোক আকবরের দরবারে আর কেহই ছিলেন না। তোদরমলও একজন বড় সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও অনেকবার বাদশাহের পক্ষে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেনানায়ক এবং



[তোদরমল]

প্রদেশের শাসনকর্তা রূপে প্রেরিত হইয়াছেন। তোদরমলের উপদেশ অনুসারেই আকবর ভূমির কর আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত করেন। সমস্ত সাম্রাজ্যের পরিমাপ করাইয়া, উৎপন্ন শস্তের তারতম্য অনুসারে, ভূমিসমূহকে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। উর্বর ভূমিতে যে হারে কর ধার্য করা হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভূমিতে সেরূপ কর ধরা

হয় নাই। পূর্বে রাজকর স্বরূপ শস্ত দেওয়ার রীতি ছিল, তৌদরমল সে রীতি রহিত করিয়া, রাজকরে শস্তের পরিবর্তে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যাহারা কর আদায় করিতেন, তাহাদিগকে নির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত করা হয়। প্রজারা খাজনা মাত্র দিবে, তহসিলদারকে তহসিলের পারিশ্রমিকরূপে তাহাদিগকে আর কিছুই দিতে হইবে না, এই ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি দশ বৎসরকাল, একহারে খাজনা আদায় করা হইত। লোকের বিরক্তিকর ও পীড়াজনক অস্ত্র যে সকল টেক্স ছিল, তাহা একবারই রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২১। সমস্ত সাম্রাজ্য ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই ১৫ সুবার ১২টি হিন্দুস্থানে ও ৩টি ছিল দাক্ষিণাত্যে। সুবাগুলির নাম, কাবুল, লাহোর, মুলতান, এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার বাঙ্গালা, আজমীর, গুজরাট, বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগর। আহম্মদ নগর সাজাহানের রাজত্বের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশ বা সুবায় এক এক জন রাজ প্রতিনিধি বা 'সিপাসালার' ছিলেন। এই সিপাসালারগণই শেষে সুবাদার নামে অভিহিত হন। সুবাদারের নাচে একজন দেওয়ান থাকিতেন। দেওয়ানের উপর ছিল রাজস্বের ভার। আর একজন থাকিতেন, ফৌজদার বা সেনাদলের অধ্যক্ষ। তৃতীয় ব্যক্তি কতোয়াল বা পুলিশের কর্তা। চতুর্থ 'মির-ই-মাদল' বা জজ এবং কাজী বা ব্যবহারবিৎ।

২২। প্রজাসাধারণের অবস্থা তখন কি?—তাহারা পূর্ববর্তী সকল সময় অপেক্ষাই এই রাজত্বে অধিকতর সুখে ছিল। পাঠান রাজাদিগের সময়ে তাহাদিগের উপর যে করভার চাপান ছিল, এই সময়ে সে করভার বহু পরিমাণে লঘু হইয়া যায়। হিন্দু হউক মুসলমান হউক, সকলকেই একই রকমের কর দিতে হইত। পূর্ব-

বর্তী মুসলমান রাজারা হিন্দু প্রজা হইতে তাহাদিগের চির-স্থগিত জেজিয়া নামক একটা কর আদায় করিতেন । যে মুসলমান নহে, তাহাকেই, মুসলমান নয় বলিয়া, এই কর দিতে হইত । আকবর এ কর গ্রহণ করিতেন না ।

২৩ । পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদিগের উপর যে টেক্স ছিল, আকবর তাহাও রহিত করিয়া দেন । সকলেই স্বাধীনভাবে তাহাদের স্বধর্ম অনুসরণ করিতে পারিত । জাতিগত আচার-পদ্ধতির অনুসরণেও কোন বাধা বা নিষেধ ছিল না । এই সকলের প্রতিকূলে কেহই কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিতে সাহস পাইত না । কোন কোন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত একটা নিষ্ঠুর রীতি সম্পর্কে আকবরের দৃঢ় নিষেধ-আজ্ঞা ছিল । পত্নী বর্তমান থাকিতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, বিধবা স্বামীর জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া পুড়িয়া মরিত । এই অনুষ্ঠানের নাম ছিল ‘সতী’ । এই পদ্ধতি রহিত কারবার জন্ত আকবর যথাশক্তি যত্ন কারয়াছিলেন ।

২৪ । আকবর এবং অন্ত্র সমস্ত মোগল রাজাদিগের সময়েই, দেশের অবস্থা ও রাজকীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকর্তা রাজার চিত্রানুসারে পার্থক্য ঘটিত । রাজা যাহা প্রাণে চাহিত, তাহাই করিতেন । রাজা যদি আকবরের মত ভাল লোক হইতেন, শাসন-ব্যবস্থাও ভাল হইত । রাজা যদি মন্দ লোক, দুর্বলমনা ও অলস হইতেন, শাসন-ব্যবস্থাও তদনুরূপ মন্দ ও লোক-পীড়ক হইয়া উঠিত । আকবরের ইচ্ছাই আইন ছিল । তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহাই করিতেন । তাহার উপরে অন্ত্র কোন শক্তির কোনরূপ হাত বা ক্ষমতা ছিল না । কিন্তু, ইংরেজ-শাসনে কিবা ইংলণ্ড কিবা ভারতবর্ষ, সবত্রই আইনের আধিপত্য । আইন সকলেই জানে এবং সকলেই মানিয়া চলে ।

না, ইংলণ্ডের রাজাও তেমন আইন লঙ্ঘন করিয়া চলিতে সমর্থ হন না। ছয় শত বৎসর পূর্বে হইতে ইংরেজেরা তাঁহাদিগের রাজগণকে এবিষয়ে সম্মতি দানে বাধ্য করিয়া লইয়াছেন।

২৫। আকবর ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে পরলোকগত হন। তিনি ৫১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। আকবরের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

(৪১)

জাহাঙ্গীর ।

১। সেলিম “জাহাঙ্গীর” বা জগজ্জয়ী এই উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার মাতা রাজপুত-রাজকন্যা। অতএব, তিনি অর্দ্ধ রাজপুত ছিলেন। সেলিমের রাজপুত-পত্নী যোধবাইর গর্ভ সমুত্ত পুত্র খস্রু পিতার পরিবর্তে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য উৎসুক হন এবং এই কন্ঠে মাতুল রাজা মানসিংহ ও খণ্ডর খান-ই-আজিমের সাহায্য লাভার্থ বিস্তর চেষ্টা করেন। খান-ই-আজিম আকবরের সর্বপ্রধান সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু আকবর তাঁহার মৃত্যু-শয্যা-পার্শ্বে সমস্ত কৰ্মচারিদিগকে আহ্বান করিয়া, কুমার সেলিমকেই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া যান। সুতরাং, এ বিষয়ে আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না।

২। পুত্র খস্রুর প্রতি সেলিমের তত মনের টান ছিল না। খস্রু কখন পিতা হইতে ভাল ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই। জাহাঙ্গীর রাজ-পদে অভিষিক্ত হইবার চারি মাস পরে, একদিন মধ্য রাত্ৰিতে জাহাঙ্গীরের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, কুমার খস্রু দিল্লীতে পলায়ন করিয়াছেন। খস্রু কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লাহোরে

প্রস্থান করিলেন। পিতা তাঁহার অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পুত্র খম্বু লাহোরের দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। খম্বুর সৈন্য সামন্ত সমস্ত ভাগাইয়া দেওয়া হইল। খম্বুও পলায়ন করিলেন। কিন্তু পলায়নপর খম্বু যখন সিন্ধুনদ পার হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পিতার নিকট আনীত হইলেন। তাহার ৭০০ সঙ্গী ও অনুচরকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল এবং খম্বু কারারুদ্ধ হইলেন।

ক্রমে ১৬ বৎসর কারাবাসের পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খুররাম বা সাজাহানের হাতে তাঁহার ভার অর্পণ করা হয়। সাজাহান তাঁহাকে হত্যা করাইয়া ছিলেন।

৩। জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার তায় অনেক রাজপুত রমণীর পণিগ্রহণ করেন। কুমার খুররামের মাতাও তাঁহাদিগেরই একজন। খুররাম অবশেষে সম্রাট হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহার ষষ্ঠ বৎসর



[জাহাঙ্গীর]

রাজত্ব কালে, হুরজাহান নাম্নী একটি পারসিক মহিলাকে বিবাহ করেন। হুরজাহান ভারতীয় রাণীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

৪। তুর্ক দেশবাসী একটি দীন-দরিদ্র হুরজাহানের পিতা। তিনি ভারতে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্ত আগমন করেন। লাহোরে আসিয়া এক পুরাতন বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। এই বন্ধুর সাহায্যে

আকবরের দরবারে তাঁহার প্রবেশ লাভ ঘটে। তিনি অত্যন্ত কৰ্মক্ষম ও চতুর লোক ছিলেন। সম্বন্ধেই তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন কৰ্মচারী হইয়া উঠিলেন। তিন রাজকীয় কোষাধ্যক্ষের পদে বরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র সন্তান ছিলেন। সে সন্তান কণ্ঠা নুরজাহান। কণ্ঠাটি বড় সুন্দরী, তখন তাহার নাম মিহির উন্নিসা বা নারাকুলে সূর্য্য। মিহির উন্নিসা যেমন সুন্দরী, তেমনই বুদ্ধিমতী ও বিদূষী। তাঁহার পিতা একটি পারসিক যুবকের সহিত মিহির উন্নিসার সখন্ধ স্থির করেন। এই যুবকের নাম সের আফ্খান বা ব্যাঘ্রহস্তা। সের আফ্খান বঙ্গদেশে বৃহৎ একটা ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।



[নুরজাহান]

৫। সেলিম যখন সম্রাট হইয়া, যাহা প্রাণে চায়, তাহাই করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, তখন আর কাল-বিলম্ব ঘটিল না। তিনি সের আফ্খানকে নিকৃষ্ট উপায়ে হত্যা করাইয়া, তাহার স্ত্রীকে দরবারে লইয়া আসিলেন। দরবারে আনীত হইলে, মিহির উন্নিসার “নুর মহাল” অর্থাৎ রাজ-প্রাসাদের আলো এই নাম রাখা হইল। কিন্তু নুর মহাল উচ্চপ্রাণা মহিলা ছিলেন, তিনি একান্ত শোকাচ্ছন্ন ও পতি-হত্যা-নিবন্ধন যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া, ছয় বৎসর কাল, সম্রাটের মুখ দর্শন করিলেন না। ইহার পর, তিনি মনে করিলেন যে, মৃতপতির জন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যথেষ্ট শোক করা হইয়াছে, আর কেন, এই ভাবিয়া সম্রাটের সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন।

৬। বিবাহের পর, তাঁহার নাম দ্বিতীয় বার পরিবর্তিত হইল। এক্ষণে তিনি “নুর জাহান” বা জগতের আলো এই নামে অভিহিত

হইলেন । বিবাহ-মুহূর্ত্ত হইতেই মুর জাহান সমস্ত রাজ-ক্ষমতার অধিকারিণী হইয়া, সাম্রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন । জাহাঙ্গীর সমস্তই তাঁহার হাতে সপিয়া দিলেন । তিনি জাহাঙ্গীরের সমস্ত আদেশ পক্ষে স্বাক্ষর করিতেন । তাঁহার পিতাকে সর্বপ্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করা হইল । ভ্রাতা দিল্লীর দরবারে সর্বপ্রধান অভিজাতরূপে সম্মানিত হইলেন । জাহাঙ্গীরের পরবর্ত্তী ২০ বৎসর কাল রাজত্ব, প্রকৃতপ্রস্তাবে জাহাঙ্গীরের নহে, মুর জাহানের । জাহাঙ্গীর বলিতেন, আহা-রে-র জন্ত প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানের জন্ত উৎকৃষ্ট মদ্য পাইলেই তাঁহার হইল । ইহা ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই প্রত্যাশী বা অভিলাষী নহেন । তিনি রানীর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেন না । কারণ, তিনি জানিতেন, রানী রাজ্য-শাসন-ব্যাপারে তাঁহা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর দক্ষ ও নিপুণ । কথিত আছে, রানী মুর জাহানই সর্বপ্রথম গোলাপি আতর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন । তাঁহার স্নানাগার-স্থিত স্নানীয় জল, সময় সময়, গোলাপ ফুলে পরিপূর্ণ থাকত । তিনি একদিন গোলাপ হইতে নিষ্কৃত তৈল স্নানীয় জলে ভাসিতে দেখেন । এই তৈলই মনোরম আতর ।

৭ । রানী যে এমন বুদ্ধিমত্তা ও সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য-শাসনে সমর্থ ছিলেন, ইহা জাহাঙ্গীর ও তদানীন্তন হিন্দুস্থান, এ উভয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল । কারণ, জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতা আকবরের স্ত্রায় জ্ঞানী, চৌকস ও সুজন ছিলেন না । তিনি নিজে কিরূপে সুখ-সন্তোকে সময় পাত করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল । মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা বেশী বিলাসী ও মদিরাসক্ত ছিলেন ।

৮ । জাহাঙ্গীর ইউরোপে মহান্ মোগল নামে পরিচিত ছিলেন । ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌ স্তার টমাস্‌ রো নামক এক

ব্যক্তিকে রাজদূতরূপে জাহাঙ্গীরের সমীপে প্রেরণ করেন। স্যর টমাস্ রো ইংরেজ বণিগ্দিগের জন্ত ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনায় সম্রাট্ সমীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ বণিগ্দিগের তখন পশ্চিম উপকূলে সুরাট নগরে একটা কুঠী বা বাণিজ্য দ্রব্যের আড়ৎ মাত্র ছিল। স্যর টমাস্ রো জাহাঙ্গীরের দরবারে তিন বৎসর ছিলেন। এই সময়ে, তিনি ভারতে যাহা দেখিতে ও শুনিতে পান, সমস্ত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দেখিতে পান যে, আকবরের রাজ্য-শাসনের যেরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল, এফগার বন্দোবস্ত তদ্রূপ উৎকৃষ্ট নহে। অনেক স্থানের গবর্ণররাই প্রজার সহিত মন্দ ব্যবহার করিতেন। দেশ দস্যু দলে পরিপূর্ণ ছিল। দূর রক্ষিগণে সুরক্ষিত না হইয়া, পরিভ্রমণ নিরাপদ ছিল না। স্যর টমাস্ রো সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকার কামনায় প্রতিনিয়তই রাজ-দরবারে গমন করিতেন। সম্রাট্ হীরক ও পদ্ম-রাগ-মণি-মণ্ডিত একখানি অনুচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন।



স্যর টমাস্ রো।

সম্রাট্ কখন কখন তাঁহাকে ভোজনার্থ আমন্ত্রণ করিতেন। স্যর টমাস্ রো যখন সম্রাটের নিকট বাণিজ্যের অনুমতি প্রার্থনা করিতেন, তখন তিনি রাণীর নিকট তাঁহাকে প্রার্থী হইতে উপদেশ দিতেন; কারণ, রাণীই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী ছিলেন। এই অনুমতি প্রাপ্তির পূর্বে রাণীর সম্মতি লাভের জন্ত স্যর টমাস্ রোকে হুরজাহানের ভাতা আসফ খাঁকে মূল্যবান মণিরত্ন উপহার দিতে হইয়াছিল।

৯। এই রাজত্বে সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজদ্রোহিতার ভয়ঙ্কর উপদ্রব ঘটিয়াছিল। জাহাঙ্গীর তাঁহার স্ব-রচিত জীবন-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, একবার কনোজে ৩০০০০ রাজদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। ১০০০০ ছিন্ন মুণ্ড দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ১০০০০ লোককে, মাথা নীচের দিকে রাখিয়া, পাছের উপর ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি বলেন, এমন প্রদেশ ছিল না, যেখানে নূনকল্পে ৫০০০০০ লক্ষ বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয় নাই।

১০। রাজত্বের শেষ ভাগে জাহাঙ্গীরের পুত্র খুর্রাম তাঁহাকে অত্যন্ত ত্যাগ বিরক্ত করিয়াছিলেন। খুর্রাম সাম্রাজ্য লাভের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রান্ত হইয়া উঠিলেন ; এবং অবশেষে সাজাহান উপাধি গ্রহণ করিয়া, রাজকীয় ক্ষমতা স্বয়ং অধিকার করিয়া লইতে যত্নপর হইলেন। নুরজাহান মহবত খাঁ নামক জনৈক সাহসী ও ক্ষমতাপন্ন সর্দারকে সম্রাটের রক্ষাবিধানার্থ অমুরোধ করিলেন। মহবত খাঁ সত্বরেই সাজাহানকে দাক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া দিলেন। নুরজাহান এই ঘটনায় মহবতের ক্ষমতা দেখিয়া মহবত খাঁ সম্ভবতঃ নিজেই রাজা হইয়া বসিবেন, এই আশঙ্কায় ভীত হইলেন। অতএব, তিনি তাঁহার প্রাণ সংহারের অভিসন্ধিতে তাঁহাকে রাজ-দরবারে ফিরিয়া আসিবার জন্ত সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। মহবত খাঁ একদল বলিষ্ঠ রাজপুত সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, জাহাঙ্গীর শিবিরে আছেন। তিনি সাহস সহকারে জাহাঙ্গীরকে আক্রমণ ও অবরোধ করিলেন। রাজার কোনরূপ অনিষ্ট করা মহবত খাঁর ইচ্ছা ছিল না। কেবল, তিনি আত্মজীবন-রক্ষার্থই ইহা করিলেন। জাহাঙ্গীর যাহাতে ছুটিয়া বাহির হইতে না পারেন, তিনি শুধু এই জন্তই বিশেষ যত্নবান্ রহিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলেন না, তাঁহাকে রাজার তায় সম্মান ও সম্মানের সহিত রক্ষা করিলেন।

১১। কিছু দিন পরে, জাহাঙ্গীর মহবতের অবরোধ হইতে কোশলে মুক্তি লাভ করিয়া নুরজাহানের সহিত মিলিত হইলেন। মহবত খাঁ আত্মজীবন বিপন্ন বুঝিয়া, পলাইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন; এবং দাক্ষিণাত্যে যাইয়া, সাজাহানের সহিত মিলিত হইলেন; বলা বাহুল্য যে, সাজাহান তাঁহাকে পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

১২। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই, জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল। সাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নুরজাহানকে বৃহৎ বৃত্তি দান করিয়া, রাজ-ক্ষমতা হইতে অপমৃত করা হইল। নুরজাহান ইহার পরে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। কিন্তু রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার আর কোনই হাত ছিল না।

৪২।

প্রাসাদ-নির্মাণে সাজাহান

১৬২৭—১৬৫৮।

১। সাজাহানের জননী রাজপুত-কন্যা, পিতাও অর্ধ রাজপুত। তাঁহাতে তুর্ক অপেক্ষা রাজপুতের ভাবই অধিকতর প্রবল ছিল। তিনি বাদশাহী আড়ম্বর ও গৌরবে মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই ত্রিশ বৎসরে বহু-সংখ্যক নগর ও প্রাসাদ নির্মাণ করা হইয়াছিল, তাঁহার নির্মিত মসজিদ ও সমাধি-মন্দির কারু-কার্যে ভারতে সর্বোৎকৃষ্ট।



[সাজাহান]

২। তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই, সিংহাসন লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য এক ব্যক্তিও যাহাতে বর্তমান না থাকে, সর্বপ্রায়ে তাহারই পথ করিয়া লইলেন। সমস্ত ভ্রাতাদিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল; এবং তাঁহাদিগের যে সকল সম্মান-সম্পত্তি ছিল, সেই নিরুপায় শিশুগুলিকেও বাকি রাখা হইল না। এইরূপ নৃশংস উপায়ে তাঁহার সিংহাসন নিশ্চল হইল।

৩। যদিও এইরূপ নির্দয় হত্যাব্যাপারে তদীয় রাজত্বের আরম্ভ, সাজাহান রাজ্যের শাসন-কার্য্য কিন্তু বড়ই সুন্দররূপে চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীর অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠতর রাজা। পিতার ত্রায় তিনি অলস বা মদিরাসক্ত ছিলেন না। আকবরের ত্রায়, তিনিও হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ প্রজার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। প্রজারা তাঁহাকে ভাল বাসিত। রাজপুত্রেরা তাঁহাকে প্রায় যেন স্বজাতীয় রাজা বলিয়া সম্মান করিত এবং তাঁহার সেনাদলে থাকিয়া প্রীতির সহিত তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিত।

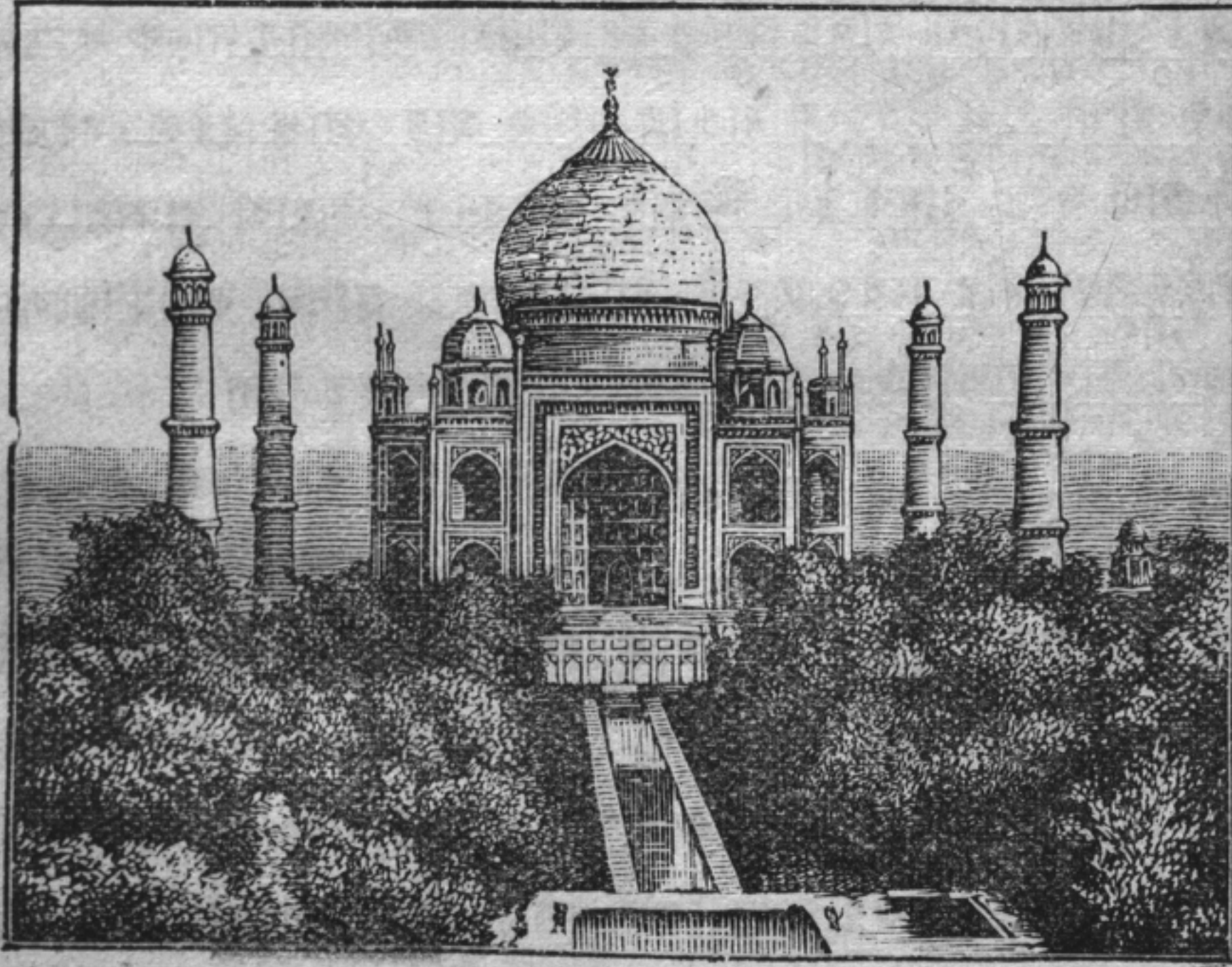
৪। একটি সুন্দরী পারসিক মহিলা সাজাহানের পত্নী ছিলেন। এই মহিলা নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী। নাম ‘মমতাজ মহল’ অর্থাৎ প্রাসাদের উন্নত-রত্ন। মমতাজ তাহার পতিকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। চৌদ্দ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর, মম-



[মমতাজ মহল]

তাজের অন্তিম সময়, উপস্থিত হইল। তিনি মৃত্যু সময় পতিকে অস্ত্র

কোন পত্নী গ্রহণ না করিতে এবং তাঁহার নাম যেন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে, এইজন্ত তাঁহার সমাধি-স্থানে একটি সমাধি-মন্দির নির্মাণ করাইতে বলিয়া যান। পতি সাজাহান আকুলপ্রাণে কাদিতে কাদিতে তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি অত্র পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। পত্নীর সমাধি-স্থানে চিরপ্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত তাজমহল নির্মিত হয়। এই সমাধি-মন্দির শোভাসম্পদে জগতে অদ্বিতীয়। ইহা আগ্রা নগরে যমুনাতটে অবস্থিত আছে। এখনও দেখিলে, বোধ হয়, যেন কল্যাণ ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে।



[তাজমহল]

এখনও ইহা নূতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাজমহল বিশুদ্ধ ধবল মার্বেল প্রস্তরে নির্মিত। এই ধবল মার্বেলের উপর মহামূল্য মণিরত্ন বিস্তৃত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরে ইহার নির্মাণ-কার্য সমাধা হয়। ইহার নির্মাণ কার্যে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

৫। দিল্লীর জুমা বা মহামসজিদ এবং আগ্রার মতি বা মৌজিক মসজিদ সম্রাট্ সাজাহান কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে অতীব সুন্দর প্রার্থনা-প্রাসাদ। সাজাহানের সিংহাসন অতুলনীয়। অন্য কোন রাজা কখনও অমন সিংহাসনে আসীন হন নাই। সিংহাসনটি বৃহৎ একটা ময়ূরের আকারে গঠিত। উহার পশ্চাদিকে পুচ্ছ বিস্তৃত ছিল। এই আসন সমগ্র এসিয়ায় ময়ূরাসন নামে প্রসিদ্ধ। নীলকান্ত, মরকত ও পদ্মরাগ মণি, এবং হীরকখণ্ড দ্বারা উহাতে জীবন্ত ময়ূরের পুচ্ছস্থিত পালকের বর্ণ ফলান হইয়াছিল। ময়ূরাসন নির্মাণের ব্যয় ৬০০০০০ পৌণ্ড।

৬। সাজাহানের রাজত্ব কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক কতিপয় ইংরেজ বণিক পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামক দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে হুগলিতে গঙ্গানদীর মুখেও একটি বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কুঠী কলিকাতার ২৫ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল।

৭। সাজাহানের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুজী সাহসী, সরলপ্রাণ ও মুক্তহস্ত রাজকুমার ছিলেন; কিন্তু একটু অভিমানী ও হঠকারী। তিনি আকবরের স্ত্রায় হিন্দুর প্রতি সদয় ছিলেন। মুসলমান অভি-জাতেরা তাঁহাকে ভাল বাসিত না। দ্বিতীয় পুত্র সুজাও সাহসী এবং চৌকস ছিলেন, কিন্তু পিতামহ জাহাঙ্গীরের ন্যায় মদিরাসক্ত ও বিলাসী। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ক্ষমতাপ্রিয়, ধূর্ত ও নিষ্ঠুর। তিনি বড় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন; এবং হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করিতেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ্য-শাসনের উপদ্রবকে নিতান্তই বিরক্তিকর মনে করেন; তাঁহার ইচ্ছা যে, সংসারে নিষ্কিন্তু থাকিয়া পুণ্যময় পবিত্রপ্রাণে ঈশ্বরের কার্যে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু মুরাদ যদি রাজ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহার

সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কনিষ্ঠ রাজকুমার মুরাদ মদ্যপান, শিকার বা মৃগয়ায় সময় কাটাইতে ভাল বাসিতেন। আওরঙ্গজেব যাহা বলিলেন, তিনি অন্ধের ঞ্চায় তাহাই বিশ্বাস করিলেন। প্রত্যেক রাজকুমারই এক এক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন; এবং প্রত্যেকেরই এক একটা বৃহৎ সেনাদল ছিল। দারা দিল্লীতে, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে, সুজা বাঙ্গলায় এবং মুরাদ গুজরাটে ছিলেন।

৮। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সাজাহান পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং সকলে মনে করেন যে, এই পীড়ায়ই তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই সময়ে, তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ এবং ত্রিশ বৎসর কাল, রাজ্য-শাসন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চারি পুত্রই একবারে সিংহাসনের জন্য পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের এই যুদ্ধ-বিগ্রহ পাঁচ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। অবশেষে আওরঙ্গজেবই সকল ভ্রাতাকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং সম্রাট্ হইয়া বসিলেন। তিনি দারা ও মুরাদকে হত্যা করিলেন। সুজা আসামে পলাইয়া গিয়া আসামরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এবং আসামরাজকর্তৃক সন্তান সন্ততিসহ নিহত হইলেন। সাজাহান তাঁহার মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত সাত বৎসর রক্ষিণে পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দিভাবে ছিলেন। সাজাহান ধেরূপ বীজ বপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যুবাবয়সে পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ এবং আপন ভ্রাতা ও ভ্রাতার সন্তানদিগের প্রাণসংহার করেন। প্রথম দুই ও শেষ দুই মোগল সাম্রাটে কত পার্থক্য!—বাবর পুত্রের জন্ত আপন প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। হুমায়ুন, বারংবার, তাঁহার প্রাণসংহারে উদ্যত বিদ্রোহী ভ্রাতাদিগের সকল অপরাধ মার্জনা করিয়াছিলেন। সাজাহান ও আওরঙ্গজেব আপন আপন পিতার বিরুদ্ধে অস্বধারণ এবং ভ্রাতাদিগের প্রাণসংহার করিলেন।

(৪৩)

আওরঙ্গজেব।

১৬৫৮—১৭০৭

১। আওরঙ্গজেব আকবরের ছায় পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। কিন্তু তিনি কোন অংশেই আকবরের মত ছিলেন না। রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর, তিনি ভয়ে ভয়ে চলিয়াছিলেন। যে সকল বড় বড় রাজপুত সর্দারেরা তাঁহার সৈন্য চালনা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের বিরাগ-ভয়ে ভীত ছিলেন। ভ্রাতাদিগকে পরাভব, বিনাশ ও তাঁহাদিগের সম্ভ্রানদিগকে হত্যা করিতেই প্রথম তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। যাবৎ না এই দুষ্কার্য্য নিঃশেষে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাবৎ তিনি আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারেন নাই। যত কাল, তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন তত কাল তাঁহার মনে এই আশঙ্কা প্রবল ছিল যে, রাজপুতেরা তাঁহার পিতার অনুকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে ফিরিয়া সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। তিনি তাঁহার পিতাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আগ্রার দুর্গে দৃঢ় আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা পরলোক গত হন।



[আওরঙ্গজেব]

২। আওরঙ্গজেব যখন সিংহাসনে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া বুঝিলেন, তখন মনে মনে স্থির

করিলেন যে, তিনি দেশের সমস্ত হিন্দুকে বল পূর্বক মুসলমান করি-
বেন । তিনি স্বয়ং শূন্নি ছিলেন । দেশের সমস্ত সিয়া মুসলমানদিগকে
শূন্নি হইতে বাধ্য করাও তাঁহার অন্য একটি মনোগত সঙ্কল্প ছিল ।
তিনি রাজ-পদে অভিষিক্ত হইবার দশ বৎসর পরে, পূর্ব পূর্ব সম্রাটগণ
কর্তৃক নিযুক্ত প্রায় সমস্ত হিন্দু কর্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহা-
দিগের পদে মুসলমান নিযুক্ত করিলেন । আকবর বহু হিন্দুকে
সরকারী কর্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন । তিনি ঐ সকল লোকের
প্রতি বড়ই সদয়-ব্যবহার করিতেন । রাজপুতেরা আকবরকে ভাল
বাসিত এবং তাঁহার সেই বিরাট-সাম্রাজ্য-গঠনে প্রাণপণে তাঁহার
সহায়তা করিত । রাজপুতেরা আওরঙ্গজেবকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত ।
তাহারা ও অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল ;
এবং কিছু কাল পরে, আকবর যে সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, তাহা
খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল । আওরঙ্গজেব সিয়াদিগের
সহিতও একান্ত মন্দ ব্যবহার করিতেন । আকবর তাহাদিগকে যে
সকল ভূমি দান করিয়াছিলেন, তিনি তৎ সমস্তই, তাহাদিগের নিকট
হইতে কাড়িয়া লইলেন ।

৩। আওরঙ্গজেব হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করিতেন । তিনি বেনারস বা
কাশী ধামের বহু মন্দির ভগ্ন ও পাণ্ডাদিগকে নিহত করেন ; এবং মন্দির
ভগ্ন করিয়া, মন্দিরস্থিত দেবমূর্তি বা বিগ্রহ গুলিকে তাঁহার আপন প্রাসাদে
লইয়া আইসেন । প্রাসাদের দ্বার-দেশে, মাটির নীচে, সে গুলিকে
এমন ভাবে পুতিয়া রাখা হয় যে, কেহই সে গুলির উপরে পান
দিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসিতে পারিত না । তিনি
আরও অনেক স্থানে হিন্দুদিগের বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দেন, তাহাদিগের
কলের গাছগুলি কাটিয়া ফেলেন, এবং দেবমন্দির সমূহে গো হত্যা করিয়া

তিনি হিন্দুদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন ।

আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিষেধ হেতু কোন হিন্দু পাক্ষীতেও বাহির হইতে পারিত না। হিন্দুদিগকে পাদচায়ে ভ্রমণ করিতে হইত।

৪। আকবর যে টেকা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব সেই জেজিয়া কর বা ধর্মের উপর টেকা পুনঃ স্থাপন করেন। দিল্লীর লোকেরা এই টেকা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনায়, তাঁহার রাজ-প্রাসাদ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিয়াছিল। সম্রাট্ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হাতীগুলিকে লইয়া আইসেন এবং নিরাশ্রয় জনতার উপর দিয়া হাতী চালাইয়া দেন। বহুলোক আহত ও নিহত হয়। অবশেষে তিনি সেই পথে মসজিদে যাইয়া নমাজ পাঠ বা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

৫। ঘোষপুরের রাজপুত রাজা সম্রাটের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়া ছিলেন,—“সমস্ত মানব জগৎ যে সকল গ্রন্থকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলিয়া সম্মান করে, সম্রাট্ যদি ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ঈশ্বর, কেবল মুসলমানের নহেন, তিনি সমস্ত মানব-জাতিরই আরাধ্য বস্তু। আপনারা আপনাদিগের মসজিদে যাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, হিন্দুরাও তাহাদিগের মন্দিরে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, তাঁহারই উপাসনা করে। ইহুদি বা খৃষ্টান হউক, অথবা মুসলমান বা হিন্দু হউক, আপনার বৃদ্ধ পিতামহ আকবর, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিই সদয় ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাট্‌দ্বয় আপনকার পিতামহ এবং পিতাও তদ্রূপ। কিন্তু আপনি আপনার হিন্দু প্রজাদিগকে পদতলে দলন করিতেছেন।” ইত্যাদি

৬। আওরঙ্গজেবের সমস্ত প্রজাবর্গ যদি মুসলমান এবং তাঁহার নিজ সুল্লি সম্প্রদায় ভুক্ত হইত, তিনি যদি শাসন-ব্যাপারে একবারে সোজা

পারিতেন। তিনি মদ্যপ্রিয় বা বিলাসাসক্ত ছিলেন না। তিনি নিজের ভোগস্বখের জন্য কপর্দক ব্যয় করিতেন না। আওরঙ্গজেব স্বহস্তে টুপি প্রস্তুত করিয়া, সেই টুপি-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে আপনার ভোজন-ব্যয় নির্বাহ করিতেন এবং পোষাক পরিচ্ছদে তাঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। তিনি সামান্য কাপড় পরিতেন এবং সিংহাসনে বসিবার সময় ব্যতীত, অন্য কোন সময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য আভরণ অঙ্গে ধারণ করিতেন না। তিনি আকবরের স্ত্রীর সাহসী বীর ও অকুতোভয় নির্ভীক সেনা-নায়ক ছিলেন।

৭। দাক্ষিণাত্য জয় করা, আওরঙ্গজেবের সমস্ত জীবনব্যাপি লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। দাক্ষিণাত্যের বাহমনি রাজ্য ভাগিয়া চুরিয়া পাঁচটি নূতন রাজ্যে পরিণত হয়। এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে বিদার, বেরার ও আহম্মদনগর নামক তিনটি রাজ্য আওরঙ্গজেব সম্রাট হইবার পূর্বেই, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে পরাজিত ও দিল্লী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অবশিষ্ট দুই রাজ্য গোলকণ্ডা ও বিজাপুর জয়ের জন্য আওরঙ্গজেবের দৃঢ় সংকল্প হয়। এই দুই পাঠান রাজ্য হস্তগত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সেনা-নায়কেরা ক্রমান্বয়ে পঁচিশ বৎসর কাল যথাশক্তি যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন না। অবশেষে তিনি দেখিলেন যে, যদি এই কার্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে স্বয়ং তাঁহাকে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। অতএব তিনি দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যের সেনা-নিবাস অভিযুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময়, তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর। কিন্তু এই রণ-যাত্রা হইতে তিনি আর দিল্লীতে ফিরিয়া আইসেন নাই। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয়ার্দ্ধ, পঁচিশ বৎসর কাল, দাক্ষিণাত্যের রণক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইয়াছিল। বহু-বৎসর-ব্যাপি যুদ্ধের পর গোলকণ্ডা ও বিজাপুর মোগল হস্তে পতিত ও দিল্লীরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। দিল্লীসাম্রাজ্য এই সময়ে আশ্রিতনে

পূর্ববর্তী সকল সময় অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়া উঠে। গোলকণ্ডা ও বিজাপুর, এই দুই রাজ্যকে তখন মোগল-সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশে পরিণত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই প্রদেশের রাজ-প্রতিনিধি শাসনকর্তাদিগকে প্রথমে নবাব বা সুবাদার বলা হইত, পরে তাঁহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের নিজাম নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহাদিগের রাজধানী শেষে হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৮। এই সময়ে, পশ্চিমঘাট গিরি-অঞ্চলে মহারাষ্ট্র জাতি হইতে অত্র একটা নূতন জাতির অভ্যুদয় ঘটে। এই জাতির নায়কেরা বিজাপুরের রাজগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া, কতকটা দমিত ছিল। কিন্তু বিজাপুরের রাজগণ যখন বিধ্বস্ত ও অপসারিত হইলেন, তখন আওরঙ্গজেব দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও প্রবলতর শত্রু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই শত্রু

মহারাষ্ট্রাদিগের রাজা শিবজী। অত্র অধ্যায়ে শিবজীর ইতিহাস বর্ণিত হইবে। আওরঙ্গজেব শিবজীকে জয় করিতে পারেন নাই।

৯। পঞ্জাবে শিখ নামে আর একটা জাতির অভ্যুত্থান হয়। বাবরের সময়ে, পঞ্জাবে নানক নামে একটি সাধু বাস করিতেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখিতে পাইয়া, চিত্তে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেন। অত-



[নানক]

এব, তিনি এই উভয় জাতিকে মিলাইয়া মিশাইয়া বলহের কারণ দূর

করিবার কামনায় হিন্দুধর্মের কতক ও মুসলমান ধর্মের কতক একত্র মিশ্রিত করিয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। বহুলোক এই নূতন ধর্মে তাঁহার সহিত যোগদান করিল। যাহারা তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া চলিল, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার শিখ বা শিষ্য নামে অভিহিত করিলেন। বাবর এবং তাঁহার পরে যে সকল মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের কেহই এই নূতন সম্প্রদায়ের কোন সংবাদ লন নাই। কারণ, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রীতিমত রাজকর প্রদান করিত, কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করিত না। তাহারা নিতান্ত শান্তস্বভাব ও অহিংস্রক প্রকৃতির লোক ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেন। তিনি তাহাদিগের দলপতি বা গুরু গোবিন্দকে ধরিয়া আনিয়া যার-পর-নাই উৎপীড়ন এবং বহুসংখ্যক শিখকে নিহত করিয়াছিলেন। তাহারা আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ এবং এই সময় হইতে, একটা যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। অবশেষে তাহারা আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, হিমালয় পর্বতে পলাইয়া যায়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই তাহারা আবার ফিরিয়া আইসে এবং কালে উত্তরভারতে সর্বাধিক বলবন্ত জাতিকপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

১০। মহারাট্টাদিগের সহিত বহুবৎসরব্যাপি যুদ্ধের পর, আওরঙ্গজেবের সৈন্ত দল অবশেষে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সে দেশে আহাৰ্য্য বস্তু কদাচিৎ পাওয়া যাইত। শত্রু কর্তৃক কূপ গুলি সমস্তই বিধাক্ত হইয়াছিল; সুতরাং, পানীয় জল প্রায়শঃ মিলিত না। সম্রাটের বয়স তখন নবমি বৎসর; তিনি সাহায্যার্থ মুখাপেক্ষা করিতে পারেন, এমন জন তাঁহার কেহই ছিলেন না। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই তাঁহার এই অফুরন্ত দীর্ঘ রাজত্বে ত্যক্তবিরক্ত। এক জন মহা-

রাটাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন, আর একজন পারস্যে পালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভিজাত সর্দারেরা তাঁহার ভয়ে সতত ভীত ও শঙ্কিত। প্রজাদিগের অধিকাংশই তাঁহাকে অস্ত্রের সহিত ঘৃণা করে। এই অবস্থায়, বৃদ্ধ সম্রাটের ইহলোক ত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। আওরঙ্গজেব অতিবৃদ্ধবয়সে সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও অবসন্ন প্রাণে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তহুত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, সম্বন্ধেই মোগল সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

(৪৪)

ভারতের সহিত ইউরোপের প্রথম বাণিজ্য ।

১। ভারতবর্ষ এক্ষণে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ভুক্ত । ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট্ । ইংরাজেরা কখন ভারতবর্ষে আসিলেন ? তাঁহারা কিরূপে ও কেন আসিলেন ? ভারতবর্ষই বা কিরূপে ইংলণ্ডের রাজার শাসনাধীন হইল ? কিরূপে এই সকল ঘটিল, এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে তাহাই প্রদর্শিত হইবে ।

২। প্রায় তিন শত বৎসর অতীত হইয়াছে, ইংরেজ প্রথম এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসেন । ইউরোপে যে সকল সামগ্রী পাওয়া যায় না, তাহারা সেই সকল জিনিষ ক্রয়ের নিমিত্ত এদেশে আসিয়াছিলেন । পিপ্পল, গোলমরিচ, তণ্ডুল, কার্পাস, নীল, আদা, মসলা, নারিকেল, এবং যাহা হইতে অহিফেণ ও চিনি প্রস্তুত হয়, সেই পোস্ত ও ইক্ষু প্রভৃতি ইংলণ্ডের গ্রাম শীতপ্রধান দেশে জন্মে না । প্রাচীন কালে এদেশে বেক্রপ সুন্দর মসলিন বা মলমল এবং কার্পাস ও রেশমী কাপড় প্রস্তুত হইত, ইংলণ্ডে তাহা হইত না । ইংরেজ বণিকেরা এই সকল জিনিষ এদেশ হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন এবং তাঁহারা আবার স্বদেশ হইতে পশমী কাপড়, তাম্র, পারদ, লৌহ এবং ইম্পাত-নির্মিত বিবিধ দ্রব্য এদেশে লইয়া আসিতেন । এদেশে ঐ সকল সামগ্রী পাওয়া যাইত না ।

৩। প্রাচীন কালে ভারত হইতে বাণিজ্য দ্রব্য উষ্ট্র বা খচ্চরে

পৃষ্ঠে, স্থল-পথে বহিয়া লওয়া হইত । এই বাণিজ্য পথের একাংশ, আফ্গানিস্তান, পারস্ত ও এসিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া ছিল । কিন্তু আরবেরা এই সকল দেশ জয় করিলে, এই বাণিজ্যের অধিকাংশই রুদ্ধ হইয়া যায় । পুরাতন পথে ইউরোপের খৃষ্টান বণিকেরা তাঁহাদিগের বাণিজ্য দ্রব্য পাঠাইতে পারিতেন না । কারণ, শত শত বৎসর ব্যাপিয়া, আরব ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছিল ।

৪ । এইরূপে ইউরোপীয় বণিকেরা প্রয়োজনীয় বাণিজ্য-দ্রব্য স্থল-পথে আমদানী রপ্তানী করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলে, সমুদ্র-পথে মাল চালাইবার জন্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল ।

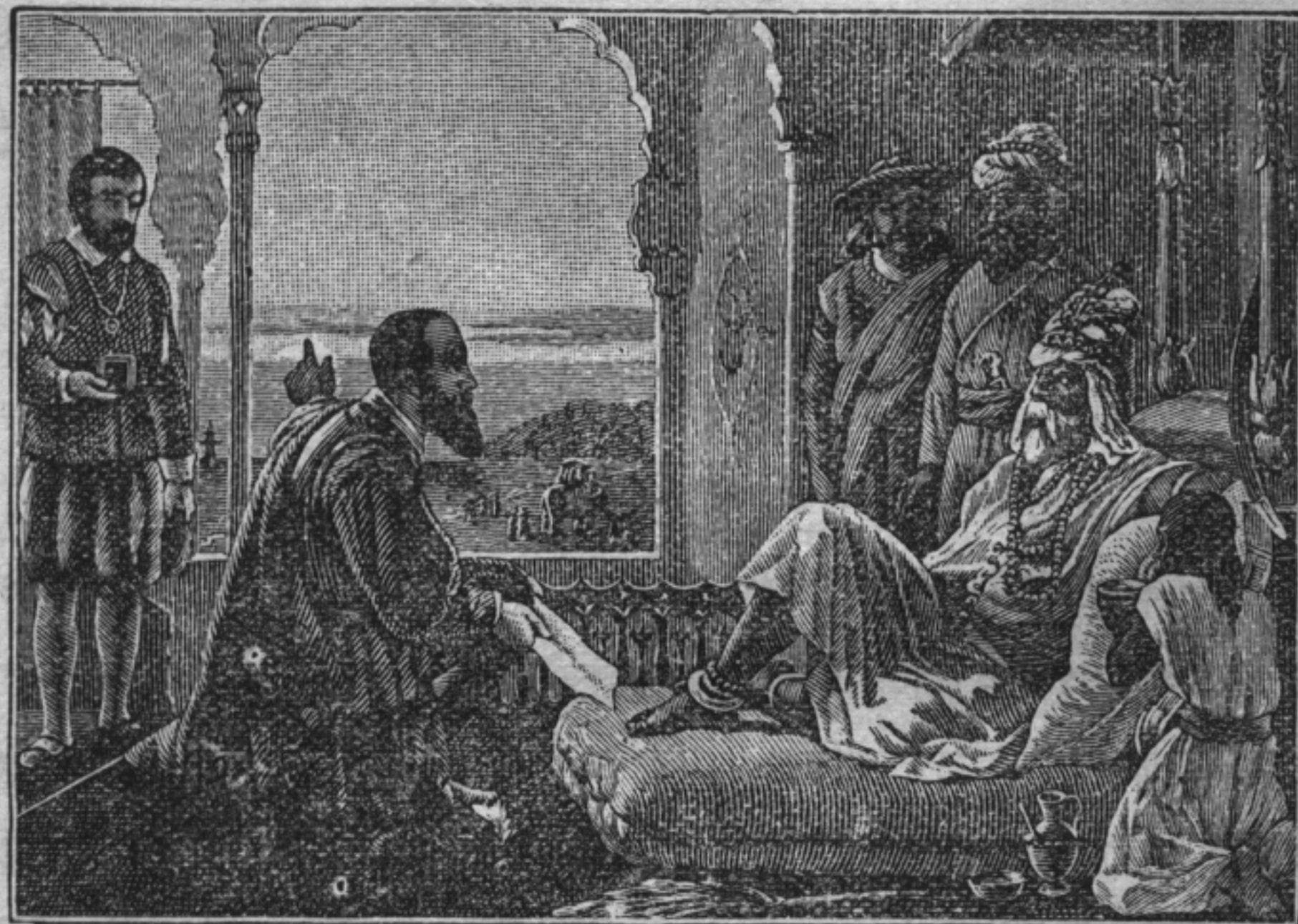
৫ । সে কালে সমুদ্র-পথে আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়া ঘুরিয়া ভারতে যাতায়াতের পথ ছিল । পর্তুগিজেরা এই পথ আবিষ্কার করেন । তাঁহাদিগের জাহাজ আফ্রিকার উপকূল ঘুরিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে সমগ্র আফ্রিকা বেষ্টন পূর্বক ভারত সাগরে আইসে । ভাস্কোডি গামা নামক তাঁহাদিগের কাপ্তান জাহাজ লইয়া, পরিশেষে ভারতের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হন । ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয় । তিনি পশ্চিম উপকূলস্থিত কালিকটে অবতরণ করেন ।

৬ । কালিকটের রাজার নাম জামোরিন । তিনি পর্তুগালের রাজার নামে একখানি পত্র লিখিয়া ভাস্কোডি গামাকে দেন । এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—“আমার রাজ্যে, দারু-চিনি, লবঙ্গ, আদা, গোল-মরিচ ও পিঙ্গল প্রভৃতি যথেষ্ট আছে । আমি আপনার রাজ্য হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, ঔষধ ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করি ।”

৭ । পরবর্তী ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, শত বৎসর কাল, একমাত্র পর্তুগিজেরাই সমুদ্র-পথে ভারতের সমস্ত বাণিজ্য আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন । তাঁহারা গোয়া নগরে একটি দৃঢ় দুর্গ নিৰ্ম্মাণ

করেন । এই নগর এখনও পর্তুগিজদিগের অধিকারে আছে ।

৮। ভারতীয় বাণিজ্যে পর্তুগিজদিগের প্রচুর লাভ দেখিতে পাইয়া ইউরোপের অন্যান্য জাতিসমূহও এই বাণিজ্যের অংশলাভার্থ যত্ন করা আবশ্যক মনে করেন। স্মতরাং হলণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক,



[ভাস্কোডি গামা এবং জামোরিন]

জার্মানী ও স্মইডেনের বণিকেরা আপন আপন বাণিজ্য-তরি ভারত অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত তিন দেশের বণিকেরাই মাত্র এই বাণিজ্যে লাভবান হইয়াছিলেন। ডেনিস, জার্মান, স্মইডিনেরা কোন লাভ করিতে না পারিয়া, কিছু দিন পরে, ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন।

৯। পর্তুগিজদিগের পরেই ডচ্ বা ওলন্দাজেরা ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা ইউরোপস্থিত হলণ্ড নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী। ডচেরা এক্ষণ অত্যন্ত হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্বে, তাঁহাদের জাহাজই ইউরোপে সর্বোৎকৃষ্ট এবং ডচ্ নাবিকেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক রূপে গণ্য ছিল। ডচেরা পর্তুগিজগণ

অপেক্ষা অধিকতর প্রতাপশালী ছিলেন। অতএব, তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই, গোয়া ভিন্ন অন্ত্র সমস্ত ষ্টেশন, আড্ডা বা মোকাম হইতে পর্তুগিজ-দিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৬০০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরবর্তী একশত বৎসর কাল, প্রায় সমগ্র মঙ্গলার বাণিজ্য, তাঁহারা আপনাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোচিন্, সিলোন এবং জাবা ও সুমাত্রা দ্বীপে তাঁহাদিগের প্রধান বাণিজ্য স্থান বা মোকাম ছিল।

(৪৫)

সম্মিলিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের প্রায় একশত ইংরেজ বণিক্ ভারতে বাণিজ্য করিতে রুতসঙ্কল্প হন। তাঁহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ইংরেজ কোম্পানি নামে একটা কোম্পানি গঠন করিয়া, ভারতে বাণিজ্য-তরি প্রেরণার্থ ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের অনুমতি গ্রহণ করেন। তখন মোগল সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানি, পশ্চিম উপকূলে সুরাট নগরে বাণিজ্য দ্রবোর এক কুঠী স্থাপন করেন। কারণ, সুরাট নগরই তখন ভারত-সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল। তাঁহারা সমগ্র বৎসর ভরিয়া দেশীয় বাবসায়ীদিগের নিকট যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তৎসমস্ত ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিয়া না পঁহুঁচা পর্য্যন্ত ঐ সুরাটের কুঠীতে সঞ্চিত থাকিত। ইংলণ্ড হইতে জাহাজগুলি যে সকল দ্রব্য লইয়া আসিত, তাঁহারা সেই সকল দ্রব্য ঐ কুঠীতে রাখিয়া দিতেন, এবং সময় সময় বিক্রয় করিতেন। বাণিজ্যদ্রব্য ও আপনাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা কুঠীর চতুর্দিকে দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া উহার উপরে বড় বড় কামান সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন।

২। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি ভারতীয় বাণিজ্যে এত দূর লাভবান হইয়া

উঠিলেন যে, অন্যান্য ইংরেজ বণিকেরাও ঐরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোম্পানি গঠন করিয়া, ঠিক ঐ প্রণালীতেই ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন । অবশেষে শত বৎসর পরে, এইরূপে গঠিত বিভিন্ন কোম্পানি একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় ; এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই বৃহৎ কোম্পানি সম্মিলিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি নাম ধারণ করিয়া, ইংলণ্ডের রাজা হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হয় ।

৩। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি মাদ্রাজ ক্রয় করেন । মাদ্রাজ তখন একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল । এইখানে সমুদ্র হইতে মৎস্ত ধরা হইত । কোম্পানি এই গ্রামখানি, কর্ণাটকস্থিত, কোন গিরিছর্গের সর্দার, চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন । ইংরেজেরা এইখানে ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামে একটা দৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন । ক্রমে এইখানে বহু হিন্দু আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন । তাঁহাদিগের এক উদ্দেশ্য ইংরেজের সহিত বাণিজ্য করা, অন্য উদ্দেশ্য ইংরেজদিগের দুর্গস্থিত কামানের আশ্রয়ে নিরাপদে থাকা । মাদ্রাজের যে স্থানে এই সকল হিন্দু আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, সেই স্থানের নাম রাখা হয় “ব্লেক টাউন” বা কৃষ্ণ পল্লী ।

৪। বঙ্গে প্রথমতঃ পর্তুগিজদিগের অধিকারে ছিল । দ্বিতীয় চার্লস্ নামক ইংলণ্ডের রাজা পর্তুগালের এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন । কন্যার পিতা যোতুকের এক অঙ্গরূপে, বঙ্গে নগরটি ইংরেজ রাজকে দান করিয়াছিলেন । ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয় । ছয় বৎসর পরে, দ্বিতীয় চার্লস্ ইহার বার্ষিক কর ১০ পৌণ্ড ধাৰ্য্য করিয়া কোম্পানির নিকট ইহা বিক্রয় করেন । ইহার নিকটে অতি সুন্দর একটা পোতাধিষ্ঠান বা সমুদ্রের কোল ছিল । সম্বন্ধেই বঙ্গে একটা বড়

অধিষ্ঠিত হইলেন। কিছু কাল পরে, ইংরেজেরা তাঁহাদিগের সমস্ত বাণিজ্য-ব্যাপার বা কারবার স্মরাট হইতে তুলিয়া আনিয়া, বম্বে নগরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মাজাহানের রাজত্বকালে, ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে, মাদ্রাজ ক্রয় করিবার পর-বৎসর, ইংরেজেরা গঙ্গার মোহনা হ্রগলিতে একটা কুঠী স্থাপন করেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, তাঁহারা হ্রগলি অপেক্ষাও গঙ্গার মুখের অধিকতর নিকটে তিনটি গ্রাম ক্রয় করিলেন। ইহারই একটির নাম কালীঘাট। ইহাই শেষে কলিকাতা নামে পরিচিত হইয়া উঠে। এইস্থানে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করেন।

৫। ইংরেজদিগের কেবল এই কএকটি কুঠীই ছিল, এমন নহে। পূর্ব উপকূলে তাঁহাদিগের একটা কুঠী ছিল, মাদ্রাজের দক্ষিণে ফোর্ট সেন্ট্‌ডেভিড্‌ নামে দুর্গ, মণ্ডলিপতনে আর একটা কুঠী এবং বঙ্গদেশে,—পাটনা, ঢাকা ও বাঙ্গলার নবাবের তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কাশীমবাজারেও তাঁহাদিগের কুঠী ছিল।

৬। ইংরেজেরা যখন ভারতে আইসেন, প্রায় সেই সময়েই ফরাশিরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ফরাশিদিগেরও কতিপয় প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল। পশ্চিম উপকূলে মাহি, পূর্ব উপকূলে, মাদ্রাজের দক্ষিণে পন্ডিচারী, এবং বাঙ্গলায় কলিকাতা হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরবর্তী চন্দন নগর তাঁহাদিগের প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠে।

৭। ডচ্‌ বা ওলন্দাজেরাও ভারতে কএকটা বাণিজ্য-স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পশ্চিম উপকূলে কোচিন, পূর্ব উপকূলে, মাদ্রাজের উত্তরে পলিকট এবং বাঙ্গলায় চন্দননগরের নিকটে চিন্সুরা, তাঁহাদিগের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল।

(৪৬)

শিবজির অভ্যুত্থান ।

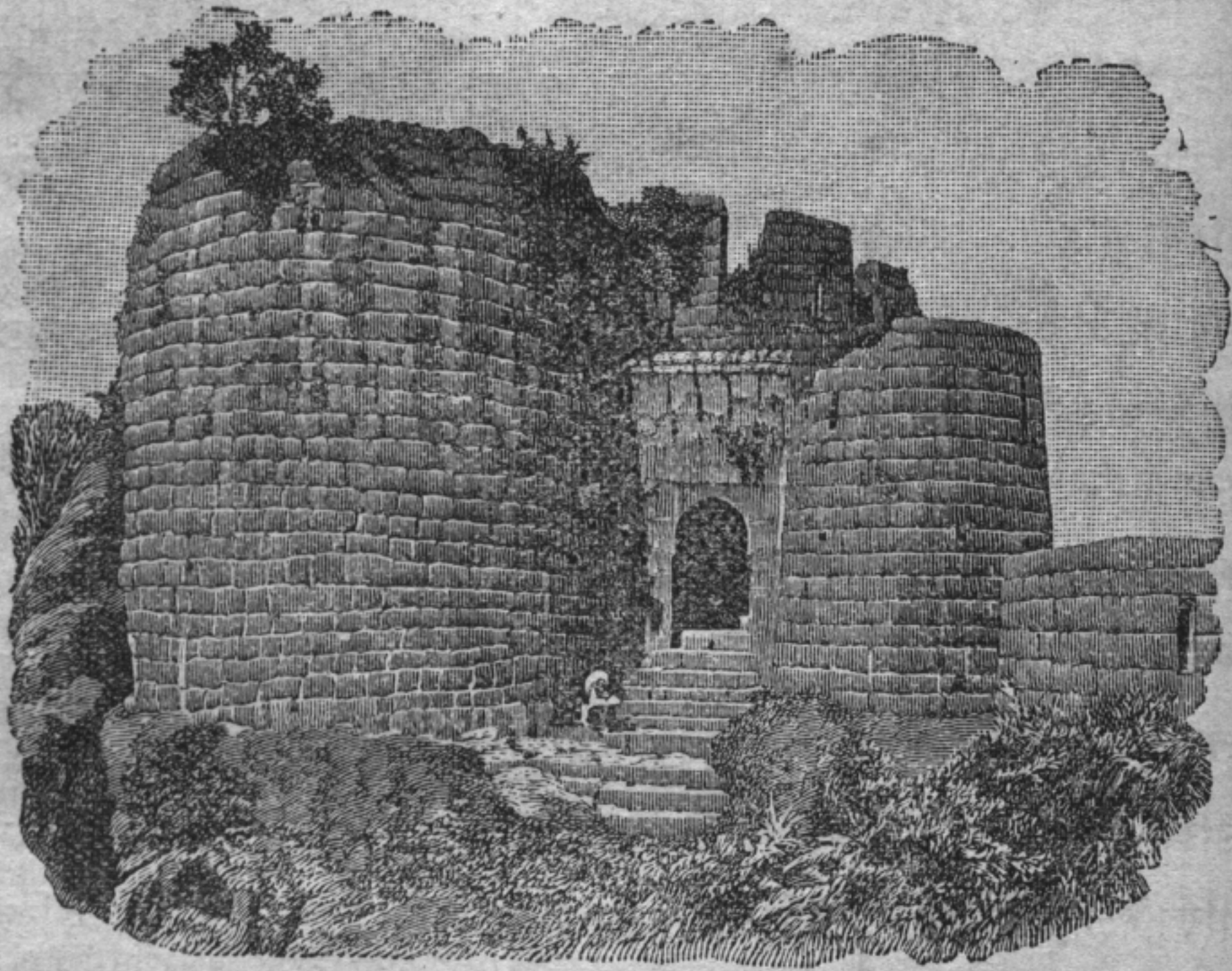
মহারাষ্ট্রাগণ ।

১৬২৭—১৬৮০ ।

১। পশ্চিমভারতের পার্শ্বত্যাগ্রদেশে মহারাষ্ট্রাগণ বাস করিত । যে প্রদেশের বর্তমান নাম বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, উহাই মহারাষ্ট্রাদিগের দেশ ছিল । মহারাষ্ট্রারা ক্ষুদ্রকায় ও দৃঢ় এবং সাহসী ও কস্মঠ । তাহারা সামান্য আহার, বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদে পরিতৃপ্ত ছিল । তাহাদিগের দেশ পর্বতপূর্ণ । প্রাচীন কালে তাহাদিগের দেশে পথ ঘাট ছিল না । পর্বত বা পাহাড়গুলি নিবিড় অরণ্যে আবৃত ; প্রায় প্রত্যেক পর্বতেরই শীর্ষদেশে এক একটি দুর্গ ; এবং প্রত্যেক দুর্গে এক একজন ক্ষুদ্র সর্দার অবস্থিত ছিলেন । তিনি গিরি-দুর্গে থাকিয়া নিম্ন দেশবাসী গ্রাম্য লোকদিগের উপর শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন । এই সকল সর্দারেরা দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজাদিগকে কর দিয়া আসিতেছিলেন ; এবং সর্ববিষয়ে তাহাদিগের আজ্ঞাধীন ছিলেন । তাহারা প্রতিনিয়ত মুসলমান-রাজাদিগের সেনাদলে থাকিয়া, মোগল সম্রাটদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছেন । ভিন্ন ভিন্ন মহারাষ্ট্রা সম্প্রদায় অবশেষে একজন সর্দারের যত্নে এক জাতিতে পরিণত হয় । এই সর্দারের নাম শিবজি ।

২। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শিবজির জন্ম হয় । এই বৎসরই সম্রাট সাজাহান মোগল-সিংহাসনে আরোহণ করেন । শিবজির পিতা বিজাপুরের রাজ-সরকারে কাজ করিতেন । তিনি পুত্র শিবজিকে শিক্ষার্থ পুনায় রাখিয়াছিলেন । বালক শিবজিকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয় নাই । কারণ, তখন লেখা পড়া কেবল ব্রাহ্মণ কেরাণীর

কর্মরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু শিবজি অশ্বারোহণ, শিকার, মল্লক্রীড়া, তীর ও বল্লম নিক্ষেপ এবং অসি ও ছোরা চালনায় বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন। পুরাতন কালের হিন্দু বীরদিগের বীরগাথা গুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। একদিন তাঁহারা যাদুক কন্ঠের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তাদৃক কার্য দ্বারা নাম ও যশ উপার্জনের জন্য মনে প্রাণে উৎসুক হইয়া উঠিলেন।



[শিবজির পুরন্দরের কেল্লা]

৩। অধিকাংশ মহারাট্টা সর্দারই নিম্নভূমিতে, যখন যেখানে সুবিধা ঘটিত, সেই খানেই দস্যবৃত্তি ও লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। শিবজি সর্বদাই তাহাদিগের সঙ্গে যাইতেন। এইরূপে শিবজি যখন মাত্র কুড়ি বৎসরের যুবক, তখন স্বয়ংই একদল বীর-যুবাব দলপতি ও চালক হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমতঃ পুরন্দরের সুদৃঢ় গিরি-ভূর্গ অধিকার করেন,

ইহার পরে এক গিরি-ভূর্গের পর আর এক গিরি-ভূর্গ তাঁহার হস্তগত হইতে থাকে। তিনি এইরূপে বহু অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করেন এবং চারিদিকে তাঁহার বশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

৪। বিজাপুরের রাজা শিবজির এইরূপ অভ্যুদয়-দর্শনে একটু শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি শেষে তাঁহার বিরুদ্ধে আফজুলখাঁ নামক একটি সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। শিবজি সেনাপতির আগমনে একান্ত ভয়ের ভাণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে খাঁ সাহেবের বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সেনাপতি মহাশয় নিরস্ত্র ও একাকী না আসিলে, তিনি তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী নহেন। খাঁ সাহেব তাঁহার কথায় প্রত্যয় করিলেন এবং পাতলা মসলিন্ বা মল মল নিষ্পিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রক্ষাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, একটি মাত্র সঙ্গীসহ, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেলেন। ধূর্ত মহারাষ্ট্র-যুবা আপনার পরিচ্ছদের নীচে শৃঙ্খল নিষ্পিত বস্ত্র ধারণ করিয়া, হাতের তলায় ইম্পাত-নিষ্পিত ধারাল নখর লাগাইয়া এবং আস্তিনের নীচে ছোরা লুকাইয়া রাখিয়া প্রস্তুত ছিলেন। খাঁ সাহেব যেই তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, অমনই তিনি ব্যাঘ্রের তায় লক্ষ্য দিয়া, তাঁহার উপরে পড়িলেন এবং প্রথর নখর তাঁহার শরীরে বসাইয়া দিয়া, ছোরা দ্বারা চক্ষুর পলকে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। শিবজির লোকেয়া গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছিল। তাহার মহাবেগে মুসলমান সেনাদিগের উপরে পতিত হইল। মুসলমান সৈন্যগণ যুদ্ধাশ প্রস্তুত ছিল না, তাহার ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

৫। শিবজি ইহার পরে, দেশকে দেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় সমস্ত মহারাষ্ট্র সর্দার আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের প্রধান মহারাষ্ট্র-নায়ক-জ্ঞানে তাঁহার দলে দলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবজি মুসলমান-

দিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি দেশ ভরিয়া ইহাই প্রচার করিয়া দিলেন যে, তিনি গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজারা, আওরঙ্গজেবের সৈন্তসহ যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; সুতরাং তাহারা শিবজিকে বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত শক্তিপ্রয়োগে সমর্থ হন নাই। শিবজি ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে, বিজাপুরের রাজা তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। এইসন্ধিতে তাঁহাকে পশ্চিম উপকূলস্থিত কঙ্কণ প্রদেশের শাসন-কর্তা বলিয়া স্বীকার করা হইল।

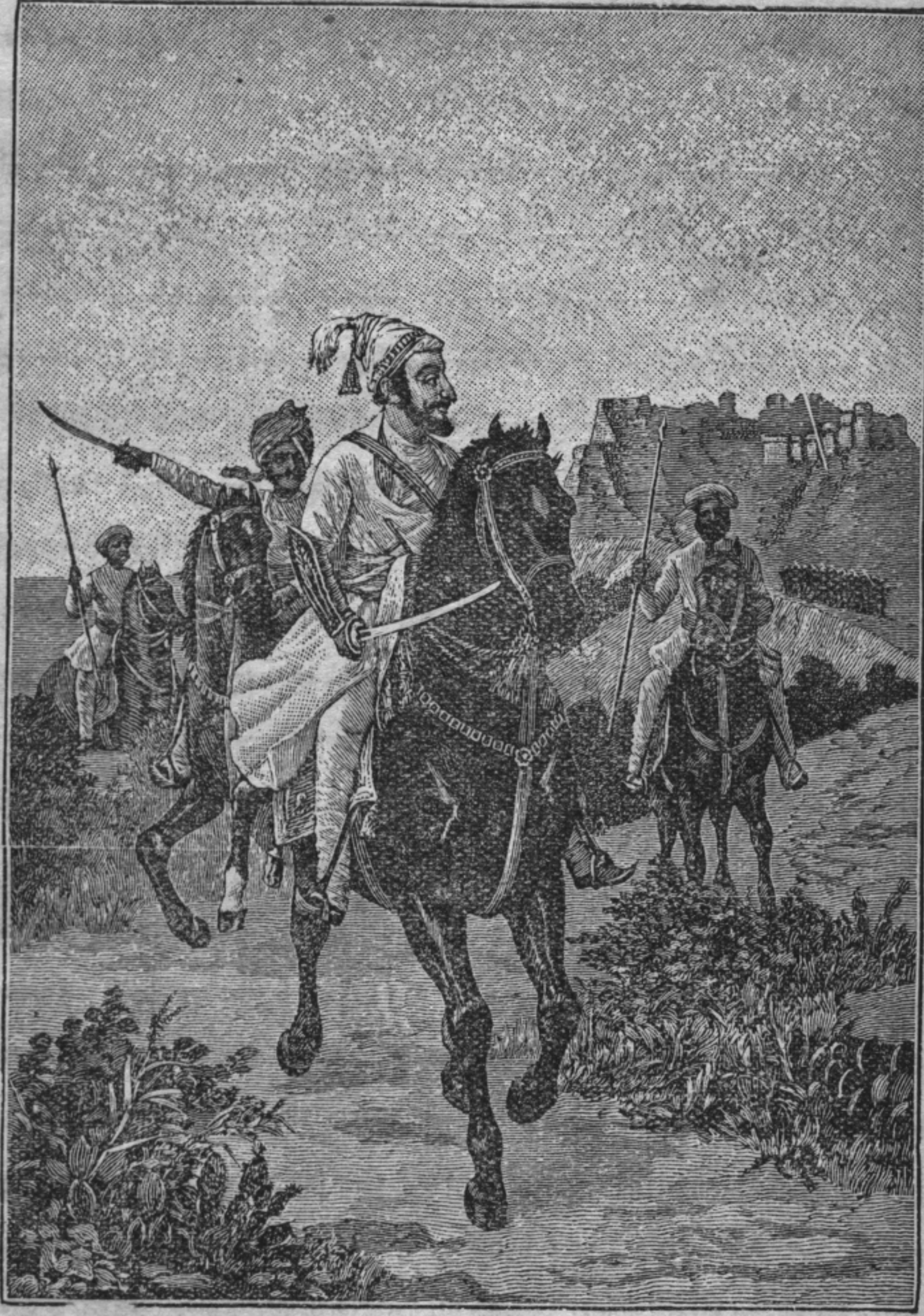
৬। সম্রাট আওরঙ্গজেবও মহারাটা সর্দারের এইরূপ অভ্যুদয়ে ভীত হইলেন এবং তাঁহার খুল্লতাত দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বা রাজ-প্রতিনিধি সায়স্তা খাঁকে বৃহৎ একদল সৈন্ত সহ শিবজির বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। শিবজি জানিতেন যে, একরূপ বলশালী শত্রুর সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া, কোন ফললাভের আশা নাই। অতএব তিনি ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিলেন এবং তাঁহার ২০ জন সহচরকে তাঁহার স্ত্রীর ভিক্ষুকের বেশে সাজাইয়া লইয়া, রাত্রিকালে গুপ্তভাবে পুনা নগরে উপস্থিত হইলেন। পুনার উপস্থিত হইয়া যে গৃহে সায়স্তা খাঁ বাস করিতেন, সেই গৃহের নিকটে যাইয়া পহুঁচিলেন; অবশেষে নৈশ-অন্ধকারে মহাবেগে ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া, সায়স্তা খাঁকে প্রায় মারিয়া ফেলিতেছিলেন; এমন সময়, সায়স্তা খাঁ টের পাইলেন এবং জানালা বা গবাক্ষ হইতে লক্ষ্য দিয়া, বাহিরে পড়িয়া প্রাণে রক্ষা পাইলেন। তিনি যখন লক্ষ্য দিয়া, নীচে পড়িতেছিলেন, তখন শিবজি তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে অতি নিকটে ছিলেন। শিবজি কর্তৃক তাঁহার অঙ্গুলি ছেদিত হইয়াছিল। ইহার পরে, মহারাটাগণ যেমন দ্রুত ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া প্রস্থান

করিল। কিন্তু সামন্তা ঠাঁ এমন ভয় পাইলেন যে, তিনি পুনা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শিবজিও আবার স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, দেশে নূতন নূতন স্থান জয় করিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন।

৭। অনন্তর শিবজি একদল সৈন্যসহ সুরাট নগরে যাইয়া উপস্থিত হন। সুরাট পশ্চিম উপকূলের একটি সমৃদ্ধ বন্দর। শিবজি ক্রমে ছয় দিন এই নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সুরাটে ইংরেজদিগের একটা কুঠী ছিল। কিন্তু তিনি এই কুঠী আক্রমণ করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই; ইংরেজ কর্তৃক তাড়িত হইয়াছিলেন।

৮। অতঃপর আওরঙ্গজেব আর একটা বৃহৎ সেনাদল শিবজির বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। এবার শিবজি সম্রাট সমীপে এই প্রার্থনা জানান যে, সম্রাট যদি মহারাষ্ট্র দেশের একাংশ তাঁহার অধিকারে থাকিতে দেন, এবং মোগল সেনার মধ্যে তাঁহাকে সেনা-নায়কের উচ্চ সম্মান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে সম্মত আছেন। এই প্রস্তাবে আওরঙ্গজেব সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু এই উপায়ে শিবজিকে একবার হাতে পাইতে পারিলে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবেন, ইহাই আওরঙ্গজেবের মনোগত অভিপ্রায় ছিল। শিবজি দিল্লীতে যাইয়া আওরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি দরবারে যাইয়া একরূপ মন্দ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার জীবন বিপন্ন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। অতঃপর, তিনি পীড়িত, এই সংবাদ প্রচার করিয়া, একগৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিলেন। মোগল সেনা সেই গৃহের চতুঃপার্শ্বে প্রহরিক্রমে স্থাপিত হইল। কিন্তু শিবজি একটা বুড়ীর মধ্যে লুকাইয়া ঐ প্রহরিবেষ্টিত গৃহ হইতে নিরাপদ স্থানে বাহিত হইলেন। প্রহরীরা ঐ বুড়ী সন্দেহপূর্ণ

খপ্পর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, মস্তক ও দাড়ি গোঁফ মুড়াইয়া



[অশ্বপৃষ্ঠে শিবজি]

ফেলিলেন, সমস্ত শরীরে ভস্ম মাখাইলেন এবং তিনি কে, যে

কোন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে সমর্থ না হয়, এই ভাবে হিন্দু ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া, স্বদেশে পালাইয়া গেলেন।

৯। ইহার পরে, আওরঙ্গজেব পুনঃ পুনঃই মধুর কথায় ভুলাইয়া শিবজিকে ফাঁদে ফেলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে কোন কৌশলে আবার রাজ-দরবারে আনিবার জন্ত বহুপ্রকারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। শিবজি আর কখনও আওরঙ্গজেবের কথায় প্রত্যয় করিয়া তাঁহার করায়ত্ত হন নাই।

১০। শিবজি অতঃপর মহারাষ্ট্রাদিগের রাজ্যরূপে অভিষিক্ত হইয়া বৃহৎ এক দল সেনাসহ দক্ষিণ দিকে বহুদূর অভিযান করেন। তিনি মাল্ভাজের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু মাল্ভাজ-নগর আক্রমণ করেন না। তিনি ক্রমে মহীশূরের সমস্ত দুর্গ এবং কর্ণাটক,—জিজি, ভেলোর, আর্নি, বাঙ্গালোর ও বেলারী অধিকার করিয়া, আঠার মাস পরে পুনরায় ফিরিয়া আইসেন। শিবজি এইরূপে যে সকল রাজ্যের মধ্য দিয়া অভিযান করিয়াছিলেন, সেই সকল রাজ্যের শাসনকর্তারা সকলেই, তাঁহাদিগের রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বা চৌথ কর স্বরূপ তাঁহাকে দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

১১। এই ঘটনার অল্পকাল পরে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে শিবজি পরলোক গমন করেন। অল্প কোন মহারাষ্ট্রা সর্দারই শিবজির ত্রায় কোশলী, চতুর ও কর্মক্ষম হইতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রা-গণ শিবজির বহুমূর্তি অঙ্কিত করাইয়া রাখিয়াছেন। এই সকল মূর্তিতে প্রায়ই দেখান হইয়াছে যে, শিবজি অশ্বারোহণে চলিয়া যাইতেছেন, এবং সেই চলন্ত অবস্থায়ই মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল মুখে নিক্ষেপ করিয়া খাইয়া ফেলিতেছেন। কারণ, আহারের জন্তও তাঁহার ক্ষণকাল থামিয়া থাকিবার সময় ছিল না।

১২। শিবজির পুত্র শম্ভুজি, পিতৃপদে মহারাষ্ট্রাদিগের রাজ্যরূপে

অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি কোন অংশেই পিতার সদৃশ ছিলেন না। শত্ৰুজি নির্ধুর ও অলস; তিনি সম্বন্ধেই আওরঙ্গজেব কর্তৃক বন্দীকৃত ও নিহত হন।

(৪৭)

মোগল সাম্রাজ্যের পতন।

১৭০৭—১৭৪৮।

১। মোগল সম্রাট্ সর্বসাকল্যে পন্ন জন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম ছয় জন, যথার্থ প্রতাপশালী ও ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন, এবং প্রকৃতই সম্রাটের ন্যায় রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই ছয় জনের শেষ সম্রাট্, আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেবের সময়েই মোগল সাম্রাজ্য আয়তনে পূর্ববর্তী সকল সময় অপেক্ষা বৃহত্তম হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার



[বাহাদুর শা]

কু-শাসনে সাম্রাজ্যের সর্বত্রই প্রবল শত্রুর অভ্যুত্থান হয়। শিখ, রাজপুত ও মহারাট্টাগণ সকলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মহারাট্টা-দিগকে দমন করিবার অভি-প্রায়ে, আওরঙ্গজেব তাঁহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর রণ-ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা কোন অংশেই ফলবতী হয় নাই।

২। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর শা নাম ধারণ করিয়া, সিংহাসনে

অধিকৃষ্ট হন । কিন্তু তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহার পরে, সাত বৎসর সময়ের মধ্যে অন্যান্য তিন জন রাজা দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন । রাজদরবারের ক্ষমতাশালী অভিজাতগণ কর্তৃক তাঁহারা সিংহাসনে স্থাপিত, তৎপর অবতারিত এবং ক্রমে নিহত হইয়াছিলেন । আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর বার বৎসর পরে, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ নামক তাঁহারই জনৈক বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় । তিনি পরবর্তী ত্রিশ বৎসর কাল, অর্থাৎ ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাম মাত্র মোগল সম্রাট ছিলেন ।

৩। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে, বড় বড় প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক সুবাদার বা রাজপ্রতিনিধিই, সম্রাটের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপন আপন প্রদেশের স্বাধীন শাসন-কর্ত্তা হইয়া উঠেন । তাঁহারা তখনও সম্রাটসমীপে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন বটে, কিন্তু সে রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না ; যাহার যাহা দিতে ইচ্ছা হইত, তিনি তাহাই পাঠাইয়া দিতেন । প্রত্যেক সুবাদার এখনও দিল্লীর সম্রাটের প্রতি অধিরাজরূপে প্রাপ্ত বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু



[মহম্মদ শাহ]

সম্রাট এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে, কেবল দিল্লীরই রাজা ছিলেন ।

৪। এইরূপে, রাজ্যের অধিকাংশ নবাবও আবার উপরিস্থ সুবাদারের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া, স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন ।



[নিজাম উল্‌মুল্ক]

যদিও তাঁহাদিগকে সুবাদারের অধীন বলা হইত ; তাহারা বস্তুত আপনারাই আপনাদিগের প্রভু ছিলেন ।

৫। উত্তরভারতে অযোধ্যার সুবাদার, বাঙ্গালা ও বিহারের নবাব দক্ষিণে হায়দরাবাদের সুবাদার, (তিনি নিজাম উল্‌মুল্ক, বা রাজ্যের নিয়ামক এই উপাধি গ্রহণ করেন) এবং কর্ণাটকের নবাব, সুবাদার ও নবাবদিগের মধ্যে, ইহঁারাই প্রধান ছিলেন ।

(৪৮)

মহারাট্টা রাজ্যের উৎপত্তি ।

১৭০৮—১৭৪৮ ।

১। পূর্বেই দেখান হইয়াছে,—শিবজি মহারাট্টাদিগকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে দস্যুভাবে চালনা করিয়া, কিরূপে দেশ লুণ্ঠন করিতে হয়, বিলক্ষণরূপে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন । এই উপায়ে টাকা সংগ্রহ করা কেমন সহজ, ইহা বখন তাহারা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন আর কোন কথা রহিল না ; তাহারা প্রতিবর্ষেই এই কন্ঠে বাহির হইতে আরম্ভ করিল । বৎসরের ফসলটি ঘরে আসিলে ও বর্ষার বৃষ্টি বাদল থামিয়া গেলেই তাহারা বৃহৎ বৃহৎ দলে দলবদ্ধ হইয়া ও অশ্বশস্ত্র লইয়া বহির্গত হইত এবং সমস্ত মধ্যভারত লুণ্ঠন করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত ।

২। কিছুকাল পরে, তাহারা অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিল এবং বিক্রা পর্বতের উত্তরবর্তী দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে তাহারা যাইত, সেই খানেই দেশের শাসন-কর্তার নিকটে, রাজ্যের এক চতুর্থাংশ বা চৌথ দাবি করিত। যদি এই চৌথ তাহাদিগকে দেওয়া না হইত, তাহা হইলে, তাহারা লোকের প্রাণ সংহার করিত এবং যাহা কিছু সম্মুখে পাইত, লুণ্ঠিয়া লইয়া যাইত।

৩। আওরঙ্গজেব শিবজির পুত্র শম্ভুজিকে ধরিয়া নিয়া হত্যা করেন। কিন্তু শম্ভুজির শিশু পুত্রটিকে তিনি নিজ দরবারে রাখিয়া প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব শিবজিকে চোর বলিতেন, তিনি এই বালককে সাহু অর্থাৎ সাধু বলিয়া ডাকিতেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে, এই সাহু বা সাধু মহারাট্টাদিগের রাজা হইয়াছিলেন। আওরঙ্গ-জেবের মৃত্যু হইলে, সাহুকে তাঁহার স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সাহু সেতারায় আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়া, মোগল সম্রাটের অধীন রাজ্যরূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

৪। কিন্তু সাহু বড় দুর্বল প্রকৃতি ও অকর্মণ্য রাজা ছিলেন। তিনি নিতান্ত সুখ-বিলাসী ও আমোদ-প্রিয় ; সুতরাং শ্রম-সাধ্য কঠোর কর্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা সপিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। এই মন্ত্রীকে পেশোয়া বলা হইত। পেশোয়াপদ পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে রাজপদের ত্রায় পেশোয়াও বংশগত ও পুরুষানুক্রমিক হইয়া উঠে। অবশেষে, পেশোয়াই মহারাট্টাদিগের প্রকৃত প্রভু হইয়া পড়েন। পেশোয়া যদিও কেবল রাজার স্থলবর্তিক্রমে রাজার নামে শাসন করিতে-ছেন বলিয়া ছল করিতেন, তথাপি সমগ্র মহারাট্টা জাতি তাঁহাকেই

করিতেন, সন্ধি করিতে হইলেও, তাঁহারই সম্মতিতে তাহা হইত। সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ বা মহারাট্টা রাজ্য তাঁহারই শাসনাধীন ছিল।

৫। প্রথম পেশোয়া বালজি রাও। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বৎসর, সাহু তাঁহাকে পেশোয়া পদে বরণ করেন। বালজি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রীর কাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মহম্মদ শাকে বাধ্য করিয়া, সমগ্র দাক্ষিণাত্যের উপর চৌথ আদায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৬। দ্বিতীয় পেশোয়া বাজি রাও। তিনি ১৭২০ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাট্টা রাজ্য শাসন করেন। তিনি প্রধান প্রধান মহারাট্টা দলপতিদিগের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চৌথ আদায়ের জন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে মহারাট্টাদিগকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত, মহম্মদ শা তাহাদিগকে দিল্লী ভিন্ন অন্য সমস্ত স্থানে চৌথ আদায়ের অনুমতি দেন। মহম্মদ শা পুরাতন মোগলসাম্রাজ্যের নাম-মাত্র অধিকারী হইলেও, মহারাট্টাগণ, মহম্মদ শাহের এই অনুমতিতেই ভারতের সমস্ত প্রদেশে তাহাদিগের চৌথ আদায়ের অধিকার জন্মিয়াছে বলিয়া দাবি করিত।

৭। এই পেশোয়ার সময়ে, ৫টা বৃহৎ মহারাট্টা রাজ্য গঠিত হয়। প্রধান প্রধান মহারাট্টা দলপতিরা যেখানকার সুবাদার বা নবাবকে একটুকু হীনবল ও তাহাদিগের গতিরোধে অসমর্থ বলিয়া বুঝিত; সেখানে শুধু চৌথ আদায় করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত না, সেই সুবাদার বা নবাবকে তাঁহার রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া, আপনারাই সেই রাজ্যের শাসনকর্তা হইয়া বসিত।

৮। এক্ষণে যে স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বলিয়া পরিচিত, উহাই মহারাষ্ট্র অথবা মহারাট্টাদিগের পুরাতন রাজ্য ছিল। এই প্রদেশের

রাজা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত রাজ ক্ষমতা পেশোয়ার হাতে ছিল। বোম্বাই নগর হইতে প্রায় সত্তর মাইল দক্ষিণপূর্বদিগবর্তী পুনা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। গুজরাট প্রদেশ গুহকুমার বা গেইকোয়ার নামক মহারাট্টা সর্দারের অধীন ছিল। মালোয়ার সিন্ধিয়া ও হোলকার নামে দুই জন বড় মহারাট্টা সর্দার ছিলেন, তাঁহাদিগের রাজধানী গোয়ালিয়র ও ইন্দোর। বিহার ও বর্তমান সময়ে, সেন্ট্রাল প্রদেশ নামে পরিচিত গোন্দয়ানার পুরাতন মোগলপ্রদেশে ভোন্সু নামে একজন সর্দার থাকিতেন, তাঁহার রাজধানী নাগপুর।

৯। এই সকল সর্দারদিগের প্রত্যেকেই আত্মক্ষমতা পুস্ত্রের হস্তে হস্ত করিয়া যাইতেন; সুতরাং এইরূপে, প্রকৃত মহারাষ্ট্র দেশ ভিন্ন, আরও চারিটা বড় মহারাট্টা রাজ্যের বিকাশ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ এই সকল মহারাট্টা সর্দারেরা যে সকল চৌথ আদায় করিতেন, তৎসমস্ত পেশোয়া সমীপে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহারা এই রীতির অনুসরণ করিতেন না। এই সকল মহারাট্টা রাজ্যের মধ্যে গুজরাট বা বরোদা, গোয়ালিয়র ও ইন্দোর, এই তিনটি এখনও বর্তমান আছে।

১০। মহারাট্টাগণ হায়দরাবাদ হস্তগত করিবার নিমিত্ত অশেষ বিশেষে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কখনও কৃতকার্য হয় নাই। নিজাম ও মহারাট্টাদিগের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। মহারাট্টারা নিজামের নিকট চৌথ দাবি করিয়াছে, কিন্তু তিনি না দিয়া পারিলে, কখনও চৌথ দানে সম্মত হন নাই।

১১। তৃতীয় পেশোয়া বলজি বাজিরাও তাঁহার পিতামহ ও পিতার পরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

১২। পাঠান রাজাদিগের সময়ে, ভারতের অবস্থা যেরূপ ছিল,

সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল। দস্যু দলকে দমন ও এখনকার তায় সর্বসাধারণকে নিরাপদ রাখিতে পারে, তখন এমন কোন প্রবল শাসন-



[গ্রাম্য মঞ্চ]

শক্তি এদেশে বিদ্যমান ছিল না। মহারাষ্ট্রা দস্যুদিগের অসংখ্য দল দেশ ছাইয়াছিল। তাহারা তাহাদিগের ঘোড়ার জন্ত লোকের শস্য কাটিয়া লইয়া যাইত, মানুষ হত্যা করিত এবং যাহা পাইত লুণ্ঠিয়া

লইত । সেকালে প্রত্যেক গ্রামের চারিদিকে দৃঢ় প্রাচীর বা কাঁটার বেড়া দিয়া দক্ষ্য হইতে গ্রাম রক্ষার উপায় করা হইত । কৃষাগ ক্ষেত চাষ করিবার সময়, তরবারি খানি পাশে রাখিয়া কাজ করিত । অনেক স্থানেই দূরে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার জন্য, মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইত । ঐ উচ্চ মঞ্চে দাঁড়াইয়া একটি লোক দূরে লক্ষ্য করিয়া দেখিত, কোন দিকে ধূলিরাশি উখিত হইতে দেখা যায় কিনা । দূরে ধূলি দেখিলেই বুঝা যাইত যে, দক্ষ্য আসিতেছে, তখন সকলে সতর্ক হইত । প্রত্যেক গ্রামেই একটা বৃহৎ নাগরা বা ঢকা ছিল । ঐ নাগরার শব্দ এক মাইল দূর तक শুনা যাইত । যখন কোন দক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হইত, তখনই নাগরা ধ্বনিত হইত, আর নাগরা শব্দ শ্রবণমাত্র মাঠের কৃষকেরা পলাইয়া গ্রাম্য প্রাচীরের পশ্চাতে যাইয়া আশ্রয় লইত ।

১৩। কোন পথ নিরাপদ ছিল না । কোন ব্যক্তি দৃঢ় রক্ষিগণে পরিরক্ষিত না হইয়া, কোথাও ভ্রমণ করিতে পারিত না । রাজ্যের বহু ভূমি পতিত পড়িয়া থাকিত । পূর্বে অল্প যে কএকটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেগুলি এখন আর রাস্তার মত ছিল না । কারণ, কেহই এখন আর সে সকল রাস্তার কোন সংবাদ লইত না । গাড়ী ব্যবহার করা যাইত না । লোকেরা অশ্ব বা বলদে চড়িয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিত । সমস্ত দেশ ভরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারের আধিপত্য ছিল । তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই, পর্যটকদিগের নিকট কিছু আদায় করিয়া লইতেন । সর্দার, পর্যটককে তাঁহার রাজ্য দিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিতেন, এই হেতু, এই কর দাবি করা হইত । এই করের নাম ছিল শুক্ক বা টোল । কুড়ি মাইল পথ চলিতে, হয়ত, বার চৌদ্দবার এইরূপ শুক্ক দান করিতে হইত ।

(৪৯)

নাদির শা ।

১। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে, নাদির শা নামক জনৈক সর্দার নাদির শা নাম ধারণ করিয়া পারস্যের সিংহাসনে অধিকৃত হন । নাদির পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া, আফগানিস্তান জয় করেন । আফগানিস্তান অধিকৃত হইলে, এক রাজা অগ্র রাজার নিকট যে ভাবে দূত প্রেরণ করেন, তিনিও সেই ভাবে মহম্মদ শাহের নিকট আপনার দূত পাঠাইয়া দেন । গর্বিত মোগল বলেন যে, নাদির একটা হঠাৎ উদ্ভূত আধুনিক লোক ; এই বলিয়া তিনি তাঁহার দূতদিগের প্রতি একান্ত অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেন ।

২। নাদির শা ভয়ানক গোঁড়া মুসলমান ছিলেন । তিনি তাঁহার দূতের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শনের পরে, মহম্মদ শা যথার্থ মুসলমান নৃপতির উপযুক্ত কর্তব্য পালন করিতেছেন না বলিয়া, তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন । তিনি হিন্দুদিগের নিকট হইতে জিজিয়া নামক কর আদায় করেন না । তিনি নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পুতুলপূজক মহারাট্টাদিগকে চোথ অথবা মোগল-রাজ্যের এক চতুর্থাংশ দান করিতেছেন । অতএব, তিনি তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষাদান করিবেন । এই বলিয়া নাদির শা পারসিক ও আফগানদিগের এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া, ভারত অভিমুখে রণ-যাত্রা করিলেন । তিন শত চল্লিশ বৎসর পূর্বে তৈমুর যে পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই খাইবার পাসের গিরিবক্সে ভারতে উপস্থিত হইয়া, পঞ্জাবের মধ্য দিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ।

৩। পারস্যের এই “লোক-হর্লভ-নৃপতি” নাদির শা ছয় ফুট দীর্ঘ

মুখ, পুরু ক্রয়ুগল, বিদ্যাতের শ্যাম জলন্ত নয়নদ্বয় ও বজ্রের শ্যাম গভীর কণ্ঠ, ভীতির সঞ্চার করিত । নাদির শাহ কাল-মেঘ-চর্শ্ব-নির্মিত কুর্ভা গায়ে দিতেন । ভারতে তিনি রক্তবর্ণ বৃহৎ টুপী মস্তকে ধারণ করিয়া আসিয়া ছিলেন, কিন্তু পারস্য দেশে উচ্চ পারসিক টুপী পরিধান করিতেন । তাঁহার কটিবন্ধে ছোরা ও হস্তে লৌহ-নির্মিত রণ-কুঠার ছিল । আর্য্যদিগের সহিত পুরাতন কালে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল, নাদির শাহ ও হিন্দুদিগের



[নাদির শাহ]

চক্ষে সেই দৈত্যদিগেরই অন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন ।

৪ । প্রথমতঃ তিনি বলিলেন যে, যদি প্রভূত অর্থরাশি তাঁহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, তিনি দিল্লী নগরের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না । কিন্তু রাত্ৰিকালে দিল্লীর লোকেরা উত্তেজিত হইয়া, নাদির শাহের কতিপয় সেনাকে নিদ্রিত অবস্থায় নিহত করে । প্রাতঃকালে নাদির শাহ সেনাদিগের মৃত দেহ দেখিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং দিল্লীবাসীর প্রাণবধ ও নগর লুণ্ঠনে অনুমতি প্রদান করিলেন । তৈমুরের তাতারেরা যাহা করিয়াছিল, নাদিরের আফগান ও পারসিক সেনারাও তাহাই করিল । তাহারা সমস্ত দিন ব্যাপিয়া নর-হত্যা, গৃহ-দাহ ও নগর-লুণ্ঠন-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিল । অপরাহ্নে সম্রাট মহম্মদ শাহ নাদিরের পদতলে পতিত হইয়া, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের নিবৃত্তি প্রার্থনা

করিলেন। নাদির শাহ তাঁহার লোকদিগকে হত্যাকাণ্ডে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিল।

৫। পরদিন নাদির শাহ ও তাঁহার লোকেরা বাবরের সম্বর হইতে মোগল সম্রাটগণ কর্তৃক দিল্লীতে যে মণিমুক্তা ও ধন-রত্ন স্তূপাকারে সঞ্চিত হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আত্মসাৎ করিলেন। সাজাহানের মরুরাসন, স্বর্ণময় মুকুট ও মণিরত্ন সমূহ, সর্বোৎকৃষ্ট ইস্তী ও ঘোটক নিচয়, কামান, মূল্যবান রেশমী ও মসলিন বস্ত্র এবং রাজ-ভাণ্ডার ও দিল্লী অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গৃহ হইতে প্রভূত অর্থরাশি বলপূর্ব্বক গৃহীত ও পারস্য দেশে অপসারিত হইল। শাহ এত অর্থ হাতে পাইলেন যে, তিনি উহা দ্বারা কি করিবেন, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যেক সেনাকে তিন তিন মাসের বেতন দিলেন এবং পূর্ণ এক বৎসর কাল, পারস্যের কোন লোক হইতে কোন প্রকার কর গ্রহণ করিলেন না।

৬। নাদির শাহ আক্রমণে মোগলসাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুবাদার ও নবাবেরা দিল্লীর দরবারে কর বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রেরণে বিরত হইলেন। মহারাষ্ট্রারা অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিল; এবং সমস্ত বঙ্গদেশ ও দক্ষিণভারত ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তাহারা যেখানে উপস্থিত হইল, সেইখানেই চৌথ দাবি করিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতায় ইংরেজ বণিকেরা মহারাষ্ট্রাদিগকে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে, গভীর পরিখা খনন করিলেন। এই পরিখা এখনও 'মহারাষ্ট্রা খাত' নামে পরিচিত।

(৫০)

ইংরেজ ও ফরাশিদিগের মধ্য সংগ্রাম।

হয়। ক্রমে পৃথিবীর যে কোন স্থলে ইংরেজ ও ফরাশি ছিলেন, সেই স্থানেই তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন।

২। ইংরেজেরা শান্তিপ্রিয় বণিক ছিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ছিল না। মাদ্রাজে কেবল বাবসায়ী সওদাগরগণ ছিলেন। লেখক ও কেরানী ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য কোন লোক জন ছিল না। প্রধান সওদাগর গবর্ণর নামে অভিহিত হইতেন। ফোর্ট-সেন্ট জর্জের রক্ষাবিধানার্থ কএকটি প্রহরী ভিন্ন তাঁহাদিগের সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না।

৩। পন্ডিচারীর ফরাশি গবর্ণর বড়ই চতুর ও চৌকস লোক ছিলেন। তাঁহার নাম ডুপ্লে। তিনি অতি দীর্ঘকাল এদেশে থাকিয়া, দেশীয়দিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ডুপ্লে ভারতীয় বাণিজ্যের লভ্যাংশ একমাত্র ফ্রান্সের আয়ত্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, ভারত হইতে ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তিনি শুধু বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভেই পরিতৃপ্ত হইবার লোক ছিলেন না, সমস্ত দক্ষিণ-ভারত জয় করিয়া আপনার শাসনাধীন করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন।



[ডুপ্লে]

৪। ডুপ্লে'র অধীন ৪০০০ দেশীয় সৈন্য ছিল। ইহাদিগকে সিপাহী

বা সিপাই বলা হইত । ফরাশি কাপ্তান কর্তৃক ইহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ ও কাওয়াত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল । তিনি আরও শোক পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, একবারে ফ্রান্স দেশে লিখিয়া পাঠাইলেন । এই সকল লোক আসিয়া এ দেশে পহঁচিলেই, তিনি মালদ্রাজে অভিযান করিয়া ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে মালদ্রাজ অধিকার করিয়া লইলেন ।

৫। ইহার পরে ফরাশিরা সেন্ট্, ডেভিড্, দুর্গ অধিকার করিতে প্রয়াসপর হইলেন । কিন্তু এই সময়ে ইংরেজেরাও ইংলণ্ড হইতে কতক সেনা আনাইয়া ফরাশিনিগের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন । তাঁহারা ক্রমে তিন বার ফরাশিদিগকে হঠাইয়া দিলেন । মেজর লরেন্স নামক জনৈক সাহসী সৈনিক পুরুষ সৈন্তসহ ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন । ইংরেজেরাও ফরাশিদিগের পন্দিচারী অধিকার করিয়া লইতে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ।

৬। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ ইংরেজ ও ফরাশি জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে, এদেশেও ইংরেজ ও ফরাশির যুদ্ধ থামিয়া যায় । মালদ্রাজ ইংরেজদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় । ইহার পরে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসরকাল, ইংরেজ ও ফরাশির মধ্যে নামে মাত্র হইলেও সন্ধির ভাবই বর্তমান ছিল ।

(৫১)

ক্লাইব ।

(ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা)

আর্কোট অবরোধ ।

১। যে বৎসর, ইংরেজ ও ফরাশির মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছিল, সেই বৎসর একটি দরিদ্র ইংরেজ বালক কোম্পানীর অধীন কেরাণীর

কর্ম নিযুক্ত হইয়া মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র উনিশ বৎসর।

ইংরেজ বালকের কোন রূপ অর্থ-সঙ্গতি বা বন্ধু-বান্ধব কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি অতি সহজেই একটি প্রধান সেনানায়ক এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ-নামা ইংরেজদিগেরই একজন হইয়া উঠেন। এই বালকের নাম রবার্ট ক্লাইব।



[রবার্ট ক্লাইব]

২। ফরাশিরা যখন মাদ্রাজ অধিকার করিয়া লয়, তখন ক্লাইব দেশীয়দিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ফোর্ট সেন্ট্

ডেভিডে চলিয়া যান। ফরাশিরা ক্রমান্বয়ে তিনবার এই দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মেজর লরেন্স অপারিসীম সাহস ও বীরত্বের সহিত এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ক্লাইব সর্বপ্রথম সেনার কর্মে পাঠ গ্রহণ করেন। ক্লাইব এমন প্রশংসার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, গবর্নর তাঁহাকে কেরণীর পদ ছাড়িয়া সৈনিককার্যে যাইতে অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ পতাকাবাহী পদাতি বা ইংরেজ সেনার মধ্যে বালক সৈনিকের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩। দেশীয় সেনাগণ, ক্লাইবের নায়কতায়, যে কোন স্থানে যাইত, এবং যে কোন সাহসিক কর্মে নিযুক্ত হইতে অগ্নানবদনে প্রস্তুত ছিল। তাহারা তাঁহাকে 'সাধিত জঙ্গ' অর্থাৎ রণে অটল এই নামে অভিহিত করিয়াছিল; এবং কালে তিনি এই নামেই সমস্ত ভারত ভরিয়া পরি-

চিত হইয়াছিলেন। নামটি বস্তুত সর্বোতোভাবেই তাঁহার উপযুক্ত ছিল। কারণ, ক্রাইব যে কেবল অসীমসাহসী ছিলেন এমন নহে, তিনি অতি সঙ্কলসংগ্রামেও ধীর, স্থির ও প্রশান্ত ভাবে থাকিয়া, কার্য্য করিতে পারিতেন।

৪। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ নিজাম উল্‌মুল্ক পরলোক-গত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির জঙ্গ তাঁহার উত্তরাধিকারিক্রমে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র মজঃফর জঙ্গ সিংহাসনের জন্ত নাজির জঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে কুহসঙ্কল্প হইয়া, ফরাশিদিগের সাহায্য প্রার্থনায় পন্দিচারীতে গমন করিলেন। এই সময়ে, চন্দ বা চণ্ড সাহেব নামক জনৈক সর্দার আনোয়ার উদ্দিনের পরিবর্তে কর্ণাটিকের নবাব হইবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন। সুতরাং, চণ্ড সাহেবও পন্দিচারীতে যাইয়া ডুপ্পের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

৫। ডুপ্পে আহ্লাদের সহিত উভয়েরই সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। বস্তুতঃ ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন। তিনি বুসী নামক একজন সাহসী সেনানীর অধীন বলিষ্ঠ একদল সেনা তাঁহা-দিগকে দিলেন। তিন দল সেনা আর্কটের বিরুদ্ধে রণ-যাত্রা করিল। তাহারা আনোয়ার উদ্দিনকে আক্রমণ, পরাভব ও নিহত করিয়া আর্কট অধিকার করিয়া লইল। তাঁহার পুত্র মহম্মদ-আলি ত্রিচিনোপলীতে পলাইয়া গেলেন। ত্রিচিনোপলীতে যাইয়া, তিনি আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। মিত্রভাবে মিলিত তিন দল সৈন্য অতঃপর দাক্ষিণাত্যে গমন করিল। নাজির জঙ্গ নিহত হইলেন। বুসী বিজয়-আড়ম্বরে হায়দরাবাদ অভিযুগে অভিযান করিলেন।

৬। ডুপ্পে এই প্রণালীতে সম্পূর্ণরূপে সফলমনোরথ হইলেন। নূতন নিজাম পূর্ব উপকূলস্থিত উত্তর সরকার প্রদেশ ফরাশিদিগকে ছাড়িয়া দিলেন এবং স্বয়ং ডুপ্পেকে কর্ণাটিকের গবর্ণর এই উপাধি প্রদান

করিলেন । চণ্ড সাহেব ডুপ্পের অধীন কর্ণাটকের নবাব নিযুক্ত হইলেন । অতঃপর চণ্ড সাহেব কর্ণাটিক প্রদেশে ফরাশিদিগকে বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ও প্রচুর অর্থ দান করিলেন ।

৭। চণ্ড সাহেব ফরাশিদিগের সহিত মিলিত হইয়া, ত্রিচিনোপলীতে মহম্মদ আলিকে অবরোধ করিলে, মহম্মদ আলি ইংরেজের নিকট দূত পাঠাইয়া, তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ।

৮। ত্রিচিনোপলী হইতে ফরাশিদিগকে তাড়াইয়া দিতে, এবং সেই সময়ে, আপনদিগের দুটি দুর্গ রক্ষা করিতে পারা যায়, ইংরেজ গবর্ণরের এই পরিমাণ সেনাবল ছিল না । অতএব, তিনি ক্ষুদ্র একদল সেনাসহ কতক অস্ত্র-শস্ত্র ও কিছু খাদ্যসামগ্রী মহম্মদ আলির নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে, উপযুক্ত সহায়তার জন্য তাঁহার প্রতি-শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থাকিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন । বালক পদাতি ক্লাইবও এই সৈন্যদলে ছিলেন । ক্লাইব ত্রিচিনোপলীতে প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গত হইতে এরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেন যে, এই ঘটনার পরেই তাঁহাকে কাপ্তানের পদে নিযুক্ত করা হইল ।

৯। ক্লাইব মান্দ্রাজে আসিয়া গবর্ণরকে জানাইলেন যে,—মহম্মদ আলি এতদূর হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি কিছুতেই অধিক-দিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না । এই সঙ্গে তিনি ইহাও দেখাইয়া দিলেন যে, ফরাশি সেনার এক অংশ ত্রিচিনোপলী, এক অংশ পন্ডিচারী এবং এক অংশ বুসীর সহিত বহুদূরবর্তী হায়দরা-বাদে আছে । কর্ণাটকের প্রধান নগর আর্কটরক্ষার্থ সেখানে অতি অল্পসংখ্যক সেনা রাখা হইয়াছে । অতএব, তিনি মনে করেন যে, এই সময়ে আর্কট আক্রমণ করিলে, সহজেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে । আর্কট অধিকার করিলে, তাঁহার বিশ্বাস যে, চণ্ড

সাহেব ত্রিচিনোপলী পরিত্যাগ করিয়া আর্কট উদ্ধারের জন্ত আগমন করিবেন এবং তাহা হইলেই মহম্মদ আলি অবরোধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ।

১০ । কাপ্তান ক্লাইবের এই পরামর্শ এতদূর যুক্তিযুক্ত যে, গবর্ণর বিনা বাক্যব্যয়ে তদনুরূপই কার্যের ব্যবস্থা করিলেন । তখন গবর্ণরের কাছে কেবল ২০০ ইংরেজ সেনা ও ৩০০ সিপাহী এই কয়েক নিয়োগ করার জন্ত মজুত ছিল । তাহারাও রণ-কার্যে অশিক্ষিত এবং তাহাদিগের অধিকাংশই কোন কালে রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই । কিন্তু ক্লাইবের পক্ষে এই সৈন্যই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত । মাদ্রাজ হইতে আর্কট সমুদ্র মাইলের পথ দূরে অবস্থিত । ক্লাইব তাঁহার এই গতি পথে প্রতিদিন সেই অশিক্ষিত সৈন্যদিগকে কুচ ও কাওয়াত শিক্ষা দিতে দিতে চলিলেন । তিনি পূর্ণ ছয়টি দিন এই পথে ছিলেন । ক্লাইব আর্কটে পহুঁচিয়া উহার এক দ্বার দিয়া সৈন্যে প্রবেশ করিলেন, অল্প দূর দিয়া চণ্ড সাহেবের সৈন্যদল পলায়নপর হইল ।

১১ । রাজধানী অধিকৃত হইয়াছে, যখন চণ্ড সাহেব এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তিনি তখনই তাঁহার পুত্র রাজা সাহেবের সহিত দশ হাজার সেনা পুনরায় আর্কট অধিকারের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন । সেই সঙ্গে কতিপয় ফরাশি সৈন্যও আসিল । ক্লাইব যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই হইল । এই বৃহৎ সৈন্যদল ক্রমে পঞ্চাশ দিন আর্কট নগরে ক্লাইব ও তাঁহার লোকদিগকে অবরোধ করিয়া রহিল । কিন্তু আর্কট দুর্গ পুনঃ অধিকার করিবার নিমিত্ত তাহারা যথাসক্তি চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য হইতে পারিল না ।

১২ । এইরূপে প্রায় দুই মাস কাল অতিবাহিত হইলে, মাদ্রাজের গবর্ণর ক্লাইবের সাহায্যার্থ আরও কতকটি লোক পাঠাইয়া দিলেন । রাজা সাহেব ক্লাইবের সাহায্যার্থ মাদ্রাজ হইতে লোক আসিতেছে

গুনিতে পাইয়া, দুর্গ অধিকারের জন্য তাঁহার শেষ চেষ্টা করিলেন । কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না, তাঁহার ৪০০ সৈন্য নিহত হইল, এবং তিনি পশ্চাৎ অপমৃত হইতে বাধ্য হইলেন । এই পরাজয়ে তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ হইল । সম্মুখে ক্লাইব ও তাঁহার সৈন্যদল এবং পশ্চাতে মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত ইংরেজ সেনা, এই দুই সেনার চাপে পড়িয়া পাছে বিপন্ন হন, রাজাসাহেব, এই ভয়ে ভীত হইয়া, অবশিষ্ট সৈন্য-সহ প্রস্থানপর হইলেন ।

১৩। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে আর্কোট অবরোধের এই বিখ্যাত ঘটনা ঘটে । ইহা দ্বারা দক্ষিণভারতে ইংরেজ-ইতিহাসের গতি-পথ অন্য আর এক দিকে চিহ্নিত হইয়া পড়ে । এই বৎসর হইতেই, ইংরেজেরা উত্তরোত্তর অধিকতর বলশালী ও ফরাশিরা উত্তরোত্তর অধিকতর হীনবল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন ।

১৪। ইহার পরে, মেজর লরেন্স ও ক্লাইব ত্রিচিনোপলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তাঁহারা তুমুল যুদ্ধের পর, ফরাশি-দিগকে পরাভূত ও বন্দী করেন । ত্রিচিনোপলী তাঁহাদিগের হস্তগত হয় । তাঁহারা তাঁহাদিগের সহকারী মহম্মদ আলিকে কর্ণাটিকের নবাব-পদে



[মেজর লরেন্স ও মহম্মদ আলি]

অভিষিক্ত করেন । চণ্ড সাহেব তাম্বোরে পলাইয়া যান এবং সেখানকার মহারাট্টা রাজা কর্তৃক নিহত হন ।

১৫ । এই সময়, যার-পর-নাই কঠোর পরিশ্রম হেতু কাপ্তান ক্লাইব অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন । ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে সেনাদলে কর্ণেলের পদে বরণ এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে একখানি তরবারি উপহার প্রদান করেন । এই তরবারির বাঁট বা হাতলটি ৫০০ পোণ্ড মূল্যের হীরক দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল । দরিদ্র ও নগণ্য ক্লাইব ধনী ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন । ইংলণ্ড-বাসী তাঁহাকে আর্কটের বীর বলিয়া অভিহিত করিল ।

১৬ । ইহার পর ইংরেজ ও ফরাশি কোম্পানী, স্বীয় স্বীয় ভূত্যা-দিগের প্রতি, তাহারা পরস্পর আর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে পারিবে না বলিয়া, দৃঢ় অশুভ্রা পত্র প্রচার করিলেন । ইংরেজ ও ফরাশিতে সন্ধি স্থাপিত এবং ডুপ্লের প্রতি ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইল ।

(৫২)

কলিকাতার অন্ধকূপ ।

১৭৫৬ ।

১ । বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন । তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় নৌহিন্দু সিরাজ উদ্দৌলা অর্থাৎ “রাজ্যের প্রদীপ” তাঁহার গদিতে আরোহণ করেন । সিরাজ উদ্দৌলা যুবক । তাঁহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর । যুবক রাজ-প্রাসাদে বড়ই আদর ও আবদারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন । তিনি যখন যাহা চাহিতেন, তখনই তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত । বহির্জগতের কোন সংবাদ তিনি রাখিতেন না । সিরাজ অত্যন্ত দুর্বলপ্রকৃতি, নির্বোধ এবং সেই সঙ্গে

ঘৃণা করিতেন । সিরাজ লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, কলিকাতা অতি সমৃদ্ধ নগর । অতএব কলিকাতা লুণ্ঠন করিয়া আপনার ধন-বল বৃদ্ধি করিবেন, তাঁহার মনে এই অভিলাষ চির-জাগরুক ছিল ।

২। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ বাধাইবার সুযোগ ও সুত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । এই সময়ে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের প্রাচীর-সংস্কার করা হয় । ফ্রান্সের সহিত সত্বরেই ইংরেজের পুনরায় যুদ্ধ ঘটনা হইবে, ইংরেজ গবর্ণর ইহা শ্রুত হইয়াই, প্রাচীর-সংস্কার করান । তাঁহার আশঙ্কা ছিল, পাছে চন্দন-নগরস্থ ফরাশিরা, ফোর্ট উইলিয়ম আক্রমণ করে । নবাব তাঁহাকে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন । তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তিনি প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারেন না ; প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, কলিকাতা সম্পূর্ণরূপে ফরাশিদিগের কুপাকটাক্ষের অধীন হইয়া পড়িবে ।

৩। এই প্রত্যুত্তর যুবক নবাবের নিকট পৌঁছামাত্রই তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে পঞ্চাশ হাজার সেনা লইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন । তখন কলিকাতার দুর্গে মাত্র ১৭০ জন ইংরেজ সেনা ছিল । কোন কালে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত রহিয়াছে, এমন লোক তাহাদিগের মধ্যে অতি অল্পই ছিল । এই সেনাদিগকে স্বর্ণ-কার্য্যে চালনা করিবার নিমিত্ত, ক্লাইবের আয়, কোন সাহসী বীর পুরুষ উপস্থিত ছিলেন না । তথাপি তাহারা যতদূর পারিল, চারিদিন কাল আত্মরক্ষা করিল । অবশেষে অধিকাংশ সিভিলিয়ান ভদ্রলোক জীলোক ও শিশু জাহাজে উঠিয়া নদী-পথে অন্তহিত হইলেন । অবশিষ্টেরা তাঁহাদিগের প্রাণের উপর কোনরূপ আঘাত হইবে না, এই প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়া, নবাবের হাতে দুর্গ সমর্পণ করিলেন ।

৪। নবাব দুর্গ জয় করিয়া স্বর্ণ-সম্ভাষণ নিদিত হইলেন । এদিকে

রক্ষিবর্গ ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে ক্ষুদ্র একটা কোঠায় বন্ধ করিয়া রাখিল। পূর্বে এই কোঠাটি একটি মাত্র লোককে কয়েদ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কোঠাটি এত গরম ও অন্ধকারময় ছিল যে, উহাকে লোকে ‘অন্ধকূপ’ বলিত। এতগুলি বন্দীকে অমন সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ রাখা নিশ্চিত মৃত্যু। ফলেও তাহাই হইল। নিরুপায় বন্দিগণ একটি একটি করিয়া শ্বাসরোধ হেতু প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, আর নবাবের নিষ্ঠুর রক্ষিগণ হাসি, তামাসা ও আমোদ সহকারে মুমূর্ষুদিগের মৃত্যু যজ্ঞা দর্শন করিল।

৫। পরদিন প্রাতে এই কারাগৃহের দ্বার উদ্বাটিত হইলে, দেখা গেল যে, বাইশটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক মাত্র জীবিত আছে। রাত্রিতে যে ১২৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, অতঃপর, তাহাদিগের মৃতদেহ পরিথার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

(৫৩)

পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৫৭।

১। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে পুনরায় ইংরেজ ও ফরাসির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধ উপস্থিত হইবার একটু পূর্বে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কর্ণেল ক্লাইব সম্পূর্ণরূপে অস্থ হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে তাহাদিগের ভারতীয় সেনার সেনাপতি পদে নিয়োগ করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন। কলিকাতা হস্তচ্যুত হইয়াছে, এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিবীর একটু পূর্বে ক্লাইব মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন।

২। মাদ্রাজ প্রবাসী ইংরেজগণ এই নিদারুণ শোক-সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন এবং ফিরিয়া কলিকাতা অধিকার

লইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন । কর্ণেল ক্লাইব স্থল-সৈন্যের নায়ক ও এড্‌মিরেল ওয়াটসন রণ-তরির অধ্যক্ষ হইয়া চলিলেন । রণ-তরির তিনমাসে কলিকাতা পৌঁছিল । ইংরেজ সেনা কলিকাতায় অবতরণ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম অধিকার করিল । এই কার্যে একটি লোকেরও প্রাণ-হানি ঘটে নাই । কলিকাতা অধিকৃত হইলে, তাঁহারা হুগলিতে গমন করিলেন । হুগলি নগরও তাঁহাদিগের হস্তগত হইল ।

৩। সিরাজ উদ্দৌলা ইহাতে শঙ্কিত এবং ইংরেজ বন্দীদিগকে কারামুক্ত করিয়া সন্ধির প্রার্থী হইলেন । নবাব, ইংরেজদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া, প্রতিশ্রুতিও দিলেন । কিন্তু ওদিকে আবার এই সময়েই, চন্দননগরে ফরাশিদিগের নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করা হইল । নবাব কিরূপে তাঁহাকে প্রতারণা করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, ক্লাইব অচিরেই ইহা বুঝিতে পাইলেন এবং চন্দননগরে দ্রুতগতি সৈন্য চালনা করিয়া চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন ।

৪। একটি বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার কু-শাসন ও নিষ্ঠুর-ব্যবহারে প্রজাকুল তাঁহার প্রতি এতদূর হতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত যে, তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সকলেই মনে প্রাণে উৎসুক ও আকুল হইয়া উঠিয়াছেন । সিরাজ উদ্দৌলার কতিপয় প্রধান সচিব একত্র মিলিত হইয়া, সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত ও তাঁহার সেনাপতি মিরজাফরকে নবাব করিবার জন্য বড়-যত্নে প্রবৃত্ত হইলেন । মিরজাফর ক্লাইবের নিকট পত্র লিখিয়া এই ব্যাপারে, তাঁহাকে তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন । যদি ইংরেজরা নবাবকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে মিরজাফর বহু একদল সেনা লইয়া, ইংরেজের সহিত

৫। ইহার পরে, কর্ণেল ক্লাইব তাঁহার সৈন্যসহ উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতা ও



[সিরাজ উদ্দৌলা]

মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্তী পলাশী নামক গ্রামে সিরাজ উদ্দৌলা শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৫০,০০০ পদাত, ১৮,০০০ অশ্বারোহী, ০ টি কামান ও কতিপয় ফরাশি সৈন্য। ক্লাইবের সঙ্গে ১১০০ ইংরেজ বা গোরা সৈন্য, ২০০০ সিপাহী এবং ১০ টি ক্ষুদ্র কামান ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে

জুন পলাশীর মাঠে নবাব ও ইংরেজ সৈন্যে যুদ্ধ হয়। মিরজাফর তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুদ্ধের সময় ইংরেজের সহিত যোগদান করেন নাই, এক পার্শ্বে থাকিয়া, কোন্ পক্ষ জয়লাভ করে, তাহাই দেখিতেছিলেন। ইংরেজেরা সমস্ত দিন ভরিয়া বিপক্ষের প্রতি গোলা চালাইয়াছিল। অপরাহ্ন তিনটার সময়, যখন বিপক্ষের বহু লোক ভূপতিত দৃষ্ট হইল, তখন ক্লাইব ভীমবেগে বিপক্ষ সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সৈন্য দলের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন। নবাবের সেনাগণ সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাব পলায়ন করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজের জয় হইল।

৬। সিরাজ উদ্দৌলা পলায়ন-সময়ে পথে একটা লোক কর্তৃক ধৃত হইলেন। তিনি ইতিপূর্বে এই লোকটার নাক কাটিয়া দিয়াছিলেন। নবাব ধৃত হইয়া, মিরজাফরের পুত্র মীরণের নিকট আনীত

হন । মীরণ তাঁহার প্রাণ সংহার করেন । নূতন নবাব মিরজাফর ইংরেজকৃত সাহায্যের প্রতিদানে তাঁহাদিগের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া দিলেন । ক্লাইব ও অগাথ ইংরেজ সৈনিক পুরুষদিগকে বিস্তর উপঢৌকন প্রদান করা হইল । এতদ্ব্যতীত নবাব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানিকে কলিকাতার চতুর্দিকবর্তী ২৪ পরগণা



[মিরজাফর]

নামক ভূমিখণ্ড দান করিলেন । এই ঘটনার দুই বৎসর পরে, এই ভূমির জন্ত কোম্পানি নবাবকে যে কর দিতে বাধ্য ছিলেন, তিনি সেই রাজস্ব ক্লাইবকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন । এই দান প্রাপ্ত হইয়া ক্লাইব ধনী ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন । চব্বিশ পরগণার নাম হইল ক্লাইবের জায়গির । কোম্পানি, ক্লাইবের অবশিষ্ট জীবন কাল, এই রাজস্ব ক্লাইবকেই দিয়াছিলেন । ভারতের ভূমিতে ইংরেজের এই প্রথম অধিকার স্থাপন এবং ইহাই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর ভিত্তি ।

(৫৪)

ফরাশিদিগের অধঃপতন ।

১৭৫৬—১৭৬২ ।

১ । ১৭৫৬ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকে । ইহা ইউরোপের সাত বৎসর-ব্যাপী মহা যুদ্ধ, বা সপ্তাব্দী সমর নামে পরিচিত । এই মহাসংগ্রামে ইংরেজ ফরাশির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন ।

২। ইউরোপে যখন এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কর্নেল ক্লাইব, তখন প্রায় সমস্ত ইংরেজ সৈন্যসহ বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি ইউরোপে যুদ্ধ-ঘোষণা হওয়া মাত্রই ফরাশিদিগের চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। সুতরাং, উত্তরভারতে ফরাশিদিগের আর কোন অধিকার বা দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। দক্ষিণভারতে ইংরেজের এই পরিমাণ সৈন্যবল ছিল না, যে তাঁহারা পন্ডিচরী অধিকার করেন। সেখানকার ফরাশি সেনাও এতদূর শক্তিসম্পন্ন ছিল না যে, ইংরেজের মাদ্রাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অতএব দুই বৎসর কাল দক্ষিণভারতে ইংরেজ ও ফরাশিক কিছু বলিলেন না, ফরাশিও ইংরেজ-অধিকারে কোনরূপে হানাদিতে অগ্রসর হইলেন না।

৩। কিন্তু ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট লাল্লীর অধীন বৃহৎ একদল ফরাশি সৈন্য এদেশে আসিয়া পহঁচে। এ বেশ হইতে ইংরেজদগকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার ক্রতি আদেশ ছিল। তিনি যে রাত্রিতে এ দেশে পদার্পণ করিলেন, সেই রাত্রিতেই ফোর্ট সেন্ট্ ডেভিডের দিকে রণ-যাত্রা করিলেন। দুর্গ অতি সহজে তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি দুর্গ জয় করিয়া উহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে, সে দুর্গ আর কখনও পুনঃ নিৰ্ম্মিত হয় নাই।

৪। এই ঘটনার পর, লাল্লী বুসীকে দাক্ষিণাত্য হইতে সমস্ত সৈন্য সহ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিতে আদেশ করিলেন। উভয়ে মিলিয়া মাদ্রাজ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মেজর লরেন্স ছয় মাস কাল বিশেষ বীরত্ব সহকারে মাদ্রাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে ইংলণ্ড হইতে সেনা সহ এক জাহাজ আসিয়া পহঁচিল। লাল্লী ও তাঁহার সৈন্যদল মাদ্রাজ হইতে বিতাড়িত হইলেন। নবাবত সেনা দলের নায়ক কর্নেল কুট, লাল্লী ও তাঁহার পলায়মান সৈন্য দলের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও পন্ডিচরীর সম্ভারতী ওষাণ্ডিওষাণ্ডি নামক

স্থানে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন । ভারতে ইংরেজ ও ফরাশির মধ্য, যত যুদ্ধ হইয়াছিল, ওয়ান্দিওয়াসের যুদ্ধ তন্মধ্যে সর্ব-প্রধান । কর্ণেল কুট, ইহার পরে, পন্ডিচরীতে উপস্থিত হন এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাশিদিগ হইতে সেই নগর অধিকার করিয়া লন ।

৫। যে সময়ে, কর্ণাটকে এই সকল ঘটনা হইতেছিল, সেই সময়ে ক্লাইব, কলিকাতা হইতে, স্থানীয় প্রয়োজনের জন্য রাখিয়া, অতিরিক্ত যত লোক হাতে পাইলেন, কর্ণেল ফোর্ডের নামকতার তাহাদিগকে উপকূল-পথে, উত্তরসরকার প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন । উত্তর সরকারে ফরাশি সেনা ইংরেজ সেনা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল । বিশেষতঃ হায়দরাবাদের নিজাম তাঁহার সেনাদল সহ ফরাশিদিগের পৃষ্ঠবল ছিলেন । কিন্তু কর্ণেল ফোর্ড ক্লাইবের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যেমন সাহসী, তেমনই কৌশলী সৈনিকপুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন । ফরাশির সংখ্যায় বেশী হইলেও, তিনি প্রত্যেক স্থানেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, ভীমবলে আক্রমণপূর্বক তাঁহাদিগের প্রধান নগর মসলিপতন অধিকার করিয়া লইলেন । তাঁহার নিজের সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষাও ফরাশি বন্দীর সংখ্যা বেশী হইয়াছিল । এইরূপে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরসরকার ইংরেজদিগের হস্তগত হয় । সেই সময় হইতেই, উহা ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইয়া আছে । ইহাই মাদ্রাজ প্রেসীডেন্সীর মূল পত্তন ।

৬। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্ত বর্গব্যাপী মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া যায় ; এবং ইংরেজ ও ফরাশির মধ্য সন্ধি স্থাপিত হয় । ইউরোপে সন্ধি স্থাপিত হইলেই, এদেশেও চন্দননগর ও পন্ডিচরী ফরাশিদিগকে বাণিজ্য স্থান রূপে প্রত্যর্পণ করা হইল । এইরূপে ভারতে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ ইংরেজ ও ফরাশির বিংশতি বৎসরব্যাপী দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল । মাদ্রাজে ইংরেজ বন্দিকদিগকে আক্রমণ করিয়া ফরাশির

প্রথম এই যুদ্ধ আরম্ভ করেন, এবং ইংরেজ বিজয়রাজ্যের শাসনকর্তা হইয়া দক্ষিণভারতে একটা প্রবল শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হইলে, ইহার অবসান হয় ।

(৫৫)

মিরজাফরের রাজত্ব ।

১৭৫৮—১৭৬১ ।

১। দিল্লীর বাদশাহের অনুমতি বিনাই ক্লাইব মিরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবেন । দিল্লীর বাদশাহ তখনও উত্তর-ভারতস্থিত সমস্ত রাজ্যনিবহের অধিরাজত্ব দাবি করিতেন । মিরজাফর পূর্ববর্তী নবাবদিগের ন্যায় দিল্লীর দরবারে কোন উপঢৌকন প্রেরণ করেন নাই । অতএব বাদশাহের পুত্র শা জাদা বা সম্রাটকুমার বৃহৎ এক দল সৈন্য লইয়া, বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন । অযোধ্যার নবাব সুজাদৌলাও এই সঙ্গে আসিয়াছিলেন ।

২। মিরজাফর এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং অর্থহারা সম্রাট তনয়কে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলেন । কিন্তু ক্লাইব, তাঁহার সহায়তায় স্বয়ং আসিতেছেন, ইহা বলিয়া পাঠাইয়া তাঁহাকে সাহস দিলেন । যুদ্ধে পরাজিত হইর ও অটল,—ভীষণ ইংরেজ কর্ণেল, ‘সাবিত জঙ্গ’ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া, অযোধ্যার নবাব শা জাদাকে একাকী ও অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া, আপনার লোকজন সহ অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন । সম্রাট-তনয় ক্লাইবের কৃপা প্রার্থী হইয়া পড়িলেন । ক্লাইব দয়া করিয়া তাঁহাকে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা বা মোহর উপঢৌকন দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ প্রদান করিলেন । শা জাদাও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে প্রীতমনে দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন ।

হইলে শান্তিতে ও বিনা যুদ্ধাটে রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অচিরেই আপনাকে শাসন-কার্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ প্রতাপ করিলেন। তিনি অহিংসেবী ছিলেন; এবং বৃথা আমোদে সময় নষ্ট করিতেন। এই আমোদ-উৎসবে তাঁহার প্রভূত অর্থ ব্যয় হইত।

৪। এইরূপ অপব্যয় নিবন্ধন তিনি তাঁহার সৈন্তদিগকে বেতন দিতে না পারিয়া, বাঙ্গালার ধনী হিন্দু মহাজনদিগের সঙ্কল্প লুণ্ঠনের উদ্যোগ করেন। কিন্তু ক্লাইব তাঁহার এই উদ্যমে বাধা প্রদান করিলে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, চিন্মুরা স্থিত ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য চাইয়া পাঠান। ওলন্দাজেরা আসিয়া তাঁহার সহায় হইয়া, ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত করুন, এই মর্মে তাঁহাদিগের নিকট পত্র লেখা হইয়াছিল। ইউরোপে ইংরেজ ও ওলন্দাজে কোন বিবাদ ছিল না, তাঁহারা পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। অতএব, চিন্মুরা প্রবাসী ওলন্দাজ বণিকদিগের ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু তাঁহারা ইংরেজ বণিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধে মনে মনে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা মূর্খের মত, মিরজাফরের প্রস্তাবে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন। ওলন্দাজেরা তাঁহাদিগের জাবাদীপস্থিত কুঠীতে সৈন্তের জগু পত্র লিখিলেন। জাবা হইতে অনতিবিলম্বে সাত খানি বৃহৎ জাহাজ সৈন্ত সামন্ত লইয়া, হুগলি নদীর মুখে আসিয়া পহুঁচিল এবং হুগলী নদীতে পাল উড়াইয়া চিন্মুরায় ঘাইতে চেষ্টা করিল। এই সকল জাহাজ, ইংরেজদিগের কএকখানি তরি আক্রমণ পূর্বক নদীতটবর্তী ইংরেজদিগের কএকটা কুঠী ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

৫। এই সময় কর্ণেল ফোর্ড উত্তর সরকার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডকে চিন্মুরা এবং অন্ত এক ব্যক্তিকে ওলন্দাজদিগের জাহাজ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। চিন্মুরা স্থিত

ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডকে চিন্মুরা এবং অন্ত এক ব্যক্তিকে ওলন্দাজদিগের জাহাজ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। চিন্মুরা স্থিত

ওলন্দাজেরা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন । সন্ধি হইল । সন্ধির সর্ত্তানুসারে ওলন্দাজেরা বাণিজ্য-নগররূপে চিন্‌সুয়া ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহারা কোন সৈন্ত সামন্ত রাখিতে পারিবেন না, এই চুক্তিতে তাঁহাদিগকে সম্মতি দিতে হইল । ক্লাইব মিরজাফরকে ক্ষমা করিলেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন ।

(৫৬)

মিরকাশিম ।

১৭৬১—১৭৬৫

১। ক্লাইবের ভারত হইতে প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরেই, মিরজাফর পুনরায় বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন । শাহ-জাদা এফগ বিতীয় শাহ আলম উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছেন । তিনি পুনরায় অযোধ্যার নবাবের সাহায্যে বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন ।

২। ইংরেজ গবর্ণর বিপক্ষদিগকে অপসারিত করিবার নিমিত্ত কাপ্তান নক্সের নামকতার ক্ষুদ্র একদল সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন । নক্স পাটনার বিপক্ষ-সেনার সম্মুখীন হইলেন । পাটনার নিকটে যুদ্ধ হইল । নক্স সেই ক্ষুদ্রসেনার সাহায্যে শাহ আলম ও সুজা দৌলকে পরাস্ত করিয়া অযোধ্যায় তাড়াইয়া দিলেন ।

৩। মিরজাফর শাসনকার্যে অক্ষম । একথা এখন আর কাহারও বুঝিবার বাকি রহিল না । কলিকাতার গবর্ণর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার জামাতা মিরকাশিমকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করিলেন । বিশ্বাস ছিল যে, মিরকাশিম ভালরূপে শাসনকার্য চালাইতে ও স্বদেশ-রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন । মিরকাশিম প্রতিদানে কোম্পানীকে বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর এই তিনটি জেলা অর্থাৎ বাঙ্গালার

৪। মিরকাশিম আশানুরূপ অতি সুন্দর প্রণালীতে শাসনকার্য্য আরম্ভ করিলেন। মিরজাফর কৃত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া, তিনি রাজকীয় শাসনকার্য্যের সকল দিকে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া লইলেন। মিরকাশিম মিরজাফরের মত নামমাত্র নবাব না হইয়া, প্রকৃত নবাবের ক্ষমতায় কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং পূর্ববর্তী নবাবদিগের ত্রায় স্বেচ্ছামত কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত একান্ত প্রয়াস-পর হইয়া উঠিলেন। রাজত্বের প্রথম দুই তিন বৎসর তাঁহাকে উৎকট পরিশ্রম করিতে হইল। মিরকাশিম কতিপয় ফরাশিকে বেতন দিয়া রাখিয়া তাহাদিগের সাহায্যে সেনাদলকে কুচ-



[মিরকাশিম]

কাওয়াত ও রণ-প্রণালী শিখাইয়া লইলেন। ইহার পরে, যে ইংরেজ তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি সেই ইংরেজের আধিপত্য হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে এবং ইংরেজদিগকে একবারে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করিলেন। মিরকাশিম ইংরেজের সন্নিকটে অবস্থান ভাল মনে করিলেন না। কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ মাত্র ১০০ মাইল দূরবর্তী। কিন্তু মুন্সের ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত। মিরকাশিম মুর্শিদাবাদ হইতে মুন্সেরে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। ক্রমে যখন তিনি বুঝিতে পাইলেন যে, তিনি ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্যক্ সমর্থ হইয়াছেন, তখন আর কথা রহিল না, তিনি ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত হেতু ও সুযোগ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন।

৫। বিবাদের এক সূত্র সম্বন্ধেই উপস্থিত হইল। পলাশির যুদ্ধের পরে মিরজাফর কোম্পানীর ভূত্যাগিকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য দ্রব্য দেশের সর্বত্র বিনা শুল্কে পাঠাইবার অধিকার প্রদান করিয়া ছিলেন। কিছুকাল পরে, কোম্পানীর কর্মচারী ও কেরাণীবর্গ, দেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া, প্রত্যেক স্থানে কোম্পানীর ভূত্যাগিকের নামে তাহাদিগকেও বিনা শুল্কে বাণিজ্য দ্রব্য চালান দেওয়ার অগ্রমতি প্রদান করেন। মিরকাশিম ইহা রহিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া, বাণিজ্য দ্রব্যের উপর যেখানে যে শুল্ক ছিল, সমস্ত রহিত করিয়া দিলেন। সুতরাং, সকলেই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহাতে কোম্পানীর কর্মচারীরা সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা ভিন্ন অন্য সকলেই শুল্কদানে বাধ্য থাকুক, ইহাই তাঁহাদিগের ইচ্ছা।



[মিজা দৌলা]

৬। ইহার পর, মিরকাশিম যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। তিনি শাহ আলম ও সুজা দৌলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাদিগের তিন জনের সমস্ত সেনাবল একত্র করিয়া ভারত হইতে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্ত যত্ন করা আবশ্যিক।

এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া মিরকাশিম পার্টনার ইংরেজ বণিকদিগকে আক্রমণ

করিলেন । এই সঙ্গে সঙ্গে যখন যেখানে যে ইংরেজকে পাওয়া যায় অমনি, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে সৈনিক পুরুষদিগের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইল ।

৭ । কলিকাতাস্থিত ইংরেজদিগের মন্ত্রণা-সভা পুনরায় মিরজা-ফরকে নবাবের পদে বরণ করিলেন । মেজর এডাম্‌স্ কলিকাতা হইতে ৬০০ গোরা ও ১০০০ সিপাহী সহ যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন । কলিকাতায় তখন ইহার অধিক সৈন্যবল ছিল না । মিরকাশিমের সুশিক্ষিত সেনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল । তিনি ক্রমে তিনটি সঙ্কুল যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজধানী মুন্সের আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন ।

৮ । মিরকাশিম তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন না ; তিনি মুন্সের পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় পলায়ন করিলেন । মিরকাশিম পাটনায় উপস্থিত হইয়া ইংরেজ সেনাপতি সমীপে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যদি আর একপদও অগ্রসর হন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহার হাতে যে ইংরেজ বন্দী আছে, তাহাদিগের সকলকেই হত্যা করিয়া ফেলিবেন । বন্দীদিগের প্রধান মিষ্টার এলিস্ অতীব সাহসী পুরুষ ছিলেন । তিনি মৃত্যুভয়ে বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না । যাহাই ঘটুক না কেন, তিনি মেজর এডাম্‌সের সমীপে তাঁহাকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন ।

৯ । মেজর এডাম্‌স্, নিরস্ত্র বন্দীদিগের প্রাণসংহার করিতে পারেন, মিরকাশিমকে একপ নিষ্ঠুর মনে করেন নাই । তিনি সসৈন্তে মুন্সেরে উপস্থিত হইয়া, মুন্সের অধিকার করিয়া লইলেন । এই সংবাদ যখন মিরকাশিমের নিকট পহঁচিল, তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলেন । তাঁহার আজ্ঞাক্রমে, সমস্ত ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করা হইল । সুমুক নামক একটা নীচপ্রকৃতি জর্জাণ নবাব সরকারে কাজ করিত । সেই

একদল সিপাহীসহ যাইয়া এই নিষ্ঠুর কার্য সম্পন্ন করিল। এই ভয়াবহ অশুষ্ঠান, কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যা অপেক্ষাও অঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। এই ঘটনা পাটনার নরহত্যা নামে কীর্তিত রহিয়াছে।

১০। ইহার পরে, সত্বরেই ইংরেজ কর্তৃক পাটনা অধিকৃত হইল। মিরকাশিম পলাইয়া অযোধ্যায় যাইয়া শাহ আলম ও সুজা দৌলার সহিত মিলিত হইলেন। তিন জনে মিলিত হইয়া দুই তিন মাস কাল ইতস্ততঃ অভিযান করিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরো বক্সারের নিকটে তাঁহাদিগের দেখা পাইলেন এবং তিন জনকেই সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিলেন। উত্তর ভারতে ইংরেজদিগের আদি ইতিহাসে পলাশির পরে এই বক্সারের যুদ্ধও একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধে ইংরেজেরা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষে দিল্লীর মোগল সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে পরাভূত করেন; এবং সম্রাট প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহা দ্বারা ইংরেজ উত্তরভারতে সর্বপ্রধান শক্তিরূপে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ক্লাইব একবার তাঁহার প্রতি কিরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, শাহ আলম তাহা স্মরণ করিয়া পুনরায় ইংরেজের কৃপা প্রার্থী হইলেন। সুজা দৌল পলাইয়া গিয়া, পুনঃ নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আবার যুদ্ধ হইল। কোরার যুদ্ধে তিনি পুনর্বার পরাভূত হইয়া ইংরেজের নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন। মিরকাশিম, আত্মসমর্পণে সাহস পাইলেন না। তৎকৃত দুর্কাণ্ডের সন্তুষ্টঃ ঘোরতর প্রতিশোধ লওয়া হইবে, তিনি এই ভয়ে ভীত হইয়া, পলায়ন করিলেন। মিরকাশিম কোথায় অস্তিত্বিত হইলেন, ইহার পরে কখন আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(৫৭)

লর্ড ক্লাইব ।

১৭৬৫—১৭৬৭ ।

১। মিরকাশিমের সহিত যুদ্ধ ও পাটনার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইংলণ্ডে পহঁচিলে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্লাইবকে আর একবার ভারতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে লর্ড উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণ বাঙ্গালার গবর্নর ও ইংরেজ সেনার সর্ব-প্রধান সেনা-নায়করূপে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তাঁহাকে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হইল। তৎকালে সমুদ্রপথে ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিত। লর্ড ক্লাইব যখন ভারতে আসিয়া পহঁচিলেন, তখন সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ নিবৃত্তি পাইয়াছিল।

২। তিনি ভারতে আসিয়াই এলাহাবাদে গমন করিলেন। এই সময়ে এলাহাবাদে ইংরেজ শিবিরে শাহ আলম ও সূজা দৌলা উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহাদের একরূপ অবস্থা যে, তাঁহারা যে কোন প্রস্তাবে সম্মতি দানে প্রস্তুত। সন্ধি হইল। এই সন্ধি এলাহাবাদের সন্ধি নামে পরিচিত। লর্ড ক্লাইব সূজা দৌলাকে তাঁহার নিজ রাজ্য অধোধ্যা ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু যে যুদ্ধের অবসানে সন্ধি, সেই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় প্রদানে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইল। ক্লাইব, শাহ আলমকে দোয়াব অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর ভূমি দান করিলেন, এবং মিরকাশিমের রাজ্য, বাঙ্গালা ও বিহার কোম্পানীর ভাগে রাখিলেন; কিন্তু বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা মোগল সম্রাটরূপে শাহ আলমকে দিতে সম্মত হইলেন। শাহ আলম প্রতিদানে কোম্পানীকে

ভার অর্পণ করিলেন । শেষোক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রাদিগের করায়ত্ত ছিল । ইংরেজেরা ইহার পরে, দীর্ঘকাল, উড়িষ্যা হস্তগত করিতে পারেন নাই ।



[শাহ আলম ক্লাইবকে দেওয়ানী সনন্দ দেন]

৩। মিরজাফর এই ঘটনার পূর্বক্ষণেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন । লর্ড ক্লাইব নজুম উদ্দৌলা নামক মিরজাফরের এক পুত্রকে, কোম্পানীর অধীন বাঙ্গালা ও বিহারের নবাব নিযুক্ত করিলেন । তাঁহাকে কতকগুলি দেশীয় কর্মচারীর সাহায্যে রাজ্য-শাসন ও সর্বপ্রকার কর-আদায় করিয়া ইংরেজের হাতে অর্পণ করিতে হইত ।

৪। দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের সংস্কার লর্ড ক্লাইবের শেষ কার্য্য । তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদিগের গুপ্ত ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন এবং দেশীয়দিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগকে কোনরূপ উপহার বা উপঢৌকন লইতে নিষেধ করেন । তাঁহাদিগের বেতন পূর্বাপেক্ষা এই পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, যেন তাঁহারা বিনা ব্যবসায়ে ঐ বেতনের উপর

নির্ভর করিয়াই শ্বখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন। সৈন্তগণ দীর্ঘকাল অবধি ডবল বাট্টা নামে দ্বিগুণ বেতন প্রাপ্ত হইতেছিল। এই প্রথা রহিত হইয়া যায়, এবং ইহাতে সৈনিক বায় অনেকটা কমিয়া আইসে।

৫। লর্ড ক্লাইব যে যে কার্য্য করিবার নিমিত্ত এদেশে আসিয়া-
ছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া

ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। তিনি

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে দীনদরিদ্র কেরানী

রূপে ভারতে আগমন করেন,

এবং ভারতে ফরাশি-শক্তি

বিস্তৃত করিয়া, কাপ্তান ক্লাইব-

রূপে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ণেল

ক্লাইব রূপে দ্বিতীয় বার ভারতে

আইসেন। এইবার তিনি পলাশির

যুদ্ধে জয়লাভ এবং বাঙ্গালা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভিত্তি স্থাপন

করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় বার ভারতে আগমন করিয়া-

ছিলেন। এই সময়ে তিনি লর্ড ক্লাইব। তৃতীয় বার, লর্ড ক্লাইব এদেশে

আসিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বজ্র-সঙ্কল্প ও দৃঢ়হস্ততার সহিত সৈনিক ও

দেওয়ানী বিভাগের সংস্কার করেন। তিনি ভিন্ন এ কার্য্য অত্র কাহারও

দ্বারা সম্পন্ন হইত না। কারণ, কোম্পানীর কর্মচারীরা অত্র কাহারও

ব্যবস্থা মানিয়া লইতে চাহিত কি না, সন্দেহ।

৬। ক্লাইব যদিও সাহসার মধ্যে সাহসী ও বীরসমাজে অগ্রগণ্য

বীর, তথাপি শারীরিক সামর্থ্য তেমন বলশালী ছিলেন না। তিনি

দুর্বল ও রোগা ছিলেন। ভারতের উষ্ণ জল বায়ু ও কঠোর পরিশ্রমে

তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান কালে



[নজুম উদ্দৌলা]

পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই আত্ম হত্যা দ্বারা স্বীয় জীবন শেষ করিয়াছিলেন ।

(৫৮)

আহম্মদ শা আব্দালি ।

১৭৬১ ।

১। নাদির শাহ মৃত্যুর পরেই আফ্গানেরা পারস্তের শাসন শৃঙ্খল হিন্ন করিয়া ফেলে । আহম্মদ আব্দালি নামক জনৈক আফ্গান সর্দার, অশান্ত সর্দারগণ কর্তৃক আফ্গানদিগের রাজ্যরূপে মনোনীত হন । তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভারতের মোগলসাম্রাজ্য হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছে । ইহা দেখিয়া, তাঁহার মনে হইল যে, তিনি সমস্ত হিন্দুস্থান আবার আফ্গানের শাসনাধীন করিয়া মোগলদিগের পূর্বে পাঠান রাজারা যেমন দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তেমনি ভাবে দিল্লীতে রাজত্ব করবেন ।

২। যে সময়ে কাপ্তান ক্লাইব আর্কট অধিকার করিয়া উহার রক্ষা কার্যে নিযুক্ত হিলেন, সেই ১০৫২ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ আব্দালি পঞ্জাব হস্তগত করিয়া সঙ্কল্পিত ভারত-বিজয় কার্য আরম্ভ করেন । ইহার পরে, তিনি হত্যা ও লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে গজনির মহম্মদ ও মহম্মদ ঘোরীর স্ত্রায় হিন্দুস্থানে সৈন্ত চালনা করিতে থাকেন । ক্রমে ছয়বার থাইবার পাসের পথে ভীষণ আফ্গান অশ্বারোহী দল উত্তর-ভারতের সমতল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, হত্যা-লুণ্ঠন-দহন-কার্যে ব্যাপৃত হয় । তাহারা যখন যেখানে আসিল, সেইখানকার হিন্দু মন্দির ধ্বংস অথবা গোবধ দ্বারা উহা অপাবিত্র করিয়া ফেলিল এবং পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু-দিগকে বন্দিরূপে লইয়া গেল ।

পাইলেন যে, আফ্গানদিগের অত্যাচারে উত্তরভারতে চৌধ আদায় করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং আহম্মদ শা ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তরভারত জয় করিয়া লইতেছেন ; তিনি তাঁহাকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত প্রাণ-পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । আহম্মদ শা কিছু দিনের জন্ত তাঁহার রাজধানী কাবুলে চলিয়া গেলে, পেশোয়া তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও বা রঘুবাকে বৃহৎ এক দল সৈন্ত সহ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন । রঘুবা পশ্চিমাভিমুখে পঞ্জাবে অভিযান করিয়া, লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন ।

৪ । আহম্মদ শা এই সংবাদ শুনিয়া, আর ক্ষণ কালও বিলম্ব করিলেন না ; বহুসংখ্যক আফ্গান সেনা লইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিলেন । তিনি এদেশে আসিয়াই রঘুবাকে তাড়াইয়া দিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন । হোলকার ও সিন্ধিয়া, গতিপথে তাঁহাকে বাধা দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আফ্গান সেনার সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তাঁহারা আপন আপন গৃহ,—মালোয়ার পলায়ন করিলেন । ইহার পরে, পেশোয়া, তাঁহার সমস্ত সর্দারদিগকে আপন আপন সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সকলদিকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন । তিনি আফ্গান দিগকে দ্রুতকরণরূপ মহাব্যাপারে তাঁহার সহিত যোগ দান করিবার নিমিত্ত রাজপুতদিগকেও আমন্ত্রণ করিলেন । তাঁহাদিগের অনেকেই এই আমন্ত্রণে তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন । অতঃপর হিন্দু, মহারাষ্ট্রা ও রাজপুতদিগের সমবেত বিশাল সৈন্তদল ভারতসাম্রাজ্যের জন্ত আফ্গানদিগের সহিত সমর-উদ্দেশে সাড়ম্বরে অগ্রসর হইল ।

৫ । ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের বিশাল প্রান্তরে উভয় সৈন্তের সাক্ষাৎকার হইল । এই পানিপথে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর তাঁহার তুর্ক ও আফ্গান ষোদ্ধাদিগের সাহায্যে ইব্রাহিম লোদির সৈন্তদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া

অশ্বারোহিণী গুরুভারান্বিত আফ্গান অশ্বারোহীর সমকক্ষ হইতে পারিল না। দক্ষিণের লোক, উত্তর দেশবাসীর প্রচণ্ড বিক্রমে আবারও নিষ্পেষিত হইল। মহারাট্টাগণ পরাভূত হইলেন। মহারাট্টা দলে ভয়াবহ হত্যা কাণ্ড ঘটিল;—তাহাদিগের দুই লক্ষ লোক রণ-ক্ষেত্রে নিহত হইল।

৬। পেশোয়া এই সংবাদ শুনিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আহম্মদ শাহ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে বুদ্ধি করিলেন না। তিনি কিছুদিনের জন্ত আবার স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই যেন অধিকতর সঙ্গত মনে করিলেন।

৭। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দও ভারত ইতিহাসের একটি অতি বড় প্রসিদ্ধ সময়। এই বৎসর দক্ষিণভারতে ফরাশি-শক্তি পশ্চিমাচারীর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়ে। দক্ষিণাভ্যে নিজাম আলি নামক এক নুতন নিজাম সিংহাসন আক্রমণ করিয়া সলাবত জঙ্গকে নিহত করেন। বুসীর অধীন ফরাশিগণ কর্তৃক সলাবত জঙ্গ পরিরক্ষিত ছিলেন। এদিকে পানিপথের যুদ্ধে আহম্মদ শাহ আব্দালির অধীন আফ্গান কর্তৃক মহারাট্টা শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মহাশক্তিশালী তৃতীয় পেশোয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পরে, যিনি পেশোয়া হইলেন, মহারাট্টাদিগের এই মহাপরাভবের পর, তিনি আর তেমন শক্তিশালী হইতে পারিলেন না। এই বৎসরই হাইদর আলি মহীশূরের সুলতান এবং উত্তরভারতে মিরজাকর পদচ্যুত ও মিরকাশিম বাঙ্গালার নবাব হন। মিরকাশিম বাঙ্গালার নবাব হইয়া এই বৎসরই কোম্পানীকে বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর এই জেলাত্রয়, অর্থাৎ বাঙ্গালার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দান করিয়াছিলেন।

(৫৯)

মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ।

১। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়। কোন প্রকার রাজ-শক্তিতে শক্তিমান মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে তিনিই শেষ। কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষুদ্র শক্তিটুকুও ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ কর্তৃক ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার পরে, ক্রমে দুটি রাজকুমারকে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। এই দুজনের প্রথমটি চক্ষু উৎপাটনে অন্ধীকৃত এবং দ্বিতীয়টি নিহত হন। আফগান ও মহারাষ্ট্রগণ পর পর উত্তরভারত শাসন করিতে থাকে। নিহত সম্রাটের পুত্র শাহজাদা বা রাজকুমার পলাইয়া অযোধ্যার নবাব সুজা দৌলার নিকট গমন করেন। তিনি সুজা দৌলার সহিত মিলিত হইয়া, বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্রাইব উভয়কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এই সকল ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

২। পানিপথের সেই ভয়াবহ সংহার-সময়ের পরে, শাহজাদা শাহ আলম নাম ধারণ পূর্বক দিল্লীর সম্রাট হন। ইহার পরে, তিনি সুজা দৌলার সঙ্গে যুটিয়া পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারও তিনি মেজর কার্ণারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। তিনি দিল্লীগমনে ভীত ছিলেন; সুতরাং অযোধ্যায় বাস করিতে থাকেন।

৩। শাহ আলম ও সুজা দৌলা তৃতীয়বার বাঙ্গালার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এবার মিরকাশিমও তাঁহাদিগের সঙ্গে যুটিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। পর বংশের এলাহাবাদে ক্রাইব তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির সর্বানুসারে, ক্রাইব শাহ আলমকে পঁচিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি-দানে

তত্ত্বাবধানে থাকিতে স্বীকার করেন । তিনি রাজ্যহীন রাজা ছিলেন ।
দিল্লীর সেই মহা মোগল সাম্রাজ্য এইরূপে শেষ হইয়াছিল ।



[শাহ আলম কোম্পানীর সেনা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন]

৪। পানিপথের যুদ্ধের দশ বৎসর পরে, মহারাট্টাগণ পুনরায় পূর্বের
তায় শক্তিশালী হইয়া উঠে । কিন্তু পেশোয়া আর ফিরিয়া তাঁহাদিগের
অধিনায়ক হইতে পারেন নাই । মহারাট্টা, সর্দারদিগের মধ্যে মহাদাজি
সিন্ধিয়া সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন । তিনি এক্ষণ মহারাজা উপাধি
গ্রহণ করিলেন । রাজপুতনার সমস্ত রাজাদিগকে তিনি চৌথ দানে
বাধ্য করিয়া লইলেন । ইহার পরে, সিন্ধিয়া দিল্লীতে যাইয়া, শাহ
আলমকে এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন ।
শাহ আলম তাঁহার অনুরোধে দিল্লীতে চলিয়া আসিলে, সিন্ধিয়া তাঁহাকে
দিল্লীর মোগল সিংহাসনে বসাইলেন । শাহ আলম, বিনা অনুমতিতে ও
ইংরেজ গবর্ণরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এলাহাবাদ ছাড়িয়া যাওয়াতে ইংরেজের

অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলেন । ইংরেজেরা তাঁহাকে যে পঁচিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিতেছিলেন, তাহা বন্ধ হইয়া গেল ।

৫। সিক্কিয়া বহু বৎসর শাহ আলমকে রাজ-বন্দিরূপে রাখিয়া, তাঁহার নামে দিল্লী ও আগ্রার চতুঃপার্শ্ববর্তী ভূমি, দিল্লীর সেই পুরাতন রাজ্যটি শাসন করিতে লাগিলেন । এইরূপে কতিপয় বৎসর অতীত হইয়া গেলে, সিক্কিয়াকে কোন কার্য্য বশতঃ তাঁহার নিজ রাজধানী গোয়ালিয়রে ফিরিয়া যাইতে হইল । তিনি দিল্লী হইতে বহির্গত হওয়া মাত্রই, রোহিলা দেশের জনৈক আফ্গান সর্দার দিল্লীর উপর আপতিত হইয়া, রাজ-প্রাসাদ লুণ্ঠন ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের নয়নদ্বয় উৎপাটন করিল । সিক্কিয়া এই সংবাদ শুনিয়া একদল সৈন্ত সহ ফিরিয়া আসিলেন । সিক্কিয়া ফিরিয়া আসিয়া রোহিলায় সেই আফ্গান সর্দারকে বধ করিলেন, কিন্তু শাহ আলমকে আর তাঁহার নয়নদ্বয় ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না । এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্ত আসিয়া দিল্লী অধিকার করে । তাঁহারা দিল্লী অধিকার করিয়া দেখিতে পান যে, বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম বন্দিভাবে মহারাট্টাদিগের হাতে আছেন । তাঁহারা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং প্রচুর পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন ।

(৬০)

হাইদরআলি ।

মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ ।

১৭৬৭-১৭৬৯ ।

১। মহম্মদ আলি যখন কর্ণাটকের নবাব হন, প্রায় সেই সময়ে হাইদর আলি নামক জনৈক মুসলমান সৈনিকের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । হাইদর আলি ১৭০২ খৃষ্টাব্দে জন্ম ধারণ করেন । তিনি

লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু বড়ই সাহসী ও চৌকস লোক ছিলেন। তিনি দস্যুরূপে জীবন আরম্ভ করেন।

২। হাইদর সত্বরেই একদল লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের নায়ক ও চালক হইয়া বসিলেন। তিনি এই লোকদিগকে বেতন দিতেন, কিন্তু এই বেতন নগদ টাকা নহে, লুণ্ঠন-লব্ধ দ্রব্য। তাহারা গ্রাম্য লোকদিগের মেড়া, গরু, শস্ত ও অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠিয়া লইয়া আসিত এবং যে যাহা লুণ্ঠিয়া আনিত, সে তাহার অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইত, অপরাধী তাহাদিগর কাপ্তান হাইদর গ্রহণ করিতেন।

৩। কিছু কাল পরে হাইদর এই পরিমাণ শক্তিশালী হইলেন এবং এত লোক তাঁহার অধীন হইল যে, মহীশূরের হিন্দু রাজা তাঁহাকে তাঁহার রাজ-সরকারে কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার লোকজনদিগকে বেতন দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। হাইদর উত্তরোত্তর অধিকতর ধনী ও ক্ষমতা-শালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি মহীশূর সেনার সেনাপতি পদে অধিকৃত হইলেন। মহীশূরের রাজা বালক। তাঁহার খুল্লতাত তাঁহার অভিভাবক রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এই সময়ে বালক রাজার সহিত রাজপ্রতিনিধি খুল্লতাতের বিবাদ উপস্থিত হয়। হাইদর রাজার পক্ষ সমর্থনের ভাণ করিয়া, রাজপ্রতিনিধিকে অপদস্থ করেন এবং সমস্ত রাজক্ষমতা আপন হাতে টানিয়া নিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আসীন হন ও বালক রাজাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

৪। হাইদর ক্রমে ক্রিপণ বলশালী ও সাহসী হইয়া উঠিতেছেন, দক্ষিণভারতের অন্যান্য বড় রাজারা ইহা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার এই বর্দ্ধনশীল শক্তির ঋক্সতা সাধন! যে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বুঝিলেন। নিজাম, মহারাষ্ট্রা ও ইংরেজ, এই তিনই তখন দক্ষিণাত্যের প্রবলশক্তিরূপে গণ্য। হাইদর এই সময় পর্যন্ত ইংরেজের সহিত কোন যুদ্ধ করেন নাই; কিন্তু কর্ণাটকের নবাবের অধিকৃত বহু নগর ও

দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কর্ণাটকের নবাব ইংরেজের রক্ষণাধীন ছিলেন। হাইদর যখন নিজামকে আক্রমণ করিলেন, তখন আর ইংরেজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। নিজাম ইংরেজের মিত্র। সুতরাং মাদ্রাজের গবর্ণরঃ হাইদরের বিরুদ্ধে নিজাম ও মহারাট্টাদিগের সহিত সমরে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন। নিজামের সাহায্যার্থ একদল ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হইল। ইংরেজ সেনা নিজামের সৈন্য সহ মহীশূর পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া বাঙ্গালোর অধিকার করিয়া লইল।

৫। এক সঙ্গে তিন প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা কিরূপ দুর্লভ কার্য্য, তাহা না বুঝিতে পারেন, হাইদর এমন অদূরদর্শী লোক ছিলেন না। অতএব, তিনি প্রচুর অর্থ উৎকোচ স্বরূপ দিয়া মহারাট্টাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহারাও অমনি স্বদেশে ফিরিয়া গেল।



৬। মহারাট্টাগণ চলিয়া গেলে হাইদর নিজামের নিকট কতকগুলি চিঠি লিখিলেন এবং এই সকল চিঠিতে এই প্রস্তাব করিয়া পাঠান হইল যে, নিজাম যদি হাইদরের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, তিনি সমগ্র কর্ণাট অধিকারে তাঁহার সহা-

[হাইদর আলি]

য়তা করিবেন। নিজাম এই প্রলোভনে ভুলিয়া নীচবুদ্ধির আশ্রয় লইলেন। ইংরেজসেনাপতি কর্ণেল স্মিথ হাইদরের প্রতিকূলে যে নিজামের সাহায্যার্থ, অত পথ পর্য্যটন করিয়া, মাদ্রাজ হইতে আসিয়া-

ছেন, সেই নিজামের সৈন্যদল, হাইদরের সহিত যোগদান করিয়া, কিরিয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করিতে উত্তত। তিন পরদিন প্রাতে ইহা দেখিতে পাইয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন।

৭। কণেল স্থিতি বাঙ্গালোর পরিত্যাগ করিয়া, মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন। হাইদর আলি ৭০০০০ লোক লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। চাঁদগামা-পাস বা গিরিপথ মহীশূর হইতে কর্ণাটকের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজেরা যখন এই গিরিপথ দিয়া যাইতেছিলেন, হাইদর সেই সময়ে, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন; কিন্তু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া হটিয়া যাইতে বাধ্য হন। তথাপি তিনি ইংরেজের অনুসরণে নিবৃত্ত হইলেন না। ইহার পরে ত্রিনোমালীতে এক প্রবল যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে হাইদর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন।

৮। নিজাম ইহার পরে হাইদরকে পরিত্যাগ করিয়া, যত দ্রুত সম্ভব, হায়দরাবাদে চলিয়া গেলেন। হায়দরাবাদে যাইয়া তিনি ইংরেজের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। ইংরেজ অবশেষে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন।

৯। অতঃপর আর একবৎসর কাল ধীরগতিতে হাইদরের সহিত যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে কেবল ইতস্ততঃ সৈন্যচালনা হইল, হাইদর প্রকাশ্যযুদ্ধে ইংরেজের সম্মুখীন হইলেন না। পরিশেষে তিনি বৃহৎ একদল সেনা লইয়া একবারে মাদ্রাজ অভিযুখে অভিযান করিলেন। হাইদর মাদ্রাজের সমীপস্থ হইয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত গবর্ণরকে অহরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

১০। যুদ্ধ চালাইতে পারেন, গবর্ণরের হাতে তেমন অর্থবল ছিল না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, কোম্পানী, লভ্যাংশ সমস্ত যুদ্ধ-কার্যে ব্যস্ত হইয়াছে দেখিলে, অসন্তুষ্ট হইবেন। বাঙ্গালা ও বোম্বাইর

কারণ, হাইদর সদ্য উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অতএব তিনি হাইদরের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির সর্তাশুসারে প্রত্যেকেই আপন আপন বিজিত দেশ সমূহ ছাড়িয়া দিতে এবং শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

(৬১)

ক্লাইবের পরবর্তী বাঙ্গালার গবর্ণর

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ।

১৭৭২—১৭৭৪ ।

১। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, নজুম উদ্দৌলার বাঙ্গালা-শাসন সুফলপ্রদ হয় নাই। লর্ড ক্লাইব মিরজাকরের পুত্রকে বাঙ্গালার শাসন-কার্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার নীচে দুটি নায়েব বা ডেপুটী নিযুক্ত হন। একজন বাঙ্গালা এবং অন্য জন বিহারের জন্ত। তাঁহারা কর আদায় করিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর সমীপে প্রেরণ করিতেন। গবর্ণর তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের ভৃত্যাদিগকে নির্দিষ্ট বেতন দিয়া দিতেন। আফগান ও মহারাট্টাদিগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালা-রক্ষার জন্ত একদল ইংরেজ সৈন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত।

২। অর্ধ ইংরেজী ও অর্ধ দেশীয় এই শ্রেণীর মিশ্র শাসন-প্রণালী এদেশে ১৭৬৫ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। কিন্তু শাসন-বিষয়ে ইহা সর্বথাই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইল। দেশীয় কর্মচারীরা নিতান্ত মন্দভাবে কাজ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া, কিরূপে নিজে সম্ভব ধনী হইতে পারেন, তাহারই পথ খুঁজিলেন। কারণ, নবাবের ভৃত্যরা, কখন তাঁহাদের চাকরী যায়, এই ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত

পাতিতেন। অতএব লর্ড ক্লাইব দেশীয় কর্মচারীদিগকে বঞ্চিত করিয়া ইংরেজ কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারীই নিজের বেতনে পরিতৃপ্ত ছিলেন না। যিনি যত দূর পারেন, লোকের নিকট হইতে, অবৈধ উপায়ে টাকা আদায় করিয়া লইতে যত্ন করিতেন। প্রায় সমস্ত কর্মচারীই নবাবের নিযুক্ত ও জাতিতে মুসলমান ছিলেন।

৩। অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করিবার নিমিত্তই যেন, এই সময়, বঙ্গদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ১৭৮৯ সনে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়া ১৭৭০ সন পর্য্যন্ত থাকে। ইহাতে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। দেশে কোন ফসল ছিল না, লোকের নিকট হইতে কোন প্রকার কর আদায় হইত না।

৪। এই অবস্থার প্রতিকারার্থ বাঙ্গালায় প্রকৃতই একজন বিশেষ কৃতী ও বিচক্ষণ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই সময়, ঈদৃশ পদের উপযোগী একটি মাত্র লোক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সে লোক মিষ্টার ওয়ারেন হেস্টিংস্। ওয়ারেন হেস্টিংস্ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে যুবক কেরানীরূপে কলিকাতায় আগমন করেন; এবং কালক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে কোম্পানীর সমস্ত জত্যদিগের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্লাইবের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকারী এবং অল্প সময়স্থ ব্যক্তি অপেক্ষা ভারত ও ভারতীয় লোকের রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞাতদার ও অভিজ্ঞ ছিলেন।

৫। প্রথম কার্য্য তিনি এই করিলেন যে, ক্লাইবের মিশ্রশাসন-প্রণালী একবারে রহিত করিয়া দিলেন। দেশীয় নবাব ও নায়বে তিরোহিত, এবং তৎপরিবর্তে বাঙ্গালা ও বিহারের প্রত্যেক জেলায় ইংরেজ কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। জজের কার্য্যও এই কালেক্টরেরাই করিতেন। তাঁহাদিগের আদালতে হিন্দু পণ্ডিত বা মুশিক্ষিত লোক এবং মুসলমান কাজী বা ব্যবহারবিদেরা উপস্থিত

শাসনসিদ্ধা কতকগুলি বিধিব্যবস্থা ও নিয়মাবলী প্রণীত হইল।
কি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে, প্রত্যেকেই যেন, তাহা জানিয়া
লইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই এই সরাসরি আইন প্রস্তুত করা
হইয়া ছিল। অনেক রকমের কর বা টেক্স উঠাইয়া দেওয়া হইল। যে
কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিল, তাহা রীতিমত আদায় হইতে থাকিল। দেশীয়
কর্মচারীরা এখন আর কোন টাকা আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে
ছাপাইয়া রাখিতে পারিতেন না; সুতরাং রাজস্বের আয় বহু পরিমাণে
বাড়িয়া পড়িল।

৬। ঠিক এই সময়েই শাহ আলম ইংরেজের রক্ষণাধীন তাঁহার
আশ্রয় স্থান,—এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া, মহারাট্টা সর্দার সিন্ধিয়াস
আহ্বানে দিল্লীতে পলাইয়া যান। শাহ আলম ইংরেজের নিকট বার্ষিক
যে পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন, গবর্নর হেস্টিংস্ অমনি তাহা বন্ধ
করিয়া দেন। শাহ আলমের পক্ষ হইতে সিন্ধিয়া এই টাকার জন্ত
দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু, শাহ আলম ইংরেজের আশ্রয় ত্যাগ
করা হেতু এই স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং মহারাট্টাদিগের এই টাকার
উপর কোন দাবি, স্বত্ব বা অধিকার নাই, এই হেতু বাদে, সিন্ধিয়ার দাবি
অগ্রাহ্য হয়। এই উপায়ে কোম্পানীর তহবিলে বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ
টাকা বাঁচিয়া যায়।

৭। এই সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদ জেলা অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার
মধ্যবর্তী দোয়াবে শাহ আলমের যে অধিকার ছিল, তাহাও লয়প্রাপ্ত
হয়। কারণ, তিনি সন্ধির সর্ব ভাঙ্গিয়া, দিল্লীতে গমন ও মহারাট্টাদিগের
আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক এ স্বত্বেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই দোয়াব
অতঃপর অযোধ্যার নবাব সুজাদৌলাকে দেওয়া হইল। তিনি
প্রতিদানে কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিলেন।

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কতিপয় বৎসর পূর্বে রোহিলখণ্ড নামক অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমস্থিত এক ক্ষুদ্র রাজ্যে, আফ্গানদিগের এক সম্প্রদায় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারাই রোহিলা নামে পরিচিত। রোহিলারা বহুভাবাপন্ন ও একান্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারাই হিন্দু অধিবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত ও প্রতিনিয়ত উৎপাত করিয়া অযোধ্যার নবাবকে ব্যতিব্যস্ত রাখিত। নবাব রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর হেস্টিংসের নিকট একদল ইংরেজ সেনা প্রার্থনা করিলেন এবং প্রতিদানে তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিলেন। রোহিলাগণ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। পূর্বতন শাসনকর্তার একটি পুত্র ঐ স্থানের নবাব হইলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও রামপুরের নবাব নামে পরিচিত। রোহিলখণ্ডের আফ্গান সেনারা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, শান্তজীবন যাপন করিতে লাগিল।

(৬২)

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ।

প্রথম গবর্ণর জেনেরেল ।

১৭৭৪—১৮৫৮ ।

১। হেস্টিংস্কে বাঙ্গালার গবর্ণর করিবার দুই বৎসর পরে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থায় একটা অতি বড় বৃহৎ পরিবর্তন ঘটিল। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট “রেগুলেটিং এক্ট” নামে একটা নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইন অনুসারে বাঙ্গালার গবর্ণরকে সমস্ত রক্ষাসামগ্রিক ভারতের গবর্ণর জেনেরেল করা হইল। গবর্ণর জেনে-

রেল নিয়োগে কোম্পানীর অধিকার রহিল না, ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিষ্টার বা প্রধান মন্ত্রী গবর্নর জেনেরেল নিয়োগ করিবেন, ইহাই স্থির হইল। কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট বসিল। এই সুপ্রিম কোর্টের জজেরাও ইংরেজ গবর্নমেন্ট কর্তৃক ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন।



[ওয়ারেন হেস্টিংস]

২। গবর্নর জেনেরেলের সাহায্যার্থ একটি কাউন্সিল বা মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। এই সভার সভ্য সংখ্যা হইল চারি জন। কাউন্সিলের সভ্যরাও ইংরেজ গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন।

৩। এই সময় পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্নমেন্ট কোম্পানীর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বণিকদিগের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী, ভারতে যাহা অভিরুচি, তাহাই করিতে পারিতেন। কারণ, তখন তাঁহারা কেবল ব্যবসায়ী বণিক মাত্র ছিলেন। কিন্তু এক্ষণ আর সে অবস্থা নহে; কোম্পানী এখন ভারতে বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিস্বামী হইয়া শাসন-শক্তি হাতে লইয়া বসিয়াছেন; তাঁহারা দেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি-বিগ্রহের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং, তাঁহাদিগের উপরে ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্টের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার থাকা একান্ত আবশ্যক ও সঙ্গত, সন্দেহ নাই।

৪। মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গবর্নরদ্বয় গবর্নর জেনেরেল ও তাঁহার

মন্ত্রী সভার অধীন হইলেন। তাঁহারা গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার কাউন্সিলের অনুমোদন ভিন্ন সন্ধি-বিগ্রহাদি অনুষ্ঠানে অধিকারী রহিলেন না। ইহার পূর্বে প্রত্যেক গবর্ণর আপন ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম করিতেন এবং কেবল নিজ প্রদেশের জন্ত কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট ও সমীচীন, তাহাই চিন্তা করিতেন। কিন্তু এখন যাহারা মিত্র তাঁহারা ভারতব্যাপী সমস্ত ইংরেজেরই মিত্র এবং শত্রু জ্ঞানে যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, তাঁহারা সমস্ত ইংরেজেরই শত্রুস্থানীয়, একরূপ ব্যবস্থাই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

৫। বর্তমান একমাত্র ওয়ারেন হেস্টিংসই গবর্ণররূপে শাসন-কার্যের নিয়ামক ছিলেন, ততকাল প্রত্যেক কার্যই বিনা বাধাটে অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছিল। কিন্তু নূতন আইনের বিধান অনুসারে যে চারি জন মন্ত্রী বা কাউন্সিলার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তাঁহাদিগের সহিত ওয়ারেন হেস্টিংসের মতে ঐক্য হইল না। প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহাদিগের তিন জন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মত দিতে আরম্ভ করিলেন। এই কাউন্সিলারেরা সদ্য ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা এদেশের সকল তত্ত্বেই অনভিজ্ঞ; কিন্তু হেস্টিংস এদেশের সমস্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ, সকল তত্ত্বেই অভিনিবিষ্ট। ফ্রান্সিস্ নামক জনৈক কাউন্সিলার হেস্টিংসের প্রতি দীর্ঘাশ্রিত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, হেস্টিংসের অধঃপাত ঘটাইয়া তিনি স্বয়ং তাঁহার স্থলে গবর্ণর জেনেরেল হন। এই ফ্রান্সিস্ অন্ত্র সভ্যদিগকে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে চালনা করিতেন।

৬। বাঙ্গালা যখন দেশীয় গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন ছিল, তখন নন্দকুমার নামক একটি ব্রাহ্মণ উহার একজন কর্মচারী ছিলেন। এই সময় নন্দকুমার যে ছদ্মকার্য করেন, তজ্জন্ত হেস্টিংস তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই হেতু নন্দকুমার হেস্টিংসকে ঘেঁষ করিতেন। এ দেশে আসিবার অল্পকাল পরেই কাউন্সিলার ফ্রান্সিস্, রাজা নন্দকুমার

বা ননকুমারকে গবর্ণর জেনেরেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনার্থ নিয়োগ করেন। কিন্তু ননকুমার নিজেই শেষে জাল করা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হন। এই অপরাধে তাঁহার ফাঁসী হয়। ফ্রান্সিস্ ছয় কি সাত বৎসর কাল হেষ্টিংসের সহিত ঝগড়া করিয়া অবশেষে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। ফ্রান্সিস্ চলিয়া গেলে, হেষ্টিংস্ কাউন্সিলে আর কোন কার্যে বাধা প্রাপ্ত হন নাই।

৭। হেষ্টিংস্ গবর্ণর জেনেরেল থাকা কালে দুইটি যুদ্ধ ঘটনা হয়। একটি মহারাট্টাদিগের সঙ্গে, অণ্ডটি হাইদর আলির সহিত।

(৬৩)

মহারাট্টাদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ।

১৭৭৪—১৭৮২।

১। চতুর্থ পেশোয়া মধুরাও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন। এই বৎসরই হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়াছিলেন। মধুরাও কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান না। কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন, ইহা লইয়া অত্যন্ত বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার খুল্লতাত রঘুবা অথবা রঘুনাথ রাও আপনাকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। অণ্ডা মহা-



[রঘুবা]

রাউট সর্দারেরা প্রতিবাদিক্রমে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি বোম্বাই গবর্ণ-
মেন্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন।

২। বোম্বাইর গবর্ণর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরে রঘুবীর সহিত
সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি অনুসারে তিনি রঘুবীরকে সাহায্য করিতে
সম্মত হন। রঘুবীর প্রতিদানে, তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত ইংরেজ
সৈন্যের ব্যয় বহন করিতে ও ইংরেজদিগকে বোম্বাইর অঙ্গলগ্ন সালসিতি ও
বেসিন নামক দ্বীপ দুটি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। এই দ্বীপ দুটি পরে
বোম্বাই নগরের এক অংশ হইয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী পেশোয়ারদিগের
নিকট হইতে এই দুটি দ্বীপ ক্রয় করিয়া লইবার নিমিত্ত ইংরেজগণ পুনঃ
পুনঃ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই উহা বিক্রয়
করিতে সম্মত হন নাই।

৩। নূতন আইন অনুসারে এই সন্ধি করিবার পূর্বে বোম্বাই
গবর্ণমেন্টের, ইণ্ডিয়া বা ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সন্ধির জন্য
অনুমতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।
তাঁহারা ইংলণ্ড কোম্পানীর নিকট এ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন।
কিছুকাল পরে, কলিকাতার ভারত গবর্ণমেন্ট এই সন্ধির বিষয় শ্রুত
হইলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহা মঞ্জুর করিতে স্বীকার করিলেন না।
তাঁহারা ইহার পরিবর্তে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুরন্দরে রঘুবীর বিপক্ষদিগের
সহিত আর এক সন্ধি করিলেন। নানা ফার্নভিস্ নামক জনৈক
ব্রাহ্মণ এই বিপক্ষদিগের সর্দার। তিনি ও সালসিতি ছাড়িয়া দিতে
সম্মত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী সুরাটের
সন্ধির সংবাদ পাইলেন। সালসিতি ও বেসিন পাওয়ার প্রস্তাবে তাঁহারা
একান্ত প্রীত হইলেন এবং সন্ধি অনুমোদন করিয়া তদনুসারে কার্য
করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

৪। বোম্বাইগবর্ণমেন্ট ও ভারতগবর্ণমেন্ট, কাজে কাজেই

রঘুবীর সহিত প্রথম সন্ধি অনুসারেই কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। বোম্বাইর সেনা

রঘুবীরকে পুনায় লইয়া যাইতে আসিল। কিন্তু সিন্ধিয়ার অধীন বৃহৎ এক দল অশ্বারোহী কর্তৃক তাহারা পশ্চাৎ অপসারিত হইতে বাধ্য হইল। এদিকে হেষ্টিংস কলিকাতা হইতে সাহসী সৈনিক কাপ্তান পপ্‌হামকে পাঠাইয়া সিন্ধিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়রের সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ের মধ্যে মহারাট্টাগণ ও হাইদর আলি ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। হাইদর



[নানা ফার্নভিস্]

এইরূপে অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া কর্ণাটিকা আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হাইদর মানবলীলা সংবরণ করিলেন। নানা ফার্নভিসের অধীন মহারাট্টা সর্দারগণ হাইদরের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়াই সন্ধি করিলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সাল্বাইতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে ইংরেজ ও মহারাট্টা পরস্পরের বিপক্ষকে সাহায্য না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। রঘুবীরকে পেন্সন দেওয়া হইল। ইংরেজ সাল্‌সিতি ও বেসিন হস্তগত করিলেন।

(৬৭)

মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ ।

১৭৮০—১৭৮৩ ।

১। দশ বৎসর কাল হাইদর আলি ইংরেজের সহিত সন্ধি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি ক্রমেই অধিকতর বল-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। হাইদর সমস্ত পলিগার এবং মহীশূর, মালাবার ও কানারার রাজাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্ত দল অতিবড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের দ্বারা তিনি তাঁহার সেনাদিগকে শিক্ষিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার একশত কামান ও ৪০০ ফরাশি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র একদল ফরাশি সৈন্ত ছিল।

২। হাইদর জানিতেন যে ইংরেজেরা মহারাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। অতএব তিনি এই সময়ে মাল্ভাজ জয় করা সহজ-সাধ্য মনে করিলেন। তিনি গোপনে নিজামের নিকট ও মহারাট্টাদিগের সমীপে পত্র লিখিলেন। এই পত্রে দক্ষিণভারত হইতে ইংরেজদিগকে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহায় হইবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে অরুরোধ করা হইল। ইহার পরে, তিন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষ লোক লইয়া ঝটিকাবেগে কর্ণাটকের উপরে আপতিত হইলেন। তাঁহাকর্তৃক কৃষ্ণা নদী হইতে কাবেরী পর্যন্ত সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত হইল। গ্রাম সকল ভস্মীভূত, শস্ত বিনষ্ট, গো মেষাদি পশুপাল বিতাড়িত, মনুষ্য নিহত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুগণ বন্দিভাবে স্থানান্তরিত হইল। হাইদর, কৃত নিষ্ঠুর আক্রমণের ফল স্বরূপ সে দেশে এক অতি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই আক্রমণের ভীষণ কাহিনী, পরবর্তী অন্ধশতাব্দী কাল লোকের মুখে মুখে কথিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

৩। মাল্ভাজের গবর্নর, যাহার দল পলায়ন করিয়াছিল।

সেনাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া ছিল। কর্ণেল বেইলির অধীন ক্ষুদ্র এক দল সেনা, উত্তরসরকার হইতে মাল্ভাভের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছিল। পল্লিলুরে হঠাৎ হাইদর বৃহৎ এক দল সেনা লইয়া এই ক্ষুদ্র দলকে আক্রমণ করেন। কর্ণেল বেইলি বৃদ্ধ ও দুর্বল ; এবং ক্রাইবের জায় সাহসী ও কন্ঠ নহেন। তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার ক্ষুদ্র সেনা হাইদরের ঐ মৈত্র সমুদ্রের সম্মুখীন হওয়ার পক্ষে সংখ্যায় নিতান্তই হীন ও অপরিপািত। সুতরাং তাঁহার সৈন্তগণ যুদ্ধার্থ একান্ত উৎসুক সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। কাহাকেও প্রাণে হত্যা করা হইবে না, হাইদরের এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়াই, আত্মসমর্পণ করা হইল। হাইদর কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক হাইদর কর্তৃক অতি নির্দয়রূপে অধিকাংশ নিহত এবং অবশিষ্ট বন্দিরূপে মহীশূরের কারাগারে প্রেরিত হইল। কর্ণেল বেইথ ওয়েটের অধীন আরও এক ক্ষুদ্র সেনা দলের ভাগ্যে, ঠিক এই অবস্থায় এমনই দশা ঘটয়াছিল।

৪। কিন্তু, এই সময়, ওয়াশি ওয়াসের বিজয়ী বীর শ্রর আইয়ার কুট বাঙ্গালা হইতে একদল নূতন ও তেজস্বী সেনা লইয়া আসিতে- ছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে পোর্টোনভোতে তাঁহার সহিত হাইদরের দেখা হইল। হাইদরের সমগ্র বাহিনী তাঁহার সঙ্গে ছিল। শ্রর আইয়ার কুট এই স্থানে তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। ইহার পরে, পল্লিলুরের যে স্থানে পূর্ব বৎসর হাইদরকর্তৃক কর্ণেল বেইলির সৈন্তগণ ধণ্ডবিধণ্ড হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে হাইদর কুটের নিকট পুনরায় পরাভূত হইলেন। অতঃপর সোলিসুরে আবার তাঁহার পরাভব ঘটিল। পর বৎসর আর্গিতে আরও এক যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইলেন।

৫। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই হাইদরের মৃত্যু হয়। ১৭৮৪

এই সন্ধির সর্তানুসারে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যুদ্ধে অধিকৃত ও বিজিত দেশ ও নগর সমূহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। মহীশূরের ইংরেজ বন্দী কারামুক্ত হয়।

(৬৫)

বোর্ড অব্ কন্ট্রোল

বা

শাসনী-সমিতি ।

১৭৮৪ ।

১। মহীশূর ও মহারাষ্ট্রসমরে প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে। কোন দিক্ হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করা হেষ্টিংসের পক্ষে একদণ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। হাইদরের সহিত যত যুদ্ধ হইয়াছিল, কর্ণাটক রক্ষা করা তৎসমস্তের একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলি যুদ্ধের ব্যবস্বরূপ ইংরেজকে কপর্দকও দিতে সমর্থ নহেন। কারণ, তাঁহার দেশ একবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে। দেশ ব্যাপিয়া এবল ভূভিক্ষ। বিপন্ন প্রজা কোনরূপ কর-দানে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

২। মাদ্রাজ হইতে অর্থ সংগ্রহের কোনই সম্ভাবনা না দেখিয়া হেষ্টিংস্ সুজাদৌলার পুত্র অযোধ্যার নবাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নবাবপুত্র কোম্পানীর নিকট ধনী। ধনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। হেষ্টিংস্ ধনপরিশোধের জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নবাব বলিলেন, তাঁহার পিতা রাজকোষে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমস্ত অযোধ্যার বেগমদ্বয়, তাঁহার মাতা ও পিতামহী আশ্রসাৎ করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অমনি অনুমতি প্রদত্ত হইল। নবাব বেগমদিগের নিকট হইতে টাকা বাহির করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের ভৃত্যদিগকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর-

ভাবে পৌড়ন করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্যই হেষ্টিংসের অপরাধ নহে। কিন্তু তাঁহার পুরাতন শত্রু ফ্রান্সিস্ প্রকাশ করিলেন যে, ইহা হেষ্টিংসের দোষেই ঘটয়াছিল।

৩। ইহার পরে, হেষ্টিংস্ বেনারসের রাজা চেং সিংহের নিকট কোম্পানীর সাহায্যার্থ কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি ইংরেজ কর্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ইংরেজকে কর দিতেন। যুদ্ধের সময়, ইংরেজের সাহায্য করা তাঁহার কর্তব্য ছিল। কারণ, ইংরেজের শত্রু মহারাট্টাগণ কাশীরাজ চেং সিংহেরও শত্রু। ইংরেজসেনা প্রতিকূলে দণ্ডায়মান না হইলে, মহারাট্টাগণ তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইত, অথবা তাঁহাকে চৌধ দানে বাধা করিত। রাজা যদিও অর্থশালী ছিলেন, তিনি কিছুই দিতে সম্মত হইলেন না। হেষ্টিংস্ তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বেনারস গমন করিলেন। রাজা ও বেনারসের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হেষ্টিংস্ প্রায় প্রাণে মারা পড়িতেছিলেন। ভাগ্যগুণে সারিয়া আইসেন। চেং সিংহকে অতঃপর সিংহাসন-চ্যুত করিয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজা করা হয়। ফ্রান্সিস্ ইহাতেও হেষ্টিংস্ অস্ত্রার করিয়াছেন বলিয়া, দোষারোপ করিলেন।

৪। মিষ্টার ফ্রান্সিস্ ইংলণ্ডে যাইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের কৃত-কর্ম সম্পর্কে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা মিষ্টার ফ্রান্সিসের উক্তি প্রকৃত মনে করিয়া তীব্রভাষায় গবর্ণর জেনেরেলের প্রতি দোষারোপ করিয়া পাঠান। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ইহার পরে কাজ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাঁহার বিচার হয়। সাত বৎসর কাল এই বিচার-কাণ্ড চলিয়াছিল। শেষে তাঁহার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ উপস্থিত ছিল, সেই সমস্ত অভিযোগগুলি তিনি নিরপরাধ পতিপন্ন হন।

৫। এই সময়ে, ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রাইম্‌মিনিষ্টার বা প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার পিট্‌ একটা নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন পিটের 'ইণ্ডিয়া বিল' নামে পরিচিত।

৬। পিট্‌ কৃত ইণ্ডিয়া বিলের বিধান অনুসারে এক বোর্ড অব্‌ কন্ট্রোল বা শাসনী-সমিতি গঠিত হয়। ইহার সভ্য ছয় জন। ভারত গবর্ণমেন্টকে সংযত বা শাসিত রাখাই এই সমিতির কর্তব্য। কোন ভারতীয় রাজার সহিত, ব্রিটিশ্‌ পার্লামেন্টের অনুমোদন ভিন্ন, একজন আর ভারত গবর্ণমেন্টের সন্ধি বিগ্রহে স্বেচ্ছায় অনুমতি দিবার ক্ষমতা রহিল না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বোর্ড অব্‌ কন্ট্রোল বা শাসনী-সমিতিই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ্‌ ইণ্ডিয়ার শাসন কার্যে ব্রতী হইলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আর তত প্রভুত্ব থাকিল না।

(৬৬)

দ্বিতীয় গবর্ণর জেনেরেল

লর্ড কর্ণওয়ালিশ।

১৭৮৬—১৭৯৩।

১। ইহার পরবর্তী গবর্ণর জেনেরেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ। লর্ড কর্ণওয়ালিশ, সম্রাট ইংরেজ লর্ড বা ভূস্বামী। তিনি পূর্বে আর কখনও ভারতে আগমন করেন নাই। ভারতে আসিয়াই তাঁহাকে মহীশূরের সঙ্গে যুদ্ধের জ্ঞান প্রস্তুত হইতে হইল।

২। টিপু আট বৎসর অবধি মহীশূর শাসন করিতেছিলেন। তিনি মালবার, কুর্গ এবং মহীশূরের চতুঃপার্শ্ববর্তী অগ্ৰাণ্ড কএকটি দেশ জয় করেন। এই হেতু টিপু আপনাকে ভারতে সর্বা-পেক্ষা বেসী প্রতাপাধিত রাজা মনে করিয়া গর্বে ক্ষীত হইয়া উঠেন। তিনিও আওরঙ্গজেবের তায়, বিজিত দেশের লোকদিগকে বলপূর্বক মুসলমান করিতে প্রয়াসপূর হইলেন। বাহারা মুসলমান

হইতে চাহিল না, তাহাদিগের অনেকে তাঁহা কর্তৃক নিহত হইল।
টিপু ইংরেজদিগকে ঘৃণা করি-
তেন, এবং প্রকাশভাবে বলি-
তেন, তিনি ইংরেজদিগকে,
একদিন, এদেশ হইতে তাড়াইয়া
দিবেন ।



৩। অবশেষে টিপু ত্রিবাঙ্কুর
আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুরের
রাজা ইংরেজের মিত্র ও সহ-
যোগী ছিলেন। তিনি টিপুর
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার
নিমিত্ত ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী
হইলেন। গবর্ণর জেনেরেল
তাঁহাকে সাহায্য করিবেন

[লর্ড কর্ণওয়ালিশ্]

বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। নিজাম ও মহারাট্টাগণ তাঁহাদিগের
সাধারণ শত্রু টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিতে
প্রস্তুত আছেন কিনা, ইহা জানিবার জন্ত তাঁহাদিগের নিকট পত্র
প্রেরিত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ সহকারে ইংরেজের সঙ্গে যোগদান
করিলেন। ইহার পরে টিপুকে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার উপর উপদ্রব করিতে
নিষেধ করা হয়। টিপু এ নিষেধ অগ্রাহ্য করিলে, যুদ্ধ ঘোষণা
হইল। ইংরেজের সঙ্গে মহীশূরের এই তৃতীয়বার যুদ্ধ।

৪। টিপু প্রথম উত্তমে দশ বৎসর পূর্বে হাইদর আলি যাহা
করিয়াছিলেন তাহাই করিলেন। কণীটিক তাঁহা কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল।
ইংরেজ সৈন্য চালনার জন্ত স্বয়ং লর্ড কর্ণওয়ালিশ্ কলিকাতা হইতে
মান্দ্রাজে চলিয়া আসিলেন। তিনি মহীশূর অভিযুখে অভিযান করিয়া

বাঙ্গালোর অধিকার করিয়া লইলেন। নিজাম ও মহারাষ্ট্রাগণ যে গৈত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন কাজে আসিল না। তাহারা লুণ্ঠনের সময় ছুটিয়া আসিত; কিন্তু যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কঠোর রণ-কার্য ইংরেজদিগকেই সম্পন্ন করিতে হইল।

৫। লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাঙ্গালোরের নিকটবর্তী কতকগুলি অদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিলেন। ইহার পরে, তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন পর্য্যন্ত আসিয়া পহঁচিলেন। টিপু সমস্ত সেনা



[টিপু ।

পরাজিত ও নগর অভ্যন্তরে তাড়িত হইল। ইংরেজের কামান নগর প্রাচীরের উপর গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। টিপু সম্বরেই দুর্গ অধিকৃত হইবে বুঝিতে পাইয়া যে কোন সর্তে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

৬। শ্রীরঙ্গপত্তনে সন্ধি হইল। টিপু, ইংরেজ ও ইংরেজের সহযোগী মিত্রগণের মধ্যে সন্ধি। টিপু তাঁহার রাজ্যের একাধি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য

হইলেন। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তাঁহাকে তিন সহস্র লক্ষ বা তিন কোটি টাকা দানে অঙ্গীকার করিতে হইল। কথা হইল ইহার একাধি তখনই দিবেন, অপরাধি যাবৎ না পরিশোধ হয়, তাবৎ তাঁহার দুটি পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিতে হইবে।

৭। টিগু যে রাজ্য ছাড়িয়াছিলেন তাহা ইংরেজ, নিজাম ও মহারাষ্ট্র। এই তিনের মধ্যে সমান তিন ভাগে বিভক্ত হইল। প্রকৃত প্রকারে শেষ দুই পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুই পাইবার যোগ্য কাজ করেন নাই। পশ্চিম উপকূলবর্তী মালাবার দেশ, এবং অধুনা সালেম ও মাদুরা নামে পরিচিত কর্ণাটিকের জেলাদ্বয় ইংরেজের ভাগে পড়িল।

৮। বঙ্গদেশে ভূমির কর কি ভাবে আদায় হইবে, কর্ণওয়ালিশ তাহা স্থির করিয়া দেন। মোগলদিগের রাজত্বকালে জমিদার বা ভূম্যধিকারীদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করা হইত। তাঁহারা নবাবকে নির্দিষ্ট কর দিতেন। কিন্তু এই কর আদায়ের বেতন স্বরূপ ভূম্যধিকারীরা প্রজার নিকট যত ইচ্ছা আদায় করিয়া লইতেন। ভূমির প্রকৃত মালিক সম্রাট, জমিদারেরা তাঁহার বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রজাদিগকে কৃতদাসের স্থায় দেখিতেন এবং তাহাদিগের প্রতি একান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাণ অংশরূপে প্রজার নিকট এত অত্যধিক দাবি, ও তাহাদিগ হইতে এত বেশী টাকা আদায় করিয়া লইতেন যে, উপায়হীন প্রাণ্য লোকেরা দার-পর-নাই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ বিষয়ে রাজ্যের সকল দিক হইতেই ইংরেজ গবর্ণমেন্ট সমীপে আবেদন ও অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল।

৯। লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই সকল অভিযোগের মূল উৎপাতন ও ঐ সমস্ত উপদ্রবের শান্তি বিধানার্থ যে জমিদার যে ভূমিতাগের কর সংগ্রহ করিতেন, সেই ভূমিও তাঁহাকেই দান করিয়া, উহা একবারে তাঁহার নিজস্ব করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে যে ভূমির অন্ত গবর্ণমেন্টকে যে কর দিতে হইবে, তাহারও একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট ও উহা চিরস্থায়ী করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বঙ্গদেশে একশ্রেণীর

অমিদারেরা একশ ইংলণ্ডের লর্ড বা 'নোবল'দিগের জ্ঞান ভূস্বামীরূপে এ দেশে সম্মানিত আছেন। এই ভূস্বামিগণ তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি জয় বা জয় করিয়া উহার অধিকারী হন নাই। তাঁহারা ইহা ইংরেজ গবর্ণমেন্ট হইতে বিনা মূল্যে দান স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১০। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন কালেক্টার ও বিচার-কার্যের জন্য একজন নিযুক্ত করেন। লর্ড ক্লাইব বিচারকার্য ও রাজস্ব আদায় এই উভয় কার্য একই ব্যক্তির হস্তে সম্বৃত্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু একব্যক্তি এই দ্বিবিধ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না দেখিয়াই, জজ ও কালেক্টারের পদ পৃথক করা হইল।

(৬৭)

তৃতীয় গবর্ণর জেনেরেল,—সার জন শোর।

১৭৯৩—১৭৯৮।

১। তৃতীয় গবর্ণর জেনেরেল সারজন শোর। তিনি কলিকাতার কোম্পানীর অধীন সিভিল সারভেণ্ট ছিলেন। সার জন শোর পাঁচ বৎসরকাল গবর্ণর জেনেরেলের কার্য করেন। তাঁহার সময়ে ইংরেজেরা কাহারও সহিত কোনরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই; বৃটিশ ইণ্ডিয়ার শাসন-কার্যেও বৃহৎ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

২। কোন দেশীয় রাজার কোন বিষয়ে কোন প্রকারে গবর্ণর জেনেরেলের হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে, এই মর্মে ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট দৃঢ় অনুরক্তা প্রচার করিয়াছিলেন। এদেশের বড় বড় দেশীয় রাজগণ তখন যেমন ছিলেন, তাঁহাদের ঠিক তেমনই থাকা উচিত; কেহই যেন প্রবলতর অথবা হীনতর হইয়া না পড়েন, এরূপ হইলেই সর্বত্র শান্তি বিদ্যমান থাকিবে; ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের ইহাই কথা, ইহাই তাঁহা-

৩। কিন্তু নিজাম, মহারাট্টাগণ ও টিপু শান্তি চাহিতেছেন না। টিপু তাঁহার নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারার্থ উৎসুক। অতদিকে মহারাট্টাগণ টিপু, নিজাম, এবং ভারতের অন্ত সমস্ত লোক হইতে চৌধ আদায় করিবার নিমিত্ত বন্ধপরি কর। নিজাম মহারাট্টাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষসমর্থনার্থ ইংরেজের নিকট সাহায্য প্রার্থী।

৪। মহারাট্টাগণ যখন বুঝিতে পাইল যে, ইংরেজ নিজামের সহায়তা করিবেন না, তখন তাহারা নিজামের নিকট বহু বৎসর অবধি তিনি যে চৌধ দিতেছেন না, সেই চৌধ দাবি করিয়া বসিল। নিজাম চৌধ দিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁহার তহবিলে টাকা ছিল না। যুদ্ধ করিতেও তিনি অসমর্থ ছিলেন। অতএব তিনি গবর্ণর জেনেরেলের নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু সার জন শোর প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন না।

৫। ইহার পরে, পেশোয়া অন্তান্ত মহারাট্টা সর্দারদিগের নিকট দূত পাঠাইলেন। ভীমবিক্রমে নিজামকে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এই আক্রমণে পেশোয়ার সহিত যোগদানের অন্ত মহারাট্টা সর্দারদিগকে অনুরোধ করা হইল। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, গুজরাট ও বিস্ফার হইতে সর্দারগণ আপন আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে এক মহাবাহিনী সংগৃহীত হইয়া মহাবিক্রমে নিজামকে আক্রমণ করিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কুর্দলাতে এক প্রবল যুদ্ধ হয়। নিজাম পরাভূত হইলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের একাধি মহারাট্টাদিগের হাতে সমর্পণ ও অপরাধের অন্ত চিরকালের তরে রীতিমত চৌধ দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

৬। এই ঘটনার পরে মহারাট্টা সর্দারেরা লুণ্ঠের অংশ লইয়া পরস্পর

সিদ্ধিলা, হল্কার, গাইকোয়ার এবং ভোঙ্গলা প্রভৃতি পরস্পর যুদ্ধ করিয়া আপন আপন শক্তি ক্ষয় করিলেন ।

(৬৮)

চতুর্থ গবর্ণর জেনারেল,—মার্কুইস্ ওয়েলেস্লি ।

১৭৯৮—১৮০৫ ।

১। পরবর্তী গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস্ ওয়েলেস্লি । তিনিই ইংরেজকে ভারতে প্রবর্তন শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন । তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণেল ওয়েলেস্লিও এদেশে আসিয়াছিলেন । কর্ণেল ওয়েলেস্লি সাহসী বীর পুরুষ । তিনি শেষে সার আর্থার ওয়েলেস্লি নামে প্রসিদ্ধ এবং কালে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ও ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিষ্টার বা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন ।

২। এক পরিবারের সমস্ত সন্তান পরিবারের প্রধান পুরুষ পিতার আজ্ঞাবাহী হইয়া চলে । পিতা তাহাদিগের সকলকেই সৎপথে চালনা করেন । যদি কোন সন্তান অশাস্ত্র বা অসঙ্গত কার্য্য করে, পিতা তাঁহাকে শাস্তি দেন । তিনি সকলের সংবাদ লন ও সকলকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং কি করা উচিত, ও কি করা অসুচিত প্রতিনিয়ত, তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেন ।

৩। সন্তান যেমন পিতাকে মানিয়া চলে, সুগঠিত রাজ্যের প্রজারাও তেমন রাজার মুখপ্রেক্ষী ও আজ্ঞাবাহী হইয়া থাকে । রাজা তাহার প্রজাদিগকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন ; যাহারা মন্দ পথে চলে, তাহাদিগকে শাস্তি দেন এবং দুর্বল ও বিপন্নকে আশ্রয় দিয়া রাখেন । সুতরাং তাঁহার প্রজারা নিয়তই নিরাপদে থাকে ও শান্তিতে বাস করে ।

৪। ভারতের ভার বিশাল রাজ্যেও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক । যদি ভার-

তাহা হইলে একজন অতি দৃঢ়, সৎ ও গ্ৰায়পর শাসনকর্তা অথবা সকলে মানিয়া চলে এমন একজন অধিরাজের প্রয়োজন । তিনি এতদূর শক্তিশালী ও প্রতাপাবিত হইবেন, যেন দেশের শক্তিশালী রাজ্য-বর্গ ও তাঁহার আজ্ঞাপালনে বাধ্য হন এবং তিনি সমস্ত দস্যু তস্করদিগকে দমিত রাখিয়া সর্বত্র শান্তি রক্ষা করিতে পারেন । তাঁহাকে এই পরিমাণ ধনসম্পন্ন হইতে হইবে যেন, তিনি দুর্ভিক্ষের সময়, দরিদ্র প্রজাদিগকে অন্নদান করিতে সমর্থ হন । এ সকলের উপরে তাঁহাকে এই পরিমাণ জ্ঞানী ও গ্ৰায়পর ও সৎ হইতে হইবে যে,



[মার্কুইন্স ওয়েলেস্লি]

প্রজাবর্গের অনুসরণার্থ তিনি যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তৎসমস্ত যেন সর্বথা গ্ৰায়োপেত ও মঙ্গলপ্রদ হয় ।

৫। ইংরেজকেও যে একদিন সম্রাট্ আকবরের গ্ৰায় সমগ্র ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করিতে হইবে, ওয়েলেস্লির ভারতে আগমনের পূর্বে ইংরেজেরা মনেও তাহা কল্পনা করেন নাই । তাঁহারা ভারতের কতকগুলি দেশ অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাঁহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়ে ঠেকিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে । তাঁহারা আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন । এই আত্মরক্ষার পরিণাম হইয়াছে রাজ্যলাভ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইতে উৎসুক ছিলেন । আরও রাজ্য লাভ ঘটুক, এরূপ তাঁহা-

দিগের অভিপ্রায় ছিল না। এই কারণে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ক্লাইব, হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিশ এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য গবর্নরদিগকে কোন কারণে কোন দেশীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হইতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোন দেশীয় রাজ্য অধিকার করিতে দৃঢ় নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

৬। কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি দেখিতে পাইলেন যে, ভারতে বাহাদিগের হাতে কোন না কোনরূপ শাসন-দণ্ড পরিচালিত হইতেছে, ইংরেজ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্কাপেক্ষা বেশী প্রতাপাবিত, সর্কাপেক্ষা অধিক সভ্য এবং অধিকতর বুদ্ধি ও জ্ঞানবলসম্পন্ন। অতএব ভারতের সর্বত্র যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও নরহত্যা চলিতেছিল, এবং ভারতের প্রত্যেক অঙ্গই যে, ক্রমশঃ অধঃপাতের দিকে দ্রুত ডুবিয়া যাইতেছিল, ইংরেজের পক্ষে ইহার প্রতিকূলে দণ্ডারমান হওয়া আবশ্যিক। এক্ষণ সে সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। বাহাতে ভারতের বড় বড় রাজগণ গবর্নর জেনেরেলের আদেশ মানিয়া চলেন, বাহাতে তাঁহারা আর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হইতে দৃঢ়সকল হন, ও বাহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য যথাযুক্তরূপে শাসন করিতে থাকেন এবং কেহ গবর্নর জেনেরেলের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিলে বাহাতে তিনি শেষে উহা মানিয়া লইতে বাধ্য হন, প্রথমতঃ ওয়েলেসলিকে তজ্জগুই প্রয়াসপর হইতে হইল। সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষার্থ তিনি একদল সৈন্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সৈন্তের ব্যয় অংশ অংশ রূপে প্রত্যেক দেশকে বহন করিতে হইত। ইংরেজ সেনা এই ব্যয়ের প্রতিদানে যখন যে দেশে শত্রুদল আসিয়া হানা দিত, সেইখানেই উপস্থিত হইত এবং সেই শত্রুদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আসিত।

৭। এই সময়ে মহারাষ্ট্রাগণ তাহাদিগের পক্ষ সর্দার পেশোয়া,

এক প্রবল শক্তিরূপে বিরাজমান ছিল ; আর ছিলেন নিজাম ও টিপু সুলতান । শিখদিগেরও ক্রমে অভ্যুত্থান হইতেছিল ; কিন্তু তাহারা তাহাদিগের স্বদেশ পঞ্জাবের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাহিরে শক্তি বিস্তারে যত্ববান হইয়া নাই । মোগল সম্রাট শাহ আলম উপায়হীন বৃদ্ধ । তিনি সিদ্ধিয়ার হাতে রাজবন্দিরূপে আবদ্ধ ছিলেন । অযোধ্যার নবাবের প্রতাপ ও শক্তি গণনার যোগ্য ছিল না ।

৮ । ঠিক এই সময়েই ফরাশিজাতি, ইউরোপে তাহাদিগের রাজা ও রানীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলেন । নেপোলিয়ন নামক জনৈক ফরাশি সেনাপতি ফ্রান্সের শাসনকর্তা হন । নেপোলিয়ন ইউরোপের নানা দেশ জয় করেন ও ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন । তাহার সেনাদল যুদ্ধে অটল ও দৃঢ় ছিল । তিনি বলিতেন যে, তিনি ইংলণ্ড আক্রমণ ও জয় করিবেন ।

৯ । লর্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন যে, নিজাম, টিপু ও সিদ্ধির সকলেরই অত্যন্ত দৃঢ়গঠিত সেনা আছে এবং এই সকল সেনা কুচ কাওয়াত ও রণকার্যে ফরাশিদিগদ্বারা সুশিক্ষিত হইয়াছে । ফরাশিদিগের সেই অধিতীর সেনাপতি নেপোলিয়ন মিশরে উপস্থিত হইয়াছেন । টিপু নেপোলিয়নের নিকট পত্র লিখিয়াছেন । এই পত্রে নেপোলিয়নকে টিপুর সাহায্যার্থ ভারতে আসিয়া ইংরেজদিগকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে । নেপোলিয়নও প্রত্যুত্তরে তাহার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । কিন্তু একদল ফরাশি সেনা মঙ্গালোরে অবতরণ করিয়াছে । কিন্তু তাহারা পন্ডিচরীতে গমন করিতে পারে নাই, কারণ, ইংরেজেরা পূর্বেই পন্ডিচরী অবরোধ করিয়াছিলেন ।

১০ । এই সকল ঘটনা দেখিতে পাইয়া গবর্নর জেনারেল নিজাম, টিপু ও পেশওয়ার নিকট পত্র লিখিলেন । পেশোয়া এখনও সমগ্র

মহারাট্টাদিগের চালক ও নায়করূপে সম্মানিত ছিলেন। পক্ষে প্রত্যেকের নিকট তাঁহার সরকারে যে সকল ফরাশি নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে লেখা হইল, কারণ, ফরাশিরা এক্ষণ ইংরেজের যারায়ক শত্রু। এই সঙ্গে, প্রত্যেককে তাঁহার নিজ রাজ্যের শান্তি বিধান ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য দৃঢ় এক দল ইংরেজ সৈন্য আপন আপন ব্যয়ে নিজ রাজ্যে রাখিতে অজরোধ করা হইল। দেশীয় শাসনকর্তাদিগের সহায়তা করাই এইরূপ সৈন্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলিয়া, এই শ্রেণীর সৈন্যদল সবসিডিয়ারী বা সহায়কারী সেনা এবং এই পদ্ধতিটি ওয়েলেস্লি কৃত সবসিডিয়ারী পদ্ধতি নামে পরিচিত হইয়া ছিল।

১১। ইহাদিগের মধ্যে নিজামই সর্বাপেক্ষা হীনবল ও মহারাট্টাদিগের ভয়ে সর্বদা জড়মড় ছিলেন। তিনি ওয়েলেস্লির প্রস্তাব শ্রবণ মাত্রই উহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন; এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজ যদি তাঁহাকে মহারাট্টাগণের আক্রমণ ও চৌধুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি আফলাদ সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত আছেন। তাঁহার ফরাশি সেনাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। নিজামের সম্মতি পাইয়াই একদল ইংরেজ সেনা হায়দরাবাদে যাইয়া স্থান লইল। নিজামের শত্রুভয় সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল। তাঁহারা এই সময় হইতেই ইংরেজের অবিচল সূত্র ও সহকারী থাকিয়া শাস্তিতে স্বরাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন। যদি টিপু ও মহারাট্টা সর্দারেরাও ওয়েলেস্লির এই হিতকর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহারাও নিজামের শত্রু নিরাপদ হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদিগের সম্ভানের সম্ভানেরাও সম্ভবতঃ এখন এদেশে রাজ্যরূপে রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইতেন।

১২। টিপু কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। সম্মতি দেওয়া হইলে থাকুক, গবর্ণর জেনারেলের পক্ষ সহ যে ইংরেজ কর্মচারী

তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারও করিলেন না। অতএব চতুর্থবার মহীশূরের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা হইল। পেশোয়া সিদ্ধিয়ার ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। ইংরেজ যদি তাঁহাকে সিদ্ধিয়া হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে, তিনি ইংরেজের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন, এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। অত্যাণ্ড মহারাষ্ট্র-রাজগণ নির্লিপ্ত রহিলেন।

১৩। বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে দুই দল ইংরেজ সৈন্য মহীশূর অভিমুখে যাত্রা করিল। মাদ্রাজ সেনা জেনেরেল হারিসের অধীন ছিল, কর্নেল ওয়েলেন্সলি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। টিপু প্রথম বোম্বাই হইতে প্রেরিত সেনাদল আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পরাক্রম সফল করিতে পারিলেন না; যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। ইহার পরে তিনি মাদ্রাজ সেনা আক্রমণার্থ ধাবিত হইলেন, কিন্তু এখানেও তাঁহার পরাভব ঘটিল। দুই সেনা দুই দিক হইতে তাঁহাকে একপে চাপিয়া ধরিল যে, তিনি তাঁহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপতনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অল্প কএক দিনের মধ্যেই কামানের গোলায় নগর-প্রাচীরের এক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জেনেরেল বের্ডার্ড শ্রীরঙ্গপতনে দীর্ঘকাল কারাবদ্ধ এবং টিপু কতৃক একান্ত নির্দয়রূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। পূর্ব যুদ্ধের অবসানে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া চলিয়া আইসেন। এই জেনেরেল বের্ডার্ড ইংরেজ সৈন্য দলে ছিলেন। তিনি সমস্ত প্রস্তুত হইলে, দুর্গের বিরুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য চালনা করিয়া সাত মিনিটের মধ্যে সসৈন্তে প্রাচীরের শীর্ষ দেশে আরোহণ করিলেন, এবং ইহার পরে আর একটি ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই নগর অধিকৃত হইল। টিপু দুর্গদ্বারে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন।

১৪। মহীশূর এক্ষণ বিজিত রাজ্য। গবর্নর জেনেরেল ইচ্ছা করিলে, ইহা গ্রহণ পূর্বক, বৃটিশ ইণ্ডিয়ায় এক অংশ করিয়া লইতে

কিন্তু তিনি উহা না করিয়া, পাঁচ বৎসরের একটি শিওকে

মহীশূরের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এই বালক মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজার সন্তান। হাইদর আলি এই রাজ-বংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। বালকের নাম কৃষ্ণরাজা। যে সকল দেশ প্রাচীন সময়ে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না, হাইদর ও টিপু জয় করিয়া মহীশূরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরেল সেই দেশ-গুলি ইংরেজ, মহারাট্টা ও নিজামকে ভাগ করিয়া দিলেন। রাজ্যের যে অংশ একদা কানারা ও কুইন্সটোর নামে পরিচিত, উহাই ইংরেজের ভাগে পড়িয়াছিল। টিপু পুত্রদিগের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করা হইল। গবর্ণর জেনেরেল তাহাদিগকে প্রচুর বৃত্তি দিয়া ভেলোরে পাঠাইয়া দিলেন।

(৩২)

মাকু'ইস্ ওয়েলেস্লি ।

১। এই ঘটনার অল্পকাল পরে, নিজামকে যে জেলাগুলি নূতন দেওয়া হইয়াছিল, নিজাম তাহা ইংরেজকে দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। হায়দরাবাদে যে ইংরেজ সৈন্য রক্ষিত ছিল, তিনি নগদ টাকায় সেই সৈন্তের বেতন না দিয়া, ঐ সকল ভূমির আয় হইতে তাহা দিতে চাহিলেন। এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা ও মহীশূরের মধ্যবর্তী জেলা বেলারী ও কুদাপা ইংরেজ শাসনের অধীন হইল।

২। কাবেরী নদীপ্রবাহে সলিলবিধিত তাত্তোর রাজ্য এতদূর উন্নয়ন যে ইহাকে দক্ষিণ-ভারতের উদ্যান বলা হইত। শিবজির এক ভ্রাতা এই রাজ্য জয় করেন। সেই সময় হইতে ১৫০ বৎসর কাল ইহা মহারাট্টা বংশীয় রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। এই রাজাদিগের শেষ ব্যক্তি শাসন-দোষে রাজ্যটিকে একান্ত উৎপীড়িত করিয়া তুলেন।

তিনি প্রজা পক্ষে এমন স্তর কর-ভার চাপাইলেন যে, এ কর দিয়া তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবিকা নিৰ্বাহেরও পথ রহিল না। বহু মহত্বে লোক এ রাজার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত তাহাদের ছাড়িয়া পলায়ন করিল। রাজা প্রজাদিগকে অবিশ্রান্ত জালাতন করিয়া অবশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ঐ বংশের ছজন রাজকুমার সিংহাসন দাবি করিলেন। এই ছই রাজকুমার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বাহাতে শাস্তি ভগ্ন করিতে না পারেন, তাহাদের রাজ্যটি বাহাতে সূচাসিত হয়, এই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেন্সি তাহাদের প্রদেশ ব্ৰিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। প্রত্যেক রাজকুমারকে প্রচুর বৃত্তি প্রদান করা হইল।

৩। ক্লাইব মহম্মদ আলিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। তিনি ঐ সময় হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্ণাটিকের নবাব ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সময়ই মহম্মদ আলি দেশের শাসন-কার্য্য একান্ত বিশৃঙ্খলার সহিত চালাইয়াছিলেন। হাইদর ও টিপু সহিত ইংরেজের যে সকল যুদ্ধ হয়, সেই সকল যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল, মহম্মদ আলির রাজ্য কর্ণাটিককে অক্ষুণ্ণ রাখা। মহম্মদ আলি এই সকল যুদ্ধে শুধু ইংরেজের সহায়তা করিলেন না এমন নহে, তাহার কর্মচারিরা চুপে চুপে যত দূর সম্ভব শত্রু পক্ষেরই সাহায্য করিল। তিনি তাহার সৈন্যদিগকে বেতন দিতেন না। তাহাদিগের অনেকেই টিপু সহিত যোগ দান করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহম্মদ আলি আমোদ-প্রমোদে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অবশেষে এমন ভয়ানকরূপে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাহার আর সে ঋণ শোধের শক্তি রহিল না। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে তাহার পক্ষ হইয়া তাহার ঋণ শোধ করিতে হইল। এইরূপে ছয় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া

উল্-উমরা উত্তরাধিকারিকরূপে কর্ণাটকের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইংরেজেরা যখন ত্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করেন, তখন তাঁহারা সেই স্থানে মহম্মদ আলি ও তাঁহার পুত্র কর্তৃক গোপনে টিপু নিকট লিখিত ইংরেজের বিরুদ্ধে টিপুকে সাহায্য দানের প্রস্তাবসূচক কতকগুলি চিঠি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়েই তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া উম্মাত উল্-উমরা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার পিতা অপেক্ষাও তিনি রাজ্যের শাসন-কার্য অধিকতর নিম্ননীরূপে চালাইয়া ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না। লর্ড ওয়েলেসলি, মহম্মদ আলির ভ্রাতৃপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়দিগকে বড় বড় বৃত্তি দিয়া মরহুমা রাখিয়া কর্ণাটক রাজ্য ইংরেজ শাসনাধীন করিয়া লইলেন।

৪। এইরূপে মান্দাজ প্রেসিডেন্সী গঠিত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব ফরাশিদিগের নিকট হইতে উত্তর সরকার গ্রহণ করিয়া এই প্রেসিডেন্সীর প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস টিপুর সহিত প্রথম যুদ্ধের পরে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উত্তর সরকারের সঙ্গে মালবার, সালেম ও মাদুরা যোগ করিয়া লন। লর্ড ওয়েলেসলি কানারা, কুইথাটোর, তাজোর ও কর্ণাটক গ্রহণ করিয়া মান্দাজ প্রেসিডেন্সী পূর্বাঘ্রবে গঠন করিয়া তুলিলেন। এই সময় হইতে পরবর্তী একশত বৎসর কাল, এই প্রেসিডেন্সীতে আর কোন যুদ্ধ ঘটনা হয় নাই। মান্দাজ প্রেসিডেন্সীর লোক বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিয়াছিল।

৫। লর্ড ওয়েলেসলি অবোধার নবাবকেও নিজামের ভার অবোধার ইংরেজ সৈন্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রথমতঃ নবাব সম্মত হইতে চাহিলেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, প্রতিরোধের চেষ্টা করা নিষ্ফল, তখন আর তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। এক দল ইংরেজ সৈন্য অবোধার স্থাপিত হইল। নবাব

এই ইংরেজ সৈন্তের বেতনের অল্প যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী দোয়াব ইংরেজকে ছাড়িয়া দিলেন । এই দোয়াব আরও কতিপয় জেলার সহিত মিলিত হইয়া অধুনা আগ্রা ও অযোধ্যার সমবেত এদেশ নামে পরিচিত হইয়াছে ।

(৭০)

মাকু ইস্ ওয়েলেস্লি ।

১। ভারতে একমাত্র মহারাষ্ট্রগণই প্রবল শক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন । তাঁহারা ইংরেজের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, ওয়েলেস্লির নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে স্বরাজ্যে ইংরেজ সৈন্ত রাখিতেও সম্মত হন নাই । টিপু সহিত শেষ যুদ্ধের অবসানে লর্ড ওয়েলেস্লি রঘুবীর পুত্র বাজিরাও পেশওয়ার নিকট পত্র লিখেন । এই পত্রে প্রস্তাব করা হয় যে, তিনি যদি নিজামের গৃহীত সর্ত্তে সম্মত হইয়া ফরাসি সৈন্তদিগকে বিদায় দেন এবং তৎপরিবর্তে তাঁহার সাহায্যার্থ ইংরেজ সৈন্ত গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে লর্ড ওয়েলেস্লি মহীশূর হইতে প্রাপ্ত রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ তাঁহাকে দান করিবেন । কিন্তু পেশোয়ার তাঁহার প্রাচীন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নানা ফার্নভিসের পরামর্শ অনুসারে এই সকল সর্ত্তে সম্মতি দানে ইচ্ছুক হইলেন না ।

২। পর বৎসর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফার্নভিসের মৃত্যু হইলে যুবক পেশোয়ার নানার মৃত্যুর পরেই হল্কারের সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন । হল্কার পুনা অধিকার করিয়া লইয়া অত্র এক ব্যক্তিকে পেশোয়াপদে বরণ করিলেন ।

৩। বাজিরাও প্রাণ লইয়া বোম্বাইয়ে পলাইয়া গেলেন । বোম্বাই বাইয়া তিনি লর্ড ওয়েলেস্লির নিকট চিঠি লিখিলেন । এখন আর

ইংরেজ যদি তাঁহাকে পুনর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন, তাহা



[বাজিরাও]

হইলে, তিনি আছলাদ সহকারে ওয়েলসলির প্রস্তাব পরিগ্রহ করিবেন, স্পষ্টাক্ষরে এই কথা লিখিয়া পাঠান হইল। বোম্বাইর প্রায় কুড়ি মাইল উত্তরবর্তী বাসিন নামক দুর্গে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। বাজিরাও এই সন্ধি দ্বারা পেশোয়া রূপে মহারাট্টা সাম্রাজ্যের অধিরাজত্ব ত্যাগ করিলেন, এবং ইংরেজের সম্মতি ব্যতীত অন্য মহারাট্টা রাজাদিগের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা-

বদ্ধ হইলেন। এতদ্বিন্ন তিনি রাজ্যরক্ষার্থ একদল ইংরেজ সেনা আপন রাজ্যে রাখিবেন এই সন্ধিতে ইহাও স্থিরীকৃত এবং এই সৈন্তের ব্যয়-নির্বাহার্থ কতিপয় জেলা ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সেই সকল জেলা এক্ষণ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

৪। এই সময়ে গাইকোয়ার ও গুজরাটের মহারাট্টা রাজাও পেশোয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তাঁহারাও ইংরেজকে ভারতের অধিরাজ স্বীকার করিয়া ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন। সাহায্যার্থ স্বরাজ্যে ইংরেজ সৈন্ত গ্রহণ এবং সেই সৈন্তের ব্যয়বহন, সন্ধির এই সমস্ত সর্ত্তেই তাঁহারা সম্মত হইলেন।

৫। দৌলতরাও সিন্ধিয়া এবং রঘুজি ভোন্স্লা কোন সন্ধি বা চুক্তি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা বাসিনের সন্ধির কথা

তিনিতে পাইয়া যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইংরাজের প্রতিকূলে তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধ কবিবার জন্ত হুলকারকে হাতি করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন এবং তাঁহাদিগের সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

৬। লর্ড ওয়েলেসলি অচিরেই এই সংবাদ পাইলেন। সংবাদ পাইয়া তিনিও যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। জেনেরেল লেক্ একদল সৈন্যসহ উত্তরভারতে সিন্ধিয়ার বিক্রমে যাত্রা করিলেন। কর্ণেল ওয়েলেসলি ও কর্ণেল স্টিভেন্সন্ দক্ষিণদিক হইতে অগ্রসর হইলেন। নিজাম রাজ্যের উত্তরদিকে আসাই নামক স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়েলেসলি, সিন্ধিয়া ও রঘুজি ভোন্স্লার সৈন্তের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৫০০০ হাজারের ন্যূন সংখ্যক সৈন্য ছিল, কিন্তু মহারাট্টাদিগের সৈন্য সংখ্যা ৫০০০০। তথাপি তিনি যুদ্ধের জয়লাভ করিলেন। এই বৎসরেই আর্গম নামক স্থানে তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন।

৭। এই সময়ে জেনেরেল লেক্ উত্তরদিকে লাসোরি নামক স্থানে সিন্ধিয়ার দলভুক্ত ফরাশি সৈন্তের দেখা পাইয়া তাহাদিগকে ভাগাইয়া দেন। দিল্লী ও আগ্রা বহুবৎসর অবধি মহারাট্টাদিগের হস্তগত ছিল, এই যুদ্ধের পর জেনেরেল লেক্ এই দুই নগর অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি দিল্লী নগরে উপায়হীন প্রাচীন মোগল সম্রাট শাহ আলমকে অন্ধ ও কারাক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পান। অতঃপর প্রচুর পরিমাণ বৃত্তি নির্দেশ করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহাকে তাঁহার আপন রাজ-প্রাসাদে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা হয়।

৮। সিন্ধিয়া এবং রঘুজি ভোন্স্লাও একত্র বাসিন সন্ধির অঙ্গরূপে মার্ক্ট ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। সিন্ধিয়া যমুনার উত্তর

আদায়ের দাবি ছাড়িয়া দিলেন। সিক্কিমা আরজেন্গম্ নামক এক
গ্রামে এই সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করেন, এই হেতু এই সন্ধি আরজেন্গমের
সন্ধি নামে পরিচিত। ভোন্সু। দিওগমের সন্ধি অনুসারে পূর্বে
কটক ও পশ্চিমে বিরার প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন। লর্ড ওয়েলেস্লি
বিরার প্রদেশটি উপহার স্বরূপ নিজামকে দান করিলেন। ১৮০০
খৃষ্টাব্দে এই সকল ঘটনা হয়। একদল ইংরেজ সৈন্য পুনায় ও আর
একদল নাগপুরে স্থাপিত হইল। ইহার পর হইতে ভোন্সু। নাগপুরের
রাজা বলিয়া অভিহিত হইলেন।

৯। এই সময় রাজপুত রাজগণও লর্ড ওয়েলেস্লির উদ্ভাবিত স্বরাজ্য
সহায়রূপে ইংরেজ সৈন্য গ্রহণ প্রথার সম্মতি প্রদান করেন। এই
হইতে তাহাদিগের আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও মহারাট্টাদিগের
সহিত সংগ্রাম, সর্বতোভাবে তিরোহিত হইয়া যায়।

১০। ভারতের বড় বড় রাজ্যবর্গের মধ্যে একটা একমাত্র
হোল্কার লর্ড ওয়েলেস্লির সর্ব্ব্ব অসম্মত ছিলেন। তদানীন্তন হোল্কার
নামধারী মহারাট্টা সর্দার যশোবন্ত রাও উত্তরভারতে পরিভ্রমণ ও প্রত্যেক
ব্যক্তির নিকট চৌধ দাবি কারিতে থাকেন। যাহারা চৌধ দিতে
অস্বীকৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে হত্যা করেন এবং তাহাদিগের সর্ব্ব্ব
লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ইংরেজ যখন অত্যাচার মহারাট্টাদিগের
সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত, হোল্কার তখন আপনা অপেক্ষা হীনবল ও তাহার
প্রতিরোধে অসমর্থ দুর্ব্বল রাজপুত সর্দারদিগের সর্ব্ব্ব লুণ্ঠন করিয়া
নিতেছিলেন। এই সমস্ত রাজপুত সর্দারেরা এইক্ষণ ইংরেজের রক্ষণাধীন
ও আশ্রিত। লর্ড ওয়েলেস্লি ইহাদিগকে উৎপীড়ন না করিয়া
স্বদেশে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত হোল্কারের প্রতি অনুমতি প্রদান
করিলেন। হোল্কার ইহা গ্রাহ্য করিলেন না, বরং এই রাজপুতদিগের
নিকট হইতে তিনি চিরকাল চৌধ আদায় করিবেন বলিয়া সগর্ব্ব্ব

উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। সহায় ও সহকারী মিউনিগকে, শত্রুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গবর্ণর জেনেরেলের কর্তব্য। বিশেষতঃ তিনি ইহা করিতে প্রতিশ্রুত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। অতএব ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হোল্কারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

১১। কিন্তু হোল্কার কিরূপ বলশালী ও তাঁহার সৈন্য সংখ্যা কি পরিমাণ ছিল, গবর্ণর জেনেরেল তাহা জানিতেন না। বঙ্গদেশ হইতে কর্ণেল মনসনের অধীন ক্ষুদ্র একদল সেনা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। সিন্ধিয়ার একদল সৈন্য এই ক্ষুদ্র দলের সহিত মিলিত হইল। কর্ণেল মনসনও হোল্কার ও তাঁহার সৈন্যসামন্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবগত ছিলেন না। তিনি নির্ভীকচিত্তে একবারে হোল্কারের রাজ্যে বাইরা উপস্থিত হইলেন। মনসন হোল্কার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, তিনি বহুসংখ্যক বিপক্ষ সেনার পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন। সিন্ধিয়ার সৈন্যদল তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিল। কর্ণেল মনসন নিতান্ত নির্যোধের স্তায় সাহায্য প্রাপ্তির আশায় আগ্রার দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তখন জুলাই মাস। সর্বত্র মুঘলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। সমস্ত নদী জলপ্লাবিত। তিনি বহু কষ্টে আগ্রার পঁহুছিলেন। হোল্কার অতঃপর দিল্লী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দিল্লী অধিকার করিতে পারিলেন না বুঝিয়া তিনি উহার চতুঃপার্শ্ববর্তী দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। সিন্ধিয়া বহু একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

১২। জেনেরেল লেক্ অতঃপর আগ্রা হইতে দূর গঠিত একদল সৈন্য সহ অগ্রবর্তী হইলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দীগ্ নামক স্থানে তিনি হোল্কারের দেখা পাইলেন। যুদ্ধ হইল। হোল্কারের সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। জেনেরেল লেক্ ইহার পর দীগের দূর দূর

হোল্কারের সহায় ও মিত্র ছিলেন। তিনি কিছু কাল সাহসিকতার সহিত দুর্গ রক্ষা করিলেন। কিন্তু দুর্গ শেষে শত্রু-হস্তে পতিত হইবে, ইহা বুঝিতে পাইয়া, তিনি বশুতা স্বীকার পূর্বক ইংরেজের সহিত সন্ধি সূত্রে বদ্ধ হইলেন। হোল্কার সকলদিকে পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন।

১৩। জেনেরেল লেক্ এক্ষণ ইচ্ছা করিলে হোল্কারের সহিত যুদ্ধ শেষ করিয়া তাঁহাকে লর্ড ওয়েলেস্লির সর্ত্তে বাধ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেলের পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনেরেল, জেনেরেল লেককে তাঁহার ইচ্ছামত কাৰ্য্য করিতে দিলেন না।

(৭১)

পঞ্চম গবর্ণর জেনেরেল,—লর্ড কর্ণওয়ালিশ্, স্মর জর্জ বার্লো এবং ষষ্ঠ গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মিন্টো।

১৮০৫—১৮০৭—১৮১৩।

১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এখনও ভারতীয় বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, টিপু ও মহারাট্টা যুদ্ধে তাঁহাদিগের সমস্ত লভ্য অংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব নূতন গবর্ণর জেনেরেলের ভারত আগমন সময়ে, হোল্কারের সহিত অবিলম্বে সন্ধি স্থাপন এবং ভারতীয় কোন রাজার কোন ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ না করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে দৃঢ় উপদেশ ও অনুমতি প্রেরিত হইল। পূর্বেও একবার স্মর জর্জ শোরের প্রতি ঠিক এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল।

২। লর্ড কর্ণওয়ালিশ্ পূর্বে একবার গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন।

বাঙ্গালার উষ্ণ ও সেন্টসেঁতে জলবায়ুতে বাস করার পক্ষে অযৌক্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ্ এদেশে আসিয়া তিন মাস অতীত হইবার পূর্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন।

৩। স্যার জর্জ বার্লো প্রতিনিধিরূপে গবর্নর জেনেরেলের কার্য করিতেছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের আত্মা পালন বাধা হইয়া হোল্কারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। হোল্কারও অগ্ৰাণ্ড মহারাট্টা রাজকুমারের লর্ড ওয়েলেস্লির সর্ত্তে সন্ধি করিতে আহ্বান সহকারে সম্মত হইতেন। কিন্তু কি হোল্কার, কি পেশোয়া বাজিরাও, কি নাগপুরের রাজা রঘুজি, কি সিন্ধিয়া, মহারাট্টা রাজগণের কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে গবর্নর জেনেরল কেন লর্ড ওয়েলেস্লির প্রণালীকে হোল্কারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন না। তাঁহারা সকলেই ভাবিলেন, গবর্নর জেনেরল হোল্কারের ভয়ে ভীত। তাঁহারা ইংরেজের সহিত অমন সর্ত্তে সন্ধি করিয়াছেন বলিয়া, এক্ষণ মনে মনে অনুতপ্ত হইলেন। পরবর্ত্তী সাত বৎসরকাল তাঁহারা সকলেই পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। পূর্ব ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য পরস্পরের মধ্যে নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিল। তাঁহারা পুনরায় অগ্র রাজ্য হইতে, পূর্ববৎ চৌথ আদায় করিতে পারেন কি না, ইহাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

৪। সিন্ধিয়া হোল্কারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আবার নূতন সর্ত্তে সন্ধি করা হইল। গোয়ালিয়রের দুর্গ তাঁহা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকে উহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। চম্বল নদী ইংরেজ ও সিন্ধিয়া রাজ্যের সীমা রেখারূপে নির্দিষ্ট হইয়া রহিল।

৫। ইংরেজের নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া টিপু পুত্রেরা ভেলেস্লি দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে তাঁহারা দুর্গবিশেষ

হইতে পরামর্শ দিলেন । ইংরেজ সৈনিক পুরুষদিগের অনেকে নিহত হইলেন, অল্প কএকজন বিশেষ বীরত্ব সহকারে আরকট হইতে সাহাবা আসিয়া পহঁচা পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিলেন । অচিরেই বিদ্রোহ দমিত হইল । টিপু পুত্রেরা কলিকাতার প্রেরিত হইলেন ।

৬। পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিন্টো সাত বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিলেন । তিনি দেশীয় রাজাদিগকে স্বেচ্ছামত চলিতে দিলেন । কিন্তু ইহা পরিণামদর্শিতার কার্য্য হইল না । কারণ, তাঁহার প্রতিনিয়ত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং ইংরেজরাজকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । লর্ড মিন্টো কি করিবেন, তাঁহাকে ইংলণ্ডের আদেশ মানিয়া এই সকল ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকিতে হইল ।

৭। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ সম্মিলিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত লিখিত অনুজ্ঞা-পত্র বা সনন্দ প্রদান করেন । ইহার পরে সময় সময় কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দেওয়া হইয়াছে । ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট কর্তৃক রেগুলেশন এক্ট বা আইন বিধিবদ্ধ হয় । এই সময় হইতে কোম্পানীকে প্রত্যেক কুড়ি বৎসর অন্তে নূতন সনন্দ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল । ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২১৩ বৎসর কাল ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার থাকে । অর্থাৎ কোম্পানী ভিন্ন অত্র কোন ইংরেজ বণিকের ভারতে ক্রয়-বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল না । কিন্তু ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ পার্লামেন্ট এই একচেটিয়া অধিকার রহিত করিয়া ভারতীয় বাণিজ্যের পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত করিয়া দেন ।

৮। বাহা হউক, কুড়ি বৎসরকাল, এই অনুমতি বিশেষ কার্য্যকরী হইল না । কারণ, কোম্পানীর অনুমতি না লইয়া কোম্পানীর শাসনাধীন রাজ্যের কোন অংশে কোন ইংরেজ বাস করিতে পারিবেন না, কোম্পানীর দ্বত এই পুরাতন নিয়ম তখনও বর্ত্তমান ছিল ।

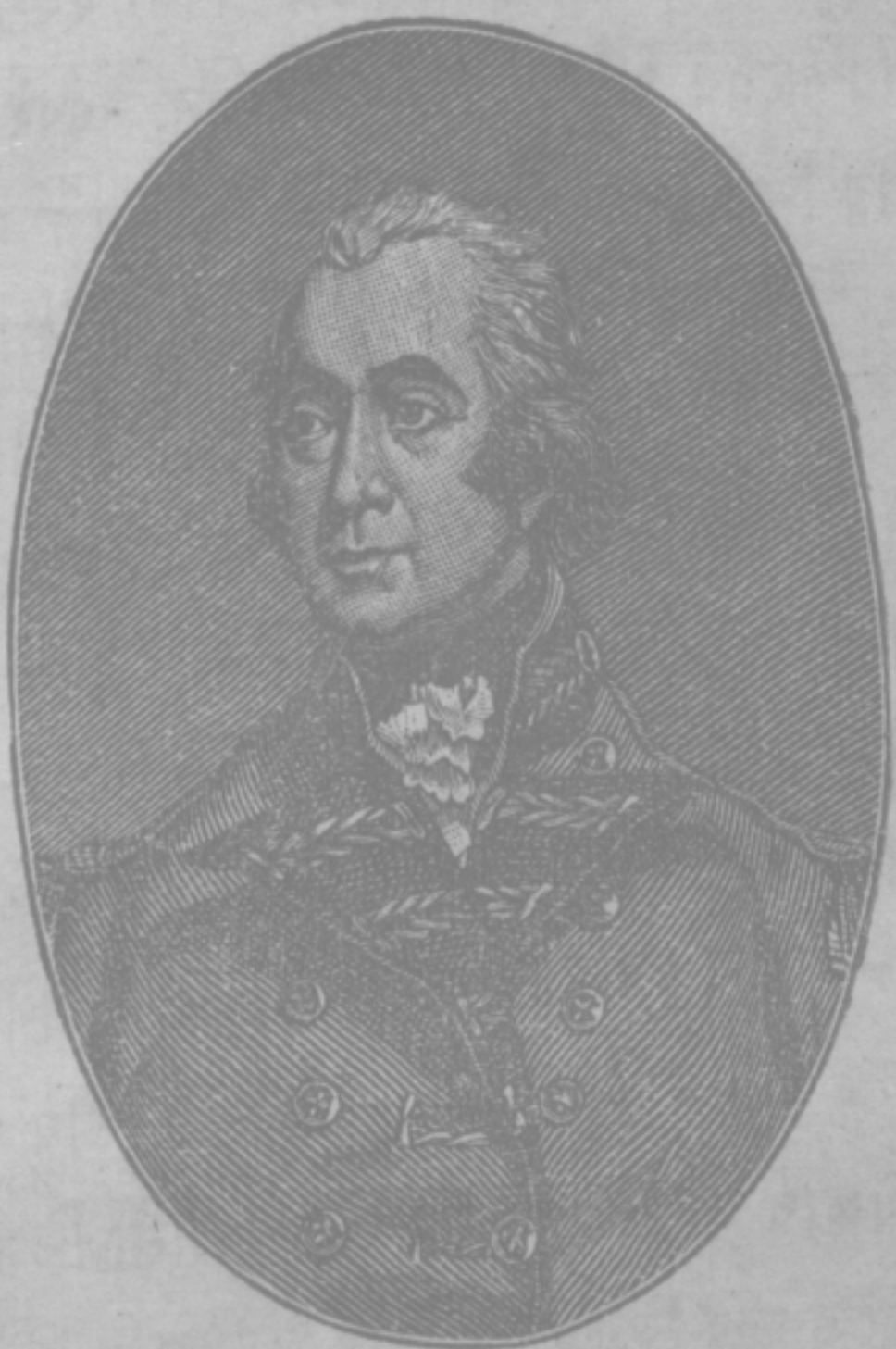
(৭২)

সপ্তম গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস্।

১৮১৩—১৮২৩।

মহারাট্টা শক্তির পতন।

১। নূতন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস্ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনি অতি উচ্চ সম্মানার্থে সম্রাট লর্ড ও শ্রেষ্ঠ কন্মের জেনেরেল ছিলেন। তিনি স্বয়ং বহু যুদ্ধ করিয়া রণকার্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত নামে ঐক্য থাকিলেও তিনি সে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সম্পর্কিত নহেন। যাহারা বৃটিশ ভারতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাহা-দিগের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। প্রথম দুইজন লর্ড ক্লাইব ও লর্ড ওয়েলেসলি। লর্ড হেষ্টিংস্ দশ বৎসরকাল ভারত শাসন করিয়াছিলেন।



[লর্ড হেষ্টিংস্]

২। যদি লর্ড ওয়েলেসলির প্রণালী অনুসরণ করা হইত, তাহা হইলে ভারতের প্রত্যেক স্থানে একগুণার আশ্রয় তখনও শান্তি বিরাজমান থাকিত। কিন্তু শান্তির পরিবর্তে সমস্ত মহারাট্টা দেশ ব্যাপিয়া আবার সমরানল জলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিগত দশ

বৎসর কাল অবধি মধ্যভারতে পিণ্ডারি নামক এক নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইতেছিল ।

৩। পিণ্ডারিরা দস্যু । তাহাদিগের অধিকাংশই মুসলমান ধর্মাবলম্বী পাঠান ও হিন্দু মহারাট্টা । কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে শাস্তির ভয়ে পলাইয়া যাইত এবং পলাইয়া গিয়া পিণ্ডারিদিগের সহিত মিলিত হইত । তাহাদিগের কোন দেশ বা বাসগৃহ ছিল না । তাহারা যুদ্ধ করিতে পারে বলিয়া গর্ব করিত না, তাহাদিগের গর্বের বিষয় এই ছিল যে, তাহারা এত দ্রুত দৌড়াইতে পারিত যে, কেহই দৌড়াইয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারিত না । কোন দেশ জয় বা রাজ্য অধিকার তাহাদিগের লক্ষ্য ছিল না, তাহারা যেখানে যাই পাইত; একবারে কাটাইয়া লইয়া যাইত । কোথায় টাকা লুকান আছে, ইহা তাহাদিগকে বলিয়া না দিলে আর রক্ষা ছিল না । যে ব্যক্তি এক বিষয়ে তাহাদিগকে ফাকী দিতে প্রয়াস পাইত, তাহার উপর তাহারা যার-পর-নাই নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত । তাহার পায়ের নীচে আগুনে পোড়া রক্তবর্ণ লোহা লাগান হইত বা তাহারা তাহার বস্ত্রে তৈল ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিত । পিণ্ডারিদিগের অনেকে ইতিপূর্বে সিদ্ধিয়া ও পেশোয়ার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া প্রতিবৎসর তাহাদিগের সঙ্গে লুণ্ঠনার্থ বহির্গত হইত । মহারাট্টা রাজারা এই লুণ্ঠন ব্যাপারে অসমর্থ হইয়া পড়িলে, তাহারা নিজেরাই লুণ্ঠন ও চৌধ আদায় করিয়া বেড়াইতে লাগিল । পিণ্ডারিদিগের অনেক দলপতি ছিল । দলপতিদিগের মধ্যে, আমীর খাঁ ও চিতু এই দুই জনই প্রধান । পিণ্ডারিদিগকে বাধা দেয় বা প্রতিরোধ করে, এমন কেহই ছিল না ; সুতরাং তাহার উত্তরোত্তর প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল । শেষে তাহাদিগের সংখ্যা একবারে

..... হইল ।

৪ । বড় বড় মহারাট্টা রাজগণ প্রকাশ্যভাবে ইংরেজের সহিত মিত্রতা

রক্ষা করিয়া চলিতেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই তাঁহাদিগের নষ্ট ক্ষমতার পুনরুদ্ধার ও পূর্ববৎ দেশময় দখলবৃত্তি ও লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইবার জন্য মনে মনে লালস্বিত ছিলেন । তাঁহারা যেদিক দিয়া যত দূর পারিতেন, গোপনে গোপনে পিণ্ডারিদিগের সহায়তা করিতেন । তাঁহাদিগের আশা ছিল যে, পিণ্ডারিরা ইংরেজদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে, আর তাহা না হইলেও ইংরেজেরা পিণ্ডারিদিগের সহিত যুদ্ধে এত দূর ব্যাপৃত হইয়া পড়িবেন যে, তাঁহারা বিদ্রোহী হইলে, ইংরেজেরা আর তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না ।

৫। লর্ড হেষ্টিংস্ এদেশে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, লর্ড ওয়েলেস্লি যে অবস্থা হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যদি প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে সহায়তাদানরূপ, সেই প্রবীণ গবর্ণর জেনেরেলের প্রবর্তিত পূর্বপ্রণালী পুনঃ অবলম্বিত না হয়, ভারত অচিরেই, তাহা হইলে, আবার সেই ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইবে । তিনি ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে জানাইলেন যে, উত্তরদিকে গুর্খারা বৃটিশ ভারত আক্রমণ করিয়াছে । দক্ষিণে পিণ্ডারিরা দখলবৃত্তি ও লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে, এবং মধ্যভারতে সমস্ত মহারাষ্ট্রা রাজারা বিদ্রোহী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ; নিজাম মহারাষ্ট্রাদিগের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন, কেবল তিনিই ইংরেজের বিশ্বাসভাজন বন্ধু আছেন ; এই অবস্থায় লর্ড ওয়েলেস্লির প্রণালীই ভারতকে অধঃপাত হইতে রক্ষা করিবার এক মাত্র পথ । লর্ড হেষ্টিংসের প্রতি ইংরেজ গবর্ণমেন্টের পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল । তাঁহারা বুঝিলেন, তিনি বাহা বলিতেছেন, তাহাই প্রকৃত । অতএব, তাঁহারা তাঁহাকে লর্ড ওয়েলেস্লির প্রণালী, অক্ষরে অক্ষরে প্রবর্তিত করিয়া লইতে আদেশ প্রদান করিলেন ।

৬। গুর্খারা নেপালবাসী । নেপালের শাসনকারী গুর্খাজাতীয়-

দিগের হস্তে ছিল। কাশ্মীরের পূর্বদিকে হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে হিন্দুস্থান ও তিব্বতের মধ্যস্থানে নেপাল রাজ্য অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০ মাইল ও বিস্তার ১০০ মাইল। লর্ড হেষ্টিংস যে সময়ে ভারতে আসিয়া পহুঁচেন, প্রায় সেই সময়ে, বিনা কারণে, কতকগুলি গুর্খা অযোধ্যার কতিপয় গ্রাম আক্রমণ পূর্বক ঐ গ্রামের মণ্ডল বা মৌড়লকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়। এই কারণে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া চারি দল সেনা প্রেরিত হয়। গুর্খারা অত্যন্ত বীর; তাহারা বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিত। বড় বড় কামান হিমালয় পর্বতের উপর টানিয়া উঠান যার-



[গুর্খাসেনানী]

পর-নাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রেরিত চারি দল সেনার তিন দল বহু লোক হারাইয়া ফিরিয়া আসিল। জেনারেল অক্টারলনীর অধীন

চতুর্থ দল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গুর্খাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজধানী কাটমুণ্ডের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। রাজধানীর নিকটে সসৈন্তে ইংরেজদিগকে সমাগত দেখিয়া, গুর্খাসর্দার ইংরেজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সিংলিতে এই সন্ধি হয়। সিংলির সন্ধি দ্বারা তাহারা তাহাদিগের রাজ্যের পশ্চিম অংশ, কুমায়ুন, এবং মুগরি ও নাইনিভাল ছাড়িয়া দেয়। এই কুমায়ুন জেলাতেই এককাল সিংলার পর্তুগীজবাস বিরাজমান। গ্রীষ্মকালে এককাল গবর্ণর জেনারেল এই স্থানে বাস করেন। এই সন্ধির পর হইতেই নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ডে রেসিডেন্ট বা প্রতিনিধি ইংরেজ কর্মচারী স্থাপিত হন।

৭। এই হইতে নেপালের রাজা ইংরেজের চির-সহকারী মিত্র হইয়া আছেন। অতঃপর বহুসংখ্যক গুর্খা দ্বারা গুর্খা রিজিমেন্ট বা গুর্খা সৈন্তদল গঠিত হইয়া, ইংরেজ সেনানীর অধীন ইংরেজের সেনা রূপে কার্য্য করিতে থাকে। গুর্খাসৈন্ত এককাল ইংরেজের সেনার মধ্যে কতিপয় সর্বোৎকৃষ্ট সাহসী সেনাদিগেরই অন্ততরূপে পরিগণিত।

৮। ইংরেজ সেনা যখন গুর্খাদিগের সহিত রণ-কার্য্যে ব্যাপৃত, তখন পিণ্ডারিরা অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। বাজিরাও পেশোয়া এই সময়ে তাহাদিগকে সর্বত্র লুণ্ঠন ও দস্যুত্ব করিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস ১২০০০০ লোকের দ্বারা বৃহৎ এক সৈন্তদল গঠন করেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গালা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্তদল আনিয়া তদ্বারা এই সময়েই সুরহৎ সেনাদল গঠিত হইয়াছিল। এই সৈন্ত দ্বারা চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া পিণ্ডারিদিগকে একরূপে আটকাইয়া ফেলান হইল যে, একটি প্রাণীরও ফাঁকে এড়াইয়া যাইবার পথ রহিল না। কোন যুদ্ধ হইল না। পিণ্ডারিরা বৃদ্ধ করিত না। তাহাদিগের বহুলোক সৈনিকদিগের, দল ছাড়িয়া গলাঠল এবং অস্ত্র

ত্যাগ করিয়া, নিরীহ গ্রাম্য লোকের জায় বাস করিতে আরম্ভ করিল ।



তাহাদিগের জনৈক প্রধান দল-
পতি চিত্ত বাধ্য কর্তৃক নিহত
হইল । অত্বেরা ইংরেজের
নিকট আত্ম সমর্পণ ও দয়া
ভিক্ষা করিল । ইংরেজ তাহা-
দিগকে বাসোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ভূসম্পত্তি দিয়া রাখিলেন ।
আমির খাঁকে রাজপুতানায় টঙ্ক
নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ও
নবাব উপাধি দান করা হইল ।

[আমির খাঁ]

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পিণ্ডারি-

দিগের আর কোন চিহ্নই বিদ্যমান রহিল না । ভারত এইরূপে এক
ভীষণ আপদের হাতে অব্যাহতি পাইল ।

(৭৩)

লর্ড হেস্টিংস্ ।

১। পেশোয়া বাজিরাও মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা
কিছুতে পিণ্ডারিদিগকে পরাভব করিতে পারিবেন না । অতএব
তিনি, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, বৃহৎ একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হঠাৎ পুনার
নিকটবর্তী কিরকিতে স্থাপিত ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন ।
আক্রমণ করিয়া তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না; প্রচুররূপে
ক্ষতিগ্রস্ত ও তাড়িত হইলেন । ইহার পরে পেশোয়া কিছুদিন দেশের
নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে আত্ম সমর্পণ করিলেন । হেস্টিংস্
দেখিলেন যে, তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহাকে

আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না । অতএব, হেষ্টিংস্ তাঁহার সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জন্ত যথেষ্ট পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । কাণপুরের বিঠুরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল ।

২ । নাগপুরের বৃদ্ধ রাজা রঘুজি ভোন্স্‌লা এই সময়ের কিছুদিন পূর্বে পরোলোকগত হন । তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র আপ্পা সাহেব ইংরেজের সহিত সন্ধিসূত্রে বন্ধ হইয়া, নাগপুর শাসন করিতেছিলেন । আপ্পা সাহেব গোপনে গোপনে বাজিরাওর সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন । তিনি যেই শুনিতে পাইলেন যে, বাজিরাও কিরকির ইংরেজ সেনা আক্রমণ করিয়াছেন, তিনিও অমনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের নিকটবর্তী সীতাবলদির পাহাড়ে ইংরেজ রেসিডেন্টকে আক্রমণ করিলেন । রেসিডেন্ট মিষ্টার জেবিন্সের সঙ্গে কোন ইংরেজ সেনা ছিল না । কিন্তু ইংরেজ সেনানীর অধীন ১৪০০ সিপাহী ছিল । আপ্পা সাহেবের ছিল ১৮০০০ সৈন্ত । তিনি ভাবিলেন, এই সৈন্ত দ্বারা অতি সহজেই তিনি ক্ষুদ্র সিপাহীদলকে নিপেষিত করিতে পারিবেন । রাজিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া পরদিন সমস্ত দিনমান যুদ্ধ চলিল । কিন্তু আপ্পা সাহেবের সৈন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল এবং আপ্পা সাহেব রাজপুতানায় পলায়ন করিলেন । কএক বৎসর পরে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হইল । মৃত রাজা রঘুজির একটি শিশু পৌত্র বর্তমান ছিল, ইংরেজেরা তাহাকেই নাগপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন ।

৩ । যশোবন্ত রাও হোল্‌কার পরলোকগত হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নী তুলসী বাই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন । তিনিও বাজিরাও ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাঁহার সমস্ত সৈন্তসামন্ত লইয়া বাজিরাওর সাহায্যার্থ দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সার্ব্ জন্ ম্যালকলম্ নামক সেনাপতির অধীন ইংরেজ সেনার

পেশোয়ার সহায়তা করিতে যাওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে কিরূপ অদূরদর্শিতার কার্য্য অশেষ-বিশেষে ইহা বুঝাইলেন । তুলসী বাই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতিদানের উপক্রম করিয়াছিলেন । কিন্তু যে সকল মহারাষ্ট্রা কাণ্ডানেরা সৈন্তের চালক ছিলেন, তাঁহারা ইহা জানিতে পাইয়া, তুলসী বাইকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন । ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মাহিদপুরে ইংরেজ সেনা আক্রমণ করিলেন । কিন্তু আক্রমণ করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না, সার্ব্ জন্ ম্যাল্ কলম্ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন । লর্ড হেষ্টিংস্ যশোবন্ত রাও হোল্কারের মালহার রাও নামক একটি অপোগণ্ড শিশুপুত্রকে ইন্দোরের রাজা করিয়া তাঁহাকে নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একদল ইংরেজ সৈন্ত তাঁহার রাজ্যে রাখিয়া দিলেন ।

৪। পাঁচটি বড় বড় মহারাষ্ট্রা রাজা তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ স্বীয় স্বীয় রাজ্যে স্থাপিত ইংরেজ সেনার ব্যয় নির্বাহের জন্য কতকগুলি দেশ ইংরেজকে ছাড়িয়া দিলেন । ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বাসিনের সন্ধিতে বাজিরাও যে রাজ্য ইংরেজকে দান করেন, সেই রাজ্য এই সকল দেশের সহিত মিলিত হইয়া বৃহৎ এক প্রদেশে পরিণত হইল । লর্ড হেষ্টিংস্ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ দ্বারা বোম্বাই প্রেসিডেন্সী গঠন করিলেন ।

৫। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্ ভারতের শাসন কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন । তিনি পাঁচ বৎসর সময়ে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক আরক্ কার্য্য সর্ব্বাবরূপে সম্পন্ন করিয়া ইংরেজকে ভারতে সর্ব্বপ্রাধান্য শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান ।

(৭৪)

অষ্টম গবর্ণর জেনারেল

লর্ড আমহার্ট ।

১৮২৩—১৮২৮ ।

১। কর্ণার রাজা, বাঙ্গালার প্রান্তবর্তী আসাম দেশ জয় :

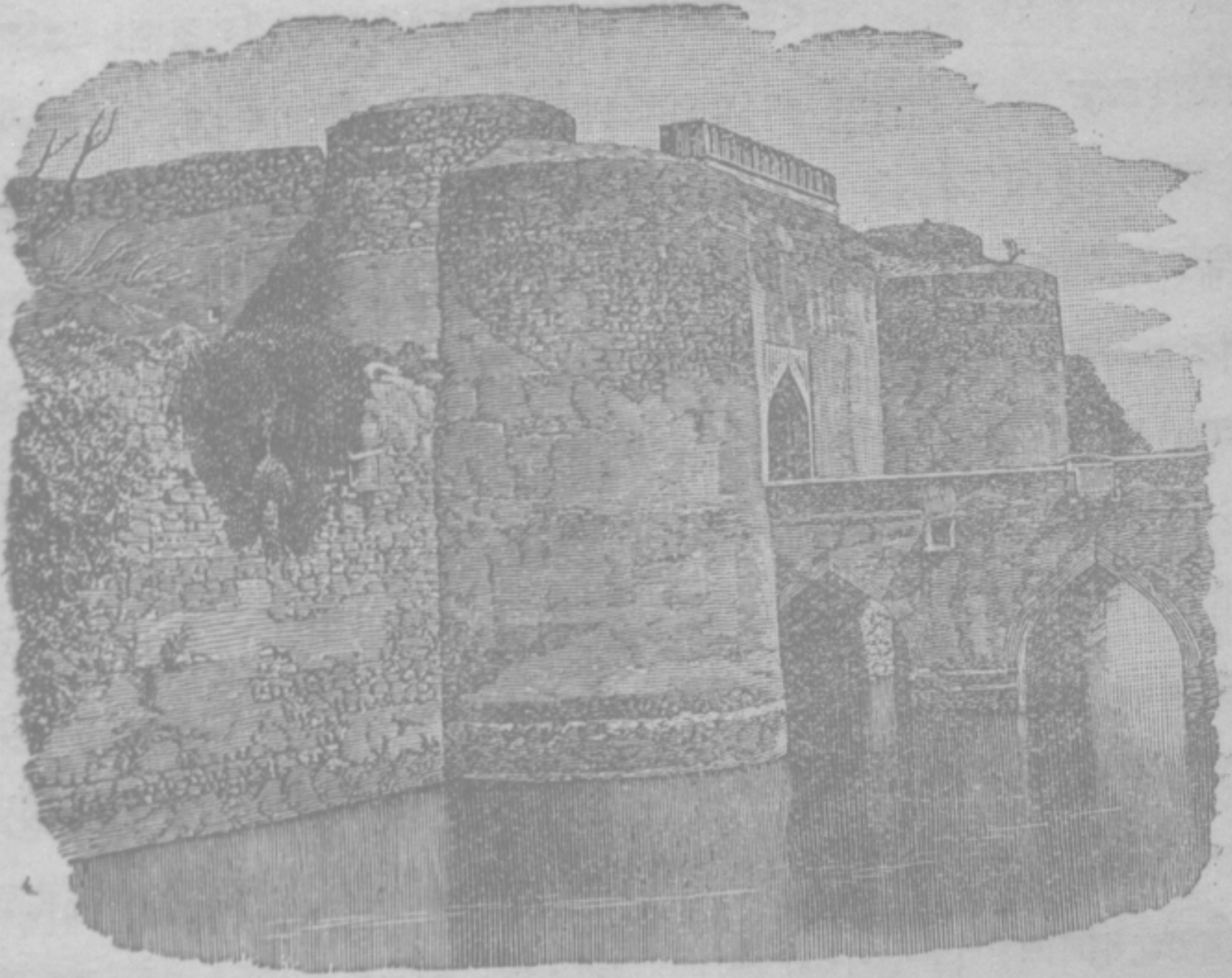
করিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন। উপকূলের নিকটস্থ একটি দ্বীপের রক্ষক স্বরূপ কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকর্তৃক নিহত হয়। কেন তিনি এরূপ আচরণ করিলেন, গবর্ণর জেনেরেল ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে এই করিলেন যে, বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কাছাড় দেশে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত সৈন্যদল ইংরেজ সেনা কর্তৃক বিতাড়িত এবং সমুদ্রপথে জাহাজে আর একদল, ইংরেজ সেনা রেশ্মণ আক্রমণার্থ প্রেরিত হইল। এই আক্রমণেই রেশ্মণ অধিকার করা হয়।

২। ইংরেজ কিরূপ প্রতাপাবিত ও বলশালী বর্ম্মার রাজা ইহা জানিতেন না। তিনি তাঁহার বান্দুলা নামক সেনাপতিকে বৃহৎ একদল সেনাসহ পাঠাইয়া দিলেন। ইংরেজ সেনানায়ক সার্ এ. ক্যাম্পবেলকে তাড়াইয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। শুধু ইহাই নহে, বান্দুলা তারতম্যবোধে গবর্ণর জেনেরেলকে বন্দিরূপে রাজধানী আতা নগরে লইয়া বাইবার নিমিত্ত সোণার শিকল লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই কল্পনা আকাশ-কুসুমের পরিণত হইল। তাঁহার সৈন্য অতি সহজে পরাভূত এবং তিনি স্বয়ং যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইংরেজ জেনেরেল, ইহার পরে সমগ্র আসাম ও আরাকান রাজ্য অধিকার করিয়া ইরাবতী নদী পথে আতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরেজ সেনানী নগরের অতি নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বর্ম্মার রাজা একান্ত নত হইয়া পড়িলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জাঙ্গাবু নামক স্থানে তাঁহার সহিত ইংরেজের সন্ধি স্থাপিত হইল।

৩। এই সন্ধি দ্বারা ইংরেজেরা বর্ম্মার উপকূল, আসাম, আরাকান ও তেনাসেরিম্ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

৪। জাহাজে যে সকল চূর্ণ দুরাক্রম্য ও দূতম রূপে গণ্য ছিল,

ভরতপুরের দুর্গ সেই সকলেরই অগ্ন্যতর। ইংরেজেরা দুইবার ইহা আক্রমণ ও অবরোধ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।



[ভারতপুরের দুর্গ]

ইহাতে ভারতপুরের রাজা এবং অগ্ন্য অনেক ভারতীয় নৃপতিরই এই ধারণা ছিল যে, ভারতপুরের দুর্গ অজেয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতপুর রাজ্যের মৃত্যু হয়। জনৈক সর্দার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সর্দারের ঐ রাজ্যের উপর কোনই স্বত্ব ছিল না। লর্ড আমহার্স্ট রাজার পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপনার্থ লর্ড কম্বার্মিয়ারের অধীন একদল সৈন্য ভারতপুরে পাঠাইয়া দেন। লর্ড কম্বার্মিয়ার ভারতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিয়া বারুদ যোগে উহার প্রাচীর উড়াইয়া দিলে, দুর্গ অধিকৃত হয়। ইহার পরে, ভারতপুর রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী সিংহাসনে স্থাপিত হন।

(৭৫)

নবম গবর্ণর জেনেরেল

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক ।

১৮২৮—১৮৩৫ ।

১। নবম গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক অদূরদর্শী, বুদ্ধিমান, সদাশয় ও দয়ালু ছিলেন। সপ্ত বৎসর স্থায়ী শাসনকালে তিনি তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত গবর্ণর জেনেরেল অপেক্ষা, ভারতীয় লোকের হিতজনক অনুষ্ঠান অনেক বেশী করিয়া যান। দেশে শান্তি ছিল বলিয়াই তিনি ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২। বেণ্টিঙ্ক প্রথম যে সকল কার্য্য করেন, তাহার একটি পথ ও পথিকের ভয় ও উপদ্রব শান্তি। মহারাট্টাগণ আর দেশ ভরিয়া লুণ্ঠন উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়ায় না। পিণ্ডারি-গণ দমিত হইয়া আছে, মাথা তুলিতে সাহস পায় না। কিন্তু ডাকাত, দস্যুদল, ঠগ অথবা গামছামোড়া সর্বত্র। লোকেরা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনার্থ বহির্গত হইয়াছে; তাহাদিগের অনেকেই আর ফিরিয়া আইসে নাই। কত লোক বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, কিন্তু আর তাহাদিগের কোন সংবাদই শ্রুত হওয়া যায় নাই। দস্যুরা পথে পাইয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে।



[লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক]

৩। এক এক দলে ত্রিশ চল্লিশ জন ডাকাত সাধারণ পথিকের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা ধনীর বাড়ী খুঁজিয়া লইয়া রাত্তিকালে মসাল জ্বালাইয়া সবলে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিত এবং সেখানে যাহা-দিগকে পাইত, তাহাদিগের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইয়া যাইত, শুধু লুণ্ঠিয়া লইত এমন নহে, তাহাদিগকে নির্দয়রূপে প্রহার করিত, অনেক সময়, আগ্নেও মারিয়া ফেলিত।



[ঠগ]

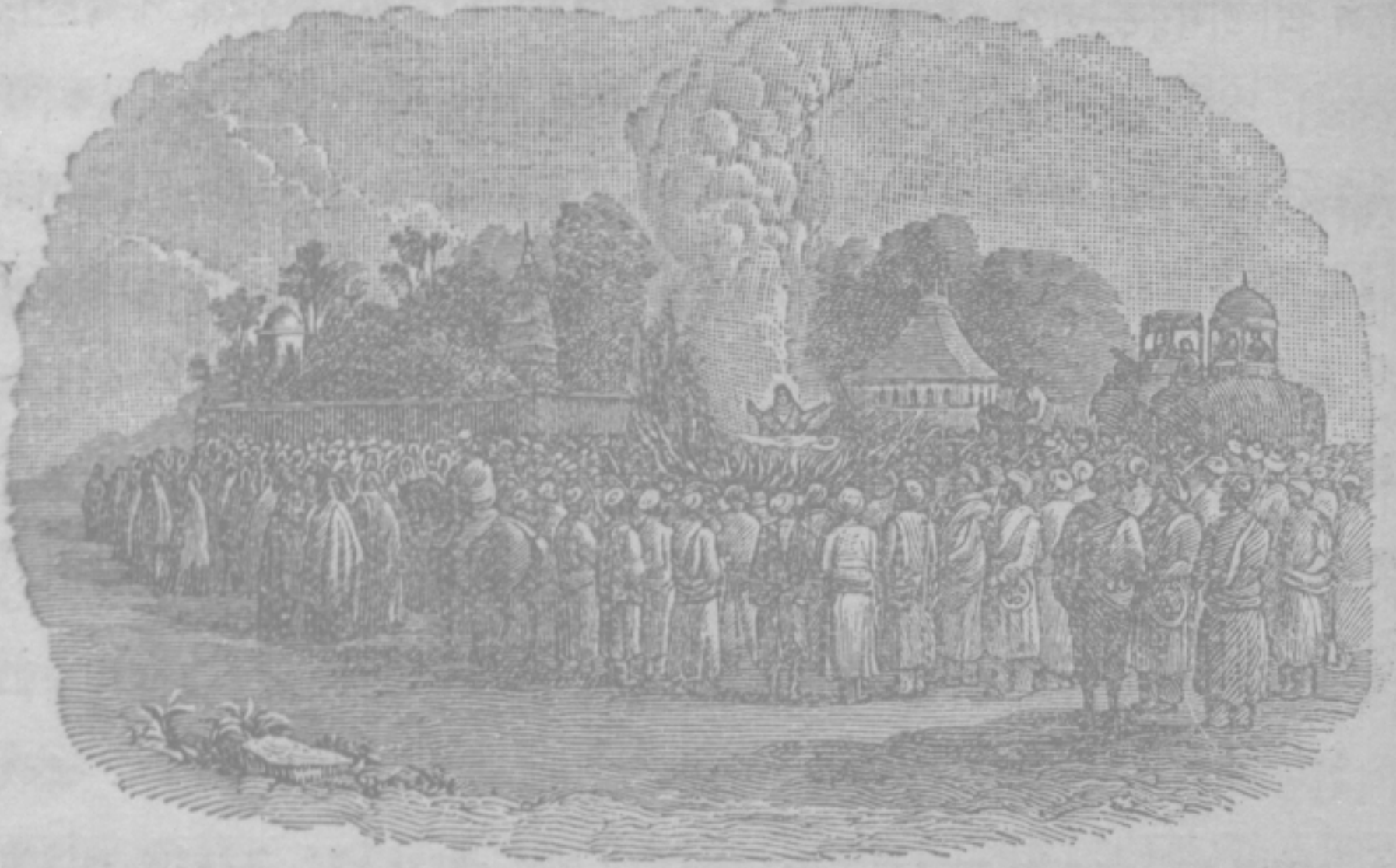
৪। ঠগেরা কালীর উপাসক ছিল। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বাহির হইত। এক এক দলে বার জন বা ইহার কিছু বেশী লোক থাকিত। তাহারা নিরীহ গ্রাম্য লোকের পোষাক পরিয়া বাহির হইত, কোন পথিকের সঙ্গে দেখা হইলে, গায় পড়িয়া তাহার সহিত বন্ধুতা বা প্রণয় করিত এবং নির্জন পথ বা নিবিড় বন পাইলেই তাহার

পলায় গামছা দিয়া সেই গামছা মোড়াইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত। ইহার পরে মৃতের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া শবটাকে পুতিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইত। তাহাদিগের উপাস্ত্র দেবী এইরূপ নরহত্যায় প্রসন্ন থাকেন, ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল। যে সময় তাহারা এই ভীষণ কার্যে নিরত না রহিত, তখন তাহারা অন্য লোকের ন্যায় কৃষি বা দোকানদারি করিয়া সময় কাটাইত। লোকে কিছুই টের পাইত না। তাহারা যে অন্য অন্য লোকের মত নহে, কেহই ইহা বুঝিতে পারিত না। সমস্ত ঠগদিগেরই নিজের একটা ভাষা বা অন্তের অবোধা কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন অভ্যস্ত ছিল। তাহাদিগের দলের লোক ভিন্ন অন্য কাহারও উহা বুঝিবার সাধ্য ছিল না।

৫। বেণ্টিঙ্ক ইংরেজ সৈনিকদিগকে ডাকাত ও ঠগ ধরিবার নিমিত্ত অনুমতি করেন। সাত কি আট বৎসর সময়ে ১৫০০ শতের অধিক ঠগ ধৃত হয়। এইরূপে কয়েক বৎসর পরে ঠগদিগের আর একটিও অবশিষ্ট থাকিল না। বহুশত বৎসর পরে এই প্রথম ভারতের পথ ঘাট পথিকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিরুপদ্রব হইল।

৬। বহু যুগযুগান্ত অবধি কতিপয় হিন্দুর মধ্যে সতীদাহ নামক বড়ই একটা নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল। পতির মৃত্যু হইলে, তাহার বিধবা পত্নীকে পতির শবের সহিত জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করাকেই সতীদাহ বা সতী বলিত। সহস্র সহস্র উপায়হীন বিধবা এইরূপে জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হইত। পুত্রেরা তাহাদিগের জীবন্ত মাতাকে চিতার আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে পারে, ইহা এমন রোমহর্ষণ ভীষণ অনুষ্ঠান যে, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতেও সমর্থ নহি। কিন্তু একমাত্র বঙ্গদেশে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরে ৭০০ বিধবাকে এইরূপে চিতায় দগ্ধ করা হইয়াছিল। আকবর একবার এই নিষ্ঠুর প্রথার নিবারণার্থ যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বেণ্টিঙ্ক চিরকালের তরে ইহা

ব্রহ্মিত করিয়া দেন। সমগ্র হিন্দু সমাজ এই কার্যের জন্ত তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।



[সতীদাহ]

৭। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বড় বেতনের উচ্চপদে কোন ভারত সন্তানকে নিয়োগ করেন নাই। এই বৎসর এই মর্মে এক আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, ভারতীয় যে কোন পদে বা কার্যে ভারত-সন্তানকে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু তাহাকে সর্ব-প্রকারে সেই পদ বা কার্য পাইবার উপযোগি-যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেশীয়দিগের মধ্যে যোগ্য লোক বড় বেশী পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বর্ষে বর্ষে ক্রমেই অধিকতর লোক নিযুক্ত হইতে থাকে। এক্ষণে গবর্ণমেন্টের অধীন বহুসংখ্যক পদই ভারতীয় লোকের হাতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক সর্বপ্রথম ভারতীয় লোকের জন্ত গবর্ণমেন্ট চাকরীর দ্বার মুক্ত করিয়া দেন। তদবধি সে দরোজা তেমনই খোলা রহিয়াছে। তখন বহুসংখ্যক দেশীয় লোক ডেপুটী কলেক্টার ও সব্-জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৮। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অধীন বহুপদে দেশীয় লোককে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহাদিগকে ইংরেজ কর্মচারীদিগের সহিত এত বিষয়ে এত কাজে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হইতে হইত যে, ইংরেজী ভাষাটি, উত্তমরূপে জানা, ইংরেজী পড়িতে, লিখিতে ও বলিতে পারা, তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ ইংরেজী গ্রন্থ সমূহে, শিল্প, বিজ্ঞান এবং অগ্ৰাণ্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের এত মূল্যবান তত্ত্ব সঞ্চিত আছে যে, দেশীয় ভাষায় গ্রন্থে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরেজী না শিখিলে ভারতের লোক কিরূপে এই সকল তত্ত্বের অধিকারী হইবে? কোন দেশের কোন গ্রন্থে যে কিছু ভাল ও সারবান্ পদার্থ আছে, ইংরেজী গ্রন্থে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কারণ, ইংরেজেরা পৃথিবীর সর্বত্র গমনাগমন, ও প্রত্যেক দেশের ভাষা শিক্ষা করেন এবং যে ভাষায় যে কোন সারবান্ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাই আপন ভাষায় অনুবাদ করিয়া রাখেন। এইরূপে ইংরেজী ভাষা, সমগ্র পৃথিবীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভাণ্ডার-গৃহ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিলেই এই ভাণ্ডার-গৃহের কুঞ্জী হস্তগত হইল। এই কুঞ্জী হাতে পাইলে, আর কথা নাই, উহা দ্বারা ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদঘাটন পূর্বক যে রত্ন ইচ্ছা, তাহাই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বেন্টিন্‌য়ের আজ্ঞাধীনে ভারতীয় লোকের শিক্ষার জন্য ইংরেজী বিদ্যালয় বা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বেন্টিন্‌য়ের সময়ের পরে ক্রমেই অধিকসংখ্যক ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য এক্ষণে এদেশে হাজার হাজার বিদ্যালয় বর্তমান আছে।

৯। ভারতের লোক বহুসংখ্যক জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজের একটা ভাষা আছে। এই ভাষা অন্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। মাদ্রাজের অধিবাসী, কোন সময়ে, পঞ্জাব-

জী-লোক ইত্যাদি পারস্পরিক না। কারণ সে পঞ্চক ভাষায় কথা বলিত।

কিন্তু এক্ষণ পাঞ্জাবী অনায়াসেই ইংরেজীতে মাল্জারী সহিত বাক্যান্যাপ করিতে সমর্থ। যেহেতু মাল্জার ও পঞ্জাব উভয় স্থানের বিদ্যালয়েই ইংরেজী শিক্ষা হইয়া থাকে। পরস্পর একই ভাষায় একে অণ্ডের সহিত আলাপ করিতে পারা, যেমন পঞ্জাববাসী, তেমন মাল্জারবাসী, উভয়ের পক্ষেই যার-পর-নাই সুখ-সুবিধা ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ, তাহারা সকলেই এক মহান নৃপতির আশ্রয়ে অবস্থিত এবং একই মহতী ভারতীয় জাতির অন্তর্নিবিষ্ট।

১০। মোগল ও আফগানদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সমস্ত বিচার আদালত ও সাধারণ কার্যালয়ে পারস্ত ভাষার প্রচলন ছিল। ভারতের শাসনকর্তা এখন ইংরেজ। বেন্টিঙ্ক পারস্তের স্থলে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন করিলেন।

(৭৬)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এবং প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল
সার চার্লস্ মেট্‌কাফ্‌।

১৮৩৫—১৮৩৬।

১। ভারতের অধিরাজরূপে গবর্ণর জেনারেলের যে কেবল ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকেই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে নিরস্ত রাখিতে হইত, এমন নহে। দেশীয় রাজারা আপন প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া সুশাসনে সুখে রাখিতেছেন কি না, ইহাও তাঁহাকে দেখিতে হইত।

গোয়ালিয়রে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইল। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার রাণী ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত সর্দারদিগের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। বেন্টিঙ্ক রাণী দ্বারা পোষ্য পুত্র গ্রহণ করাইলেন। এই পোষ্যের নাম জকজি। জকজি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

মল্লহর রাও হোল্কারও পুল-সন্তান না রাখিয়া পরলোক-গত হইলেন । তাঁহার রানীও শাসনকাৰ্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন । ইহাতে হোল্কার রাজ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল । বেণ্টিক্ মৃত রাজার জনৈক আত্মীয়কে রাজ্যাসনে অভিষেক করিলেন । এই আত্মীয় প্রজা লোকের শত্রু ছিলেন । সুতরাং রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল ।

রাজপুতনার বহুরাজ্যে বেণ্টিক্ এই প্রণালীর অনুষ্ঠান করিলেন । যাহারা যথার্থ স্বত্বাধিকারী রাজাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল, তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়হস্তে দমন করিলেন । যুদ্ধ ঘটনা হইলে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইত, তাহাকর্তৃক এইরূপে সেই লোকহত্যা নিবারিত হইল ।

২। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুৰ পতনের পর লর্ড ওয়েলেস্লি কৃষ্ণ রাজা নামে একটি শিশুকে মহীশূরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন । কৃষ্ণরাজা যখন মাত্র ষোল বৎসরের বালক, তখন তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় । কিন্তু কালে তিনি কু-শাসন-হেতু অযশস্বী হইয়া উঠেন । তিনি রাজকোষের সমস্ত অর্থ আপনার সুখ-বিলাসে উড়াইয়া দিতেন । তিনি রাজকৰ্ম্মচারীর পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত না করিয়া পরস্পর ডাকাডাকি করাইয়া যে সৰ্ব্বাপেক্ষা বেসী রাজ-নগর দানে স্বীকৃত হইত, তিনি তাহাকেই কর্ষে নিয়োগ করিতেন । কৃষ্ণ রাজা সৈন্যদিগকে বেতন দিতেন না । তাঁহার শাসনদোষে মহীশূরের লোক একান্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে । অবশেষে, তাহারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠে । রাজ্যে পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বেণ্টিক্ একদল ইংরেজ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন । রাজাকে বৃত্তি দিয়া রাজ-কাৰ্য্য হস্তে অর্পণ করিয়া দিয়া হইল ; এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরের

জয় মহীশূরের শাসন-কার্যে ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। এই সকল কর্মচারীকে মহীশূর কমিশন নামে অভিহিত করা হইল। রাজা



[কৃষ্ণ রাজা]

ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজাকুল স্থখী হইল। রাজা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ক্রমে পোষা গ্রহণ করিলেন। এই পোষাপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে মহীশূরের রাজা করা হইল এবং মহীশূর কমিশনের অস্তিত্ব লোপ পাইল।

৩। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ভারত ও চীনের সহিত বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে ভারতীয় বাণিজ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার রহিত হইয়া যায়। উহা সকলের পক্ষে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। এই বাবস্থা অনুসারে যাহার ইচ্ছা সেই ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই নিয়ম বড় একটা কার্যকর হইতে পারে নাই। একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কারণ, কোম্পানীর অনুমতি ভিন্ন অন্য কেহই ভারতে আসিয়া অবস্থান করিতে পারিত না। কুড়ি বৎসর পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, পার্লামেন্ট কোম্পানীর চার্টার বা সনন্দ পত্র, আবার কুড়ি বৎসরের জন্য পরিবর্তন করিয়া দেন। কিন্তু এই নিয়ম করা হয় যে, কোম্পানী ভারতের সহিত আর একবারেই বাণিজ্য করিতে পারিবেন না। নূতন সনন্দে তাঁহাদিগকে কেবল ভারত-শাসনের অধিকার প্রদত্ত হইল। এই সময় হইতে যে কোন ইংরেজের ভারতে আসিয়া, যে কোন স্থানে ইচ্ছা, বাস করিবার অধিকার জন্মিল। এজন্য আর কাহারও অনুমতি গ্রহণের অপেক্ষা রহিল না। ইহার পরে বহু ইংরেজ ভারত দর্শন ও ভারতের সহিত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করিতে থাকেন। বাণিজ্য অতি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং ভারতের লোক অধিকতর ধনসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই সময়ে চীনের সহিত বাণিজ্যও সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত হইয়াছিল।

৪। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব যে রাজ্য ছাড়িয়া দেন এবং সিদ্ধিয়া হইতে যে রাজ্য গ্রহণ করা হয়, সেই সকল রাজ্য দিয়া এইক্ষণ-কার এই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। তখন আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশ নামে অভিহিত হয় এবং এই প্রদেশের শাসনার্থ একজন লেপ্টেনান্ট গবর্নর নিযুক্ত হন।

৫। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশের পশ্চিম

দিকে অবস্থিত এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের অন্তর্গত। হাইদার ও টিপু



[কুর্গরাজ]

কুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু রাখিতে পারেন নাই। কারণ, কুর্গবাসী পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়াছিল। টিপু মৃত্যুর পরে, তদানীন্তন কুর্গরাজ শাস্তিতে ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী দুই রাজা নিতান্ত মন্দভাবে শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। বেষ্টিকের সময়ে যিনি রাজা ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তিনি শত শত কুর্গবাসীকে হত্যা এবং আপনার ভ্রাতা ও ভগিনী-দিগকেও নিহত করেন। কুর্গরাজ্যে

কাহারও জীবন নিরাপদ ছিল না। যাহারা রাজার খর্পর হইতে অব্যাহতি পাইল, তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। রাজাকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী তাঁহার রাজ্যে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বেষ্টিক কুর্গে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজার সেনারা সাহসিক বীরপুরুষের গ্রাম যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু রাজা স্বয়ং অরণ্যে পলায়ন করিলেন। সত্বরেই তাঁহাকে ধৃত করা হইল। রাজা ধৃত হইলে, গবর্নর জেনারেল কুর্গের সর্দারদিগকে নূতন একজন রাজা নির্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন। কোন রাজা দ্বারা শাসিত না হইয়া কুর্গ ইংরেজের শাসনাধীন হউক, তাহারা একবাক্যে এই প্রার্থনা জানাইলেন। সুতরাং গবর্নর জেনারেল তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে কুর্গদেশ ব্টিস রাজ্যভুক্ত

করিয়া লইলেন। সেই সময় হইতে কুর্গবাসী বিনা অনুমতিতে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার লাভ করিয়াছে।

৬। বেণ্টিক্লেবের পরে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একবৎসর কাল, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণর সার চার্লস্ মেটকাফ্ প্রতিনিধিরূপে গবর্ণর জেনেরেলের কার্য করেন। তিনি ভারতবাসীকে সংবাদপত্র ছাপা-ইবার অধিকার প্রদান করেন। যাহাতে কাহারও কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে, এমন বিষয় ভিন্ন, সংবাদপত্রে যাহা প্রাণে চায়, তাহা লেখা যাইতে পারিবে, এজ্ঞা কাহারও অনুমতিগ্রহণ করিতে হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়।



[সার চার্লস্ মেটকাফ্]

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত মাত্র ছয়-খানি সংবাদপত্র ছিল। এইক্ষণে ঈদৃশ সংবাদপত্রের সংখ্যা ছয় শতেরও উপর উঠিয়াছে।

(৭৭)

দশম গবর্ণর জেনেরেল

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ।

১৮৩৬—১৮৪২

১। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড যখন গবর্ণর জেনেরেল হইয়া আইসেন, প্রায় সেই সময়েই আফ্‌গানিস্থানে গোলযোগ উপস্থিত হয়। দুই জন সর্দার আফ্‌গানিস্থানের সিংহাসন দাবি করেন। এই দুই জনের এক জন আহম্মদ শাহার বংশধর শা সুজা, অপরজন শাহের প্রধান মন্ত্রীর বংশ-



সন্তুত দোস্ত মহম্মদ। দোস্ত মহম্মদ দুইএর মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠেন এবং শা সুজাকে কাবুল হইতে তাড়াইয়া দেন। শা সুজা ভারতে পলাইয়া আসিয়া, নিজের ভরণপোষণার্থ ইংরেজের নিকট হইতে যথোপ-যুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

২। গবর্ণর জেনেরেল মনে করিলেন যে, আফ্‌গানিস্থানের আমীর ইংরেজের বন্ধু হইলেই ভাল হয়। আমীর বন্ধু ভাবাপন্ন হইলে, তিনি সময়ে

[লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড]

ইংরেজদিগকে সাহায্য করিবেন এবং যদি কালে রুষেরা ভারত আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে, তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব গবর্ণর জেনেরেল শা সুজাকে আফ্‌গান-

সিংহাসনে বসাইবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ, শা সুজাই আফ-
গানিস্থানের যথার্থ স্বত্বাধিকারী ও ইংরেজের শরণাপন্ন বন্ধু।

৩। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একদল ইংরেজ সেনা সিন্ধু নদ পার হইয়া,
বোলানপাশের পথে বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া কান্দাহার অভিমুখে
যাত্রা করিল। এই সৈন্য কর্তৃক প্রথমে কান্দাহার অধিকৃত হইল।
কান্দাহার অধিকৃত হইলে ইংরেজ-সেনা গজনীতে গমন করিলেন।
কঠোর যুদ্ধের পর গজনীও অধিকৃত হইল। দোস্ত মহম্মদ উত্তর দিকে
বোখারায় পলাইয়া গেলেন। শা সুজাকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে
স্থাপন করা হইল। শাসন-কার্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত ইংরেজ
কর্মচারী শ্রু ডব্লিউ ম্যাকনেটন আফগানিস্থানে রহিলেন।

৪। পর বৎসর দোস্ত মহম্মদ ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ
করিলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দোস্ত
মহম্মদ কলিকাতায় আনীত হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাঁহার
সহিত সদয় ব্যবহার করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র আফগান
সর্দার আকবর খাঁ বশুতা স্বীকার করিলেন না। আকবর
খাঁ ভীষণ প্রকৃতি আফগান যুবা। বহু আফগান তাঁহার সহিত
যোগদান করিল। শা সুজা নিতান্ত দুর্বল প্রকৃতি ও শাসন-কার্যে
অসমর্থ। তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে ঘৃণা করিত। শা সুজা সিংহাসনে
স্থাপিত হইলে, ইংরেজ সেনার এক অংশ ভারতে ফিরিয়া আসিল।
অল্পসংখ্যক সৈন্য কাবুলে অবস্থিত ইংরেজ কর্মচারীর রক্ষকরূপে সেই
স্থানে রহিয়া গেল।

৫। শা সুজা মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পরেই আফগানেরা
বিদ্রোহী হইয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।

শা সুজা বিদ্রোহীদের নাস্তক। শ্রু ডব্লিউ ম্যাকনেটন সন্ধি

স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত্র অবস্থায় বন্ধু ভাবে



[শা সুলতান]

আকবর খাঁর সহিত আলাপ করিতে ছিলেন, এই সময় হঠাৎ আকবর খাঁ তাঁহাকে গুলি করিলেন আর অমনি আফ্গানেরা আসিয়া তাঁহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

৬। ইহার পরে কাবুল আক্রমণ করা হইল। ইংরেজের ক্ষুদ্র একদল সেনা কাবুলে ছিল। এই সৈন্যদলের ইংরেজ জেনেরেল দেখিলেন যে, এত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার এই পরিমাণ সৈন্য-বল নাই। খাদ্যসামগ্রীও সঞ্চিত

ছিল না। অতএব, তিনি নিতান্ত নির্বোধের ত্যায় ভারতে ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই গুরুতর ভ্রম হইল। আর্কটে ক্লাইব যাহা করিয়াছিলেন; তিনি যদি কলিকাতা হইতে সাহায্য আনিয়া পহুঁচা পর্যন্ত কাবুলেও তাহাই করিতেন, তাহা হইলেই কাবুলের দুর্গ রক্ষিত ও কৃতী সেনাপতির উপযোগী কার্য্য হইত। ইংরেজ সেনা কাবুল ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, আফ্গানেরা পথে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না, এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কিন্তু কার্য্যকালে বিশ্বাসঘাতক আফ্গানেরা তাহাদিগের সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। হাজার হাজার আফ্গান ইংরেজ সৈন্যের উপর গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ সৈন্য যখন অগ্রসর হইয়া সঙ্কীর্ণ খুর্দ কাবুল পাস বা গিরিপথ দিয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল, তখন

উপরিস্থ পর্বতস্থিত স্থানীয় দেশীয় সিপাহী হইতে তাহাদিগের উপর মুঘলধারায় গুলিবর্ষণ হইল। একমাত্র ডক্টার ব্রাইডন ভিন্ন অন্য সকলেই নিহত হইলেন।

(৭৮)

একাদশ গবর্ণর জেনেরেল লর্ড এলেনবরো।

১৮৪২—১৮৪৪।

১। কাবুল হইতে ইংরেজ সৈন্তের প্রস্থানের পর লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন এবং লর্ড এলেনবরো ভারতের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া আসিলেন।

২। আফ্‌গানিস্থানে ক্ষুদ্র দুই দল ইংরেজ সৈন্ত রহিল। জেনেরেল নট্টের অধীন একদল কান্দাহারে; জেনেরেল সেলের অধীন আর একদল জালালাবাদে। তাঁহারা সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিলেন। কাবুলের সৈন্তদিগেরও ইহাই করা উচিত ছিল। অতঃপর ভারত হইতে জেনেরেল পোলক প্রবল একদল সৈন্তসহ আফ্‌গানিস্থানে পাঠান হইল। তিনি খাইবারপাশের পথে জেলালাবাদে উপস্থিত হইয়া, জেনেরেল সেলকে আফ্‌গানদিগের অবরোধ হইতে রক্ষা করিলেন। আকবর খাঁ ও আফ্‌গানগণের সহিত প্রবল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আফ্‌গানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। জেনেরেল পোলক ইহার পরে কাবুলে



[লর্ড এলেনবরো]

গমন ও আর একবার কাবুল অধিকার করিলেন। তিনি দেখিতে



[আকবর খা]

পাইলেন যে, ইংরেজেরা চলিয়া
যাওয়ার পরেই আকবর খাঁর
সেনারা শা স্জাকে হত্যা করিয়া
ফেলিয়াছে। বৃটিস সেনা কাবুলের
দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভারতে ফিরিয়া
আসিল। ইহার পরে দোস্ত
মহম্মদকে মুক্তিদান করা হইল।
তিনি কাবুলে গমন করিলেন এবং
ইংরেজের সহায় ও মিত্ররূপে
কাবুল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

৩। সিন্ধু প্রদেশের আমীরেরা
যখন শুনিতে পাইলেন যে, আফ-
গানেরা ইংরেজ সৈন্যদলকে খণ্ড

খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহারা নিরতিশয় সাহসী হইয়া উঠিলেন
এবং সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রথম
তাঁহারা বৃটিস রেসিডেন্ট জেনারেল আউট্রামকে আক্রমণ করিলেন।
কিন্তু আউট্রাম প্রাণ লইয়া সরিয়া গেলেন। ইহার পর, জর্জ চার্লস
নেপিয়ার তিন হাজার সৈন্যসহ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন।
আমীরদিগের ত্রিশ হাজার বেলুচী সেনা ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিয়ানি
ও সিন্ধু প্রদেশের হাইদরাবাদে দুটা বড় যুদ্ধ হইল। জর্জ চার্লস
নেপিয়ার উভয় যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধের অবসানে গবর্নর
জেনারেল সিন্ধু প্রদেশটিকে বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

৪। এই সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা জাহাজি সিন্ধিয়ার মৃত্যু
হইল। লর্ড বেলিঙ্ক তাঁহাকে গোয়ালিয়র সিংহাসনে স্থাপন করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান নাই। তিনি নিতান্ত দুর্বল-
প্রকৃতি ও অকর্মণ্য শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার সর্দারেরাও তাঁহার



[আমীরজাদাগণ]

আজ্ঞা পালন করিতেন না। সৈন্যদল সর্দারদিগের রক্ষিত ও আয়ত্ত ছিল এবং সৈন্য সংখ্যা এত বাড়িয়া পড়িয়াছিল যে, উহার ব্যয়বহন একান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ সৈন্যের জন্ত ব্যয়িত হইত। সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বার বৎসরের বালিকা। তিনি পোষ্যগ্রহণে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সুতরাং পোষ্যগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই তিনি তাঁহার পতির দূরদর্শী বৃদ্ধ মন্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

৫। শূর হাগ্ গাফ্ আগ্রা হইতে একদল সৈন্যসহ গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজপুর ও পুন্নিয়ারের দুই বৃহৎ যুদ্ধে গোয়ালিয়রের সর্দারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। গবর্ণর জেনারেল রাণীর গৃহীত পুত্র শিশু জয়জির বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত একটি মন্ত্রীসভা দ্বারা সিন্ধিয়ার শাসনকার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই মন্ত্রীসভা ছয় জন মহারাটা অভিজাত দ্বারা গঠন করা হইল।

সিন্ধিয়া রাজ্যের সৈন্য সংখ্যায় ৪০০০০ হাজার লোক ছিল, উহা কমাইয়া ৯০০০ করা হইল। রাজ্যে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত একদল ইংরেজসৈন্য গোয়ালিয়রে রহিল।

(৭৯)

দ্বাদশ গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ।

১৮৪৩—১৮৪৮ ।

১। রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবের রাজা। তিনি পঞ্জাবে একটা অতি বড় দৃঢ় রাজ্য গঠন করিয়া লইয়াছেন। রণজিৎ পঞ্জাবের সিংহ নামে অভিহিত। রাজা রণজিৎ লিখিতে বা পড়িতে জানেন না; যষ্টির উপর রেখা অঙ্কিত করিয়া আপনার হিসাব ঠিক রাখেন। তিনি খর্বাকৃতি, বাল্যকালে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার একটি

চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ ছিল। রণজিৎ ইংরেজের অবিচল বন্ধু। তিনি যেমন দূরদর্শী তেমনি শাসন-কার্য্যে দৃঢ় ও দক্ষ। তিনি তাঁহার সর্দারদিগকে সর্বতোভাবে বশে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। তিনি কাশ্মীর রাজ্য জয় ও অধিকার করিয়া লন। তাঁহার ফরাশি সেনানী কর্তৃক সুশিক্ষিত ও দৃঢ়গঠিত একদল সৈন্য ও বহুসংখ্যক



[লর্ড হার্ডিঞ্জ]

কামান ছিল।

২। চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ পরলোক-
গত হন। তাঁহার রাণীদিগের মধ্যে পাঁচ জন তাঁহার সহিত চিতা
আরোহণ করিয়া জীবন্ত দগ্ধ
হইয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে স্থাপিত
হন, কিন্তু সহরেই তাঁহাকে
সিংহাসনচ্যুত করা হয়। ইহার
পরে দুই বৎসর কাল, ষড়যন্ত্রের
পর ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। রাজ-
বংশীয় বহু কুমার নিহত হন।
অবশেষে শিখসৈন্তের সেনাপতি
তেজসিংহ পঞ্জাবে সর্বময় ক্ষমতা-
পন্ন হইয়া উঠেন। ইংরেজসৈন্তের
আফগানিস্থান হইতে অপসরণ
অবধি শিখসৈন্তদিগের মনে এই দৃঢ়



[রণজিৎ সিংহ]

ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা :এক্ষণ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে
সম্যক্ সমর্থ। এই বিশ্বাসবশে শিখেরা দিল্লী লুণ্ঠনের জন্ত একান্ত ব্যগ্র
হইয়া উঠিল। তাহারা শতদ্রু নদী পার হইয়া বৃটিশ রাজ্যে প্রবেশ
করিল। তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে শিখ ও ইংরেজে চারিটা প্রবল যুদ্ধ হইয়া
গেল। শিখেরা রণ-শৃঙ্খলা ও গতি-বিধিতে অশিক্ষিত ছিল, তাহারা
সাহসের সহিত যুদ্ধ করিল। ভারতে ইংরেজদিগকে যে সকল বিপক্ষের
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, শিখেরা তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রবল-
তম বীর। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মুদকি ও ফিরোজসার সমরে ভারতের
সর্বপ্রধান সেনাপতি স্যর হাগ্-গাফ্ ও গবর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ
কর্তৃক তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। পর বৎসর, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে

জানুয়ারি মাসে আলিওয়ালে শূর, এচম্বিথ্ ও মোব্রাওনে শূর, হাগ্, গাক্, তাহাদিগকে আবারও যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন।

৩। এইরূপে প্রথম শিখ যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। শিখদিগের সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া কুড়ি হাজার করা হইল। শতদ্রু ও রাবী নদীর মধ্যবর্তী পঞ্জাবের এক অংশ ইংরেজেরা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে গোলাপ সিংহকে কাশ্মীরের রাজা করা হয়। তিনি রণজিৎ সিংহের অধীন কাশ্মীরের গবর্নর ছিলেন। প্রতিদানে গোলাপ সিংহ যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিলেন। দলীপ সিংহ নামক রণজিতের একটি অবগণ্ড শিশু পুত্রকে পঞ্জাবের রাজা করিয়া তাঁহার মাতাকে দলীপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল।

(৮০)

ত্রয়োদশ গবর্নর জেনেরেল লর্ড ডালহৌসী।

১৮৪৮—১৮৫৬

১। লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনি আট বৎসর কাল ভারতের গবর্নর জেনেরেল ছিলেন। যাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি ও গঠন করেন, লর্ড ডালহৌসি তাঁহাদেরই একজন। তিনি এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অষ্টাদিগের পর্যায়ে চতুর্থ স্থানীয়। লর্ড ক্লাইব, লর্ড ওয়েলেসলি এবং লর্ড হেষ্টিংসের তায় তিনিও বহু দেশীয় রাজার রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এদেশকে পূর্বাশ্রয় অধিকতর সুখী ও সমৃদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ ধন ও বহুকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

২। লর্ড ডালহৌসির ভারতে আগমনের পর ছয় মাস অতীত হইতে না হইতেই, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুলতানের শিখ গবর্নর মুলরাজ দুটি যুবক ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করিয়া, আর একবার

ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত শিখদিগকে আহ্বান করেন ।
তিন বৎসর পূর্বে যে সকল শিখকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,
শিখ সর্দারেরা পুনরায় সেই পুরাতন সৈন্যদিগকে ডাকিয়া আনিলেন ।
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ জেনেরেল শির সিংহের অধীন পুনর্বার প্রবল
একদল শিখসৈন্য সমবেত হইল । শির সিংহ এই সৈন্য লইয়া ইংরেজ-
দিগকে আক্রমণ করিলেন ।

৩। শ্রু হাগ্ গাফ্ তাহাদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন ।
তিগেনওয়ালায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল । ইংরেজেরা এই যুদ্ধে জয়ী হইলেন
বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রভূত লোকসংখ্যা ও ক্ষতি হইল । ইহার
অল্পকাল পরেই গুজরাটে আর একটা যুদ্ধ হয় । গুজরাটের যুদ্ধেই
শিখদিগের শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পূর্ণ পরাভব ঘটে ।

৪। লর্ড ডালহৌসি পঞ্জাবে স্থায়ী শান্তিস্থাপনের জন্ত ও আফ্গান-
দিগের আক্রমণ হইতে ভারতকে
অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত ১৮৪৯
খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবপ্রদেশ বৃটিশ রাজ্য-
ভুক্ত করিয়া লইলেন ; এবং দলীপ
সিংহকে প্রচুর বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে
প্রেরণ করিলেন । তিনি সেখানে
ইংরেজ লর্ডের আশ্রয় বাস করিতে
থাকিলেন । মিষ্টার জন লরেন্সকে
চিফ কমিশনার পদবী দিয়া পঞ্জাবের
সর্বময় শাসনকর্তা করা হইল ।
এই লরেন্স শেষে গবর্নর জেনেরেল
হইয়াছিলেন । সাহসী শিখসৈন্য
দিয়া ইংরেজ সেনানায়কের অধীন



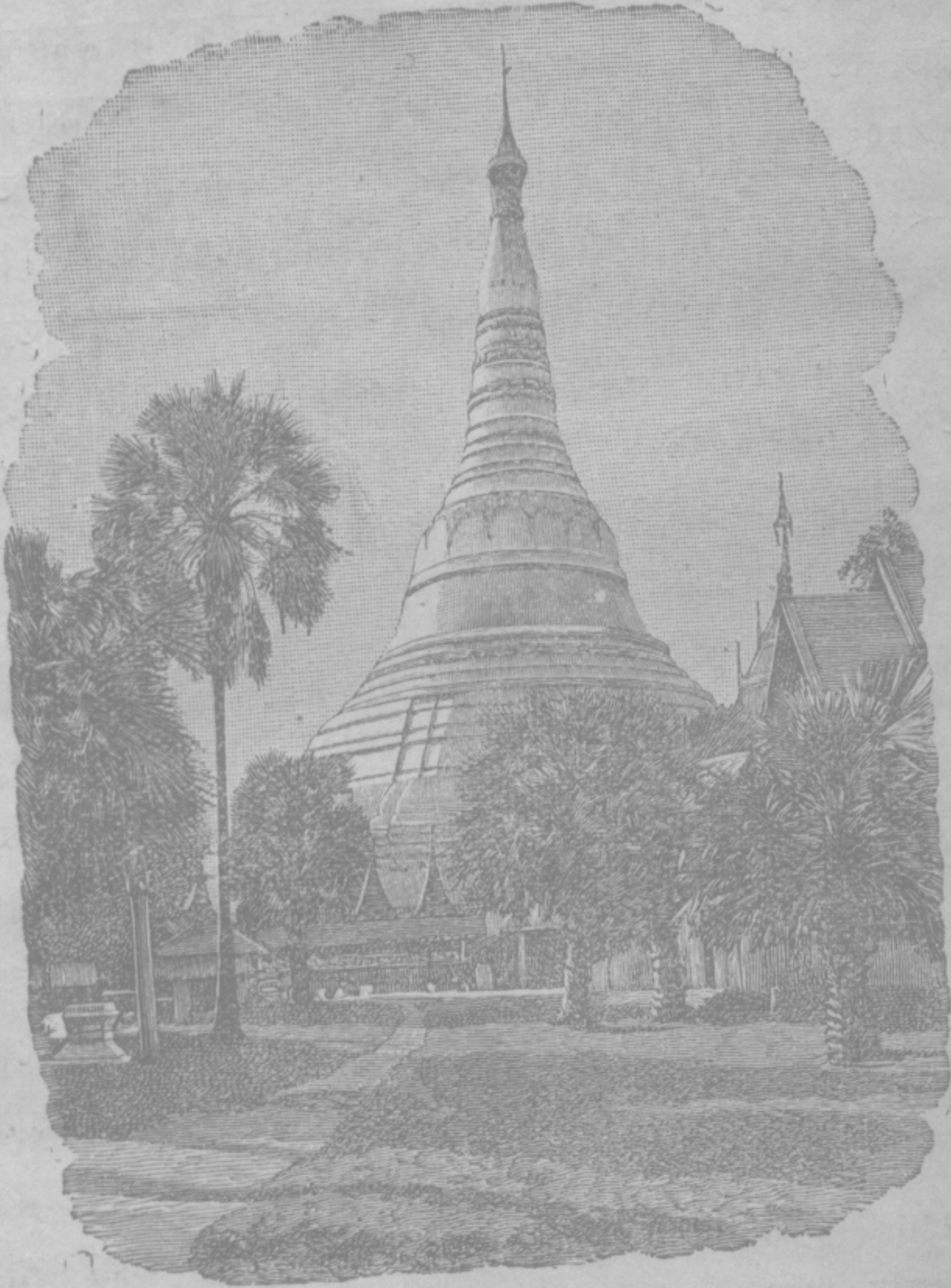
[লর্ড ডালহৌসী]

ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেন্ট বা পল্টন গঠন করা হইল। এই শিখ ও
 অন্যান্য সৈন্যই এক্ষণ ভারতীয় দেশীয় সৈন্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট।
 বিশেষ যত্নের সহিত পঞ্জাবের ভূমি পরিমাপ বা জরিপ করা হইল।
 রাজা রণজিতের সময়ে শস্যের মূল্যের অর্দ্ধ রাজকররূপে নির্দিষ্ট ছিল;
 ইংরেজেরা ভূমির কর এক-চতুর্থাংশেরও কম করিয়া ধার্য্য করিলেন।
 দেশের মধ্যে যে পণ্য দ্রব্য নানা স্থানে আমদানী ও রপ্তানী হইত,
 তাহার সমস্ত শুল্ক রহিত হইয়া গেল। ইংরেজের শাসন-কালে দেশের
 দস্যাদল দমিত হইল। পঞ্জাবে রাস্তা নিৰ্ম্মিত, খাল খনিত, বিদ্যালয়
 প্রতিষ্ঠিত এবং গ্যায়োপেত ও হিতকর বিধি-ব্যবস্থা প্রণীত হইল। এক্ষণ
 হইতে শিখ-রাজ্যের শাসন-কার্য্য, পূর্ববর্তী সকল সময় অপেক্ষা অধিক-
 তর সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে লাগিল।

৫। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মার সহিত জান্দাবুতে সন্ধি হয়। বর্ম্মার রাজা
 পুনঃ পুনঃ সেই সন্ধির সর্ব্ব ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ম্মার লোকেরা
 ইংরেজ জাহাজের কাপ্তানদিগকে কারাবদ্ধ করিল। কেন তাহারা এক্রপ
 করিতেছে, ইহা জানিবার জন্য বর্ম্ম দেশে ইংরেজ কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল।
 বর্ম্মবাসী অসহায় ইংরেজ কর্ম্মচারীকে হাতে পাইয়া হত্যা করিয়া ফেলিল।

৬। এই কারণে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধ হয়। একদল
 ইংরেজ সৈন্য রেন্সুগে আসিয়া রেন্সুগে অধিকার করিয়া লয়। রেন্সুগের
 পেগোডা মন্দিরের নিকটে ভিন্ন অন্তত্ব কোন যুদ্ধ হয় নাই। রেন্সুগের
 লোকেরা বর্ম্মার রাজা কর্তৃক যে ভাবে শাসিত হইতেছিল, ইংরেজ কর্তৃক
 তেনাসরিম ও আরাকান প্রদেশ তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল ভাবে
 শাসিত হইতেছে, সেখানকার লোক অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে আছে,
 ইহা দেখিয়া তাহারাও ইংরেজ-শাসনের অধীন হইতে উৎসুক হইয়াছিল।
 তাহারা ইংরেজদিগকে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী ও অন্ত যে কোন বস্তু যখন

৭। বর্মার রাজার রাজধানী, আভা। আভা নগর উচ্চ বর্গে অবস্থিত। বর্মার রাজা আপন রাজধানী আভা নগরে ছিলেন। তিনি



[পেগোডার মন্দির]

কোনরূপ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পেগু ও আরও দুইটি প্রদেশ রেঙ্গুনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সমগ্র প্রদেশের বৃটিশ বর্গা নাম রাখিলেন। রেঙ্গুণ এই প্রদেশের প্রধান নগর হইল। সেই হইতে রেঙ্গুণ একটা বৃহৎ বাণিজ্য নগর বা বন্দরে পরিণত হইয়াছে।

সেখানকার লোকসংখ্যা বর্মার রাজার শাসন-সময় অপেক্ষা কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমগ্র দেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে । এক্ষণ আর সেখানে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই । নিষ্ঠুর রাজার যখন প্রবৃত্তি হইত, শত শত লোক হত্যা করিয়া ফেলিতেন । এক্ষণ আর সেখানে একরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার নাই, সর্বত্র সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে । অধুনা সেখানে সকল দিকেই স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্য এবং সর্বত্রই ন্যায়সঙ্গত বিধি-ব্যবহার আধিপত্য ।

৮। সেতারা একটি ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্ররাজ্য । ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ার পতন হইলে, এই রাজ্যটি শিবজির বংশজাত কোন রাজকুমারকে দান করা হইয়াছিল । এই রাজপুত্র সন্তান না রাখিয়া পরলোকগত হন । ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সেতারা রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায় ।

৯। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের ভৌন্সলা রাজা ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করেন । তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না । এ রাজ্যটিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া সেন্ট্রেল প্রভিন্স বা মধ্যরাজ্য নামে অভিহিত ও চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীন হয় । নিজামের রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সেনা স্থাপিত হইয়াছিল ; এই সেনার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নিজাম এই বৎসরই বিহার প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে ফিরাইয়া দেন । ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেস্লি ইহা হায়দরাবাদের নিজামকে দান করিয়াছিলেন ।

১০। অযোধ্যার নবাব এমন বিশৃঙ্খলভাবে রাজ্য শাসন ও প্রজার প্রতি এতদূর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন যে, প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে । লর্ড বেন্টিনক ও লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে শাসনকার্য্যের উৎকর্ষ বিধানার্থ বারংবার বলিয়া পাঠান এবং এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, যদি তিনি রাজ্য-শাসনের

সুন্দোবস্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে। কিন্তু তিনি এই সকল কথাই কর্ণপাতও করেন না, অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়ে। অযোধ্যা রাজ্যটি দ্রুতগতি বিনাশের পথে চলিয়া পড়িতে থাকে। অযোধ্যাকে অধঃপাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে অন্য কোন সুপথ না দেখিয়া, ইংরেজ গবর্নমেন্ট ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্নর জেনেরেলকে অযোধ্যা বৃটিশ শাসনের অধীন করিয়া লইতে আদেশ প্রদান করেন। নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়।

১১। ডালহৌসী কর্তৃক এইরূপে রাজ্য গ্রহণের পরে বৃটিশ ইণ্ডিয়া, পূর্বের আয়তন অপেক্ষা আয়তনে, এক-তৃতীয়াংশ হইতে একাদ্বি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময় পর্যন্ত বাঙ্গালার গবর্নরই সমগ্র ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরেল ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কাজ এত বাড়িয়া পড়িল যে, এক ব্যক্তি দ্বারা গবর্নর ও গবর্নর জেনেরেলের উভয়বিধ কর্ম সম্পাদন অসাধ্য হইয়া উঠিল। অতএব, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা রাজ্য লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের অধীন করা হইল এবং গবর্নর জেনেরেল সমগ্র ভারত-শাসনের জন্য অবিভক্তভাবে মন-সম্মিবেশে অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়েই গবর্নর জেনেরেল ও তাঁহার কাউন্সিল বা মন্ত্রীসভা কলিকাতা হইতে পঞ্জাবের পর্কতনিবাস সিম্লাম চলিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। তদবধি তাঁহারা ঐ পর্কত-নিবাসে বৎসরের দুই-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন।

(৮১)

লর্ড ডালহৌসী।

বৃটিশ শাসনের উপকারিতা।

১। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব-

এই সময় পর্যন্ত বাঙ্গালার গবর্নরই সমগ্র ভারতবর্ষের

২৮০০০ মাইল রেলপথ বর্তমান আছে । প্রায় সমস্ত বড় বড় নগর ও সমুদ্র-বন্দর রেলের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে । এই সকল রেলপথে প্রতি বৎসর ১০০ মিলিয়ন বা দশ কোটিরও অধিক লোক যাতায়াত করে । রেলপথে দেশের সর্বত্র পণ্য দ্রব্য বাহিত হইতেছে । দেশের কোন স্থানে যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন অন্য দেশ হইতে অনায়াসে শস্ত আনীত ও তদ্বারা অসংখ্য লোকের জীবন রক্ষিত হইয়া থাকে । রেলওয়ের প্রসারে সৈনিক বায়ও বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে । রেলওয়ে না থাকিলে, দেশের সর্বত্রই বহুসংখ্যক সৈন্য প্রস্তুত রাখিতে হইত । এখন তাহা না করিয়া সৈন্যদিগকে এক মাত্র স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখা হইতেছে এবং যখন যেখানে প্রয়োজন পড়িতেছে, তাহাদিগকে সেই স্থানেই রেলপথে অক্লেশে পাঠান যাইতেছে ।

২। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে ভারতের বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ভারতের বণিকগণ পূর্বাশ্রয় তিন গুণ বেশী কার্পাস ও শস্ত-ক্রয়-বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে । সর্বত্র খাল, পথ ও রেলওয়ে থাকা হেতু, অতি সহজে বাণিজ্য দ্রব্য দেশের এদিকে সেদিকে সর্বত্র চালান দেওয়ার সুবিধা হয় । ইংরেজ বণিকেরা ইংলণ্ড হইতে এদেশে নানাপ্রকারের দ্রব্য-সামগ্রী আনয়ন করেন । সুতরাং যে সকল জিনিষ এদেশের কোন স্থানে একবারেই পাওয়া যাইত না, অথচ অত্যন্ত মহাৰ্থ ছিল, সেই সকল জিনিষ প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে ।

৩। রাস্তা ও পুল নির্মাণ, খাল খনন, এবং তৎসমস্তের যথোপযুক্ত সংস্থার বিধানকল্পে পাব্লিকওয়ার্ক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় । লর্ড ডালহৌসী এই বিভাগের সৃষ্টিকর্তা । তাঁহার সময়েই ২০০০ মাইলের অধিক দীর্ঘ পণ্য-বহনের পথ প্রস্তুত এবং ঐ পথে পুল নির্মাণ ও পদ্মার সেই মহতী পয়ঃপ্রণালী বা খাল খোলা হইয়াছিল । ইহার

মত সুদীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী বা খাল, পৃথিবীর আর কোন স্থানে দৃষ্টি-গোচর হয় না। এতদ্ব্যতীত এই সময়েই আরও বহুসংখ্যক খাল খনিত হইয়াছিল। দেশের প্রভূত পরিমাণ অনাবাদি পতিত ভূমি এই সকল খালের পথে প্রচুর জল প্রাপ্ত হইতে থাকে। পূর্বে যে সকল অশুষ্ক ভূমিতে কোন শস্যই উৎপন্ন হইত না, সেই সকল স্থান খাল বা পয়ঃপ্রণালীর প্রসাদে উর্বর ও শস্যশালী হইয়া উঠে। খালগুলির দৈর্ঘ্য ১৮০০০ মাইলেরও উপরে ছিল।

৪। লর্ড ডালহৌসীর পূর্বে রাস্তা অল্প ছিল; রেলপথ এক-বারেই ছিল না; ডাকবাহক বা রানারেরা ধীর-গতিতে চলিত; এবং ডাক মাসুলের হারও অত্যন্ত বেশী ছিল; এই সকল কারণে, ডাকে বড় বেশী চিঠি পত্র প্রেরিত হইত না। তখন ডাক ষ্ট্যাম্প বা টিকেট ছিল না। দূরতা অনুসারে পত্রের মাণ্ডল বেশী বা কম হইত। নিকটবর্তী স্থানের তুলনায় দূরবর্তী স্থানের মাণ্ডল অনেক অধিক ছিল। লর্ড ডালহৌসী অর্ধ আনা ষ্ট্যাম্প বা টিকিটের ব্যবহার প্রবর্তিত করেন। এক্ষণ অর্ধ আনা মূল্যের টিকিটে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ২০০০ মাইলের পথে চিঠি যাতায়াত করিয়া থাকে। যদি সমগ্র ভারত এক প্রবল রাজশক্তির অধীন না হইত, তাহা হইলে এই সুবিধা কখনও হইতে পারিত না। এইক্ষণ ১৩৫০০০ মাইল পথে ডাক যাতায়াত করে এবং প্রতিবর্ষে ডাকে ৪০০ মিলিয়ন বা ৪০ কোটি চিঠি প্রেরিত হইয়া থাকে।

৫। অর্ধ আনা ডাক টিকিট অপেক্ষাও বৈজ্ঞানিক টেলিগ্রাফ অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার। কএক মিনিটে, কএক আনা পয়সা ব্যয়ে টেলিগ্রাফ যোগে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। লর্ড ডালহৌসীর সময়েই প্রথম এদেশে টেলিগ্রাফের তার বসান হয়।

৬। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী শিক্ষার জন্ত স্কুল বা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লর্ড ডালহৌসী সাধারণ শিক্ষা বিভাগের (Department of Public Instruction) প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই সময়ে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্ত বহুসংখ্যক স্কুল স্থাপিত এবং সর্বত্র সর্বসাধারণের জন্ত লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার সময়ে সমগ্র ভারতে ২৫০০০ স্কুল ছিল। এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এইক্ষণ ১৫০০০০ দেড় লক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই সকল স্কুলের ছাত্র সংখ্যা এক্ষণ চারি মিলিয়ন বা চল্লিশ লক্ষেরও উপর উঠিয়াছে।

৭। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। কোম্পানী তাঁহাদিগের বন্ধু-বান্ধবদিগকে এই কর্মের জন্ত মনোনীত করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দিতেন। কোন ভারতীয় লোক এই সিভিল সার্ভিসে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কি দেশীয়, কি ইউরোপীয়, সমস্ত বৃটিশ প্রকার জন্ত সিভিল সার্ভিসের দ্বার উন্মুক্ত এবং ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিসের জন্ত পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই পরীক্ষায় যাহারা সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকেই, জাতিকুল ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বিচার না করিয়া, সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করা যাইবে, এই হইতেই এই রীতি চলিতে থাকে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে এক্ষণ ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মুসলমান ও শূদ্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই আছে।

(৮)

চতুর্দশ গবর্ণর জেনেরেল

লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৬—১৮৫৮।

১। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ভারতবর্ষে

আগমন করেন । লর্ড ক্যানিং আজ যে বৃটিশ ভারতের গবর্নর জেনেরেল হইয়া আসিলেন, ঠিক একশত বৎসর পূর্বে, লর্ড ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতে সেই বৃটিশ রাজত্বের প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেন । লর্ড ক্যানিং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন । সর্বত্র শান্তি বিরাজমান । কোন দিকে কোনরূপ বিপদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না । সহসা বঙ্গদেশে এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা উথিত হইল । এই ঝটিকার নাম বাঙ্গালার মিউটিনী বা সিপাহী বিদ্রোহ ।

২। বঙ্গদেশ বৃটিশ শাসনে, চিরদিনই প্রশান্ত প্রদেশ রূপে গণ্য ছিল । সুতরাং অতি অল্পসংখ্যক ইংরেজ সেনা বঙ্গদেশে রাখা হইত । পঞ্জাব অধিকারকালে ইংরেজ সেনা বা গোরা পণ্টনদিগের অধিকাংশই ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঠাইয়া দেওয়া হয় । বঙ্গে বহুসংখ্যক দেশীয় সিপাহী থাকিয়া যায় ।

৩। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সুলভ ডাক মাণ্ডল, স্কুল ও হাঁসপাতাল বা চিকিৎসালয়ের মূল্য ও উপকারিতা এই কালের লোক আমরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ । কিন্তু যখন ভারতে এই সকলের প্রথম প্রবর্তন ও প্রচলন হয়, দেশীয় লোকের অনেকেই তখন ইহাতে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়ে । চক্ষে দেখা দূরে থাকুক, তাহারা পূর্বে ইহার নামগন্ধও শুনে নাই । তাহারা ভাবে যে সম্ভবতঃ এই সকলের দ্বারা ইংরেজেরা



[লর্ড ক্যানিং]

তাহাদিগের কোনরূপ গুরুতর অনিষ্ট সাধনের কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিত সুদীর্ঘ লোহ-নির্মিত রেল ও টেলিগ্রাফের তার পৃথিবীর বন্ধন-শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঘোড়ার টানিয়া লয় না, অথচ রেলওয়ে এঞ্জিন বা কল, সুদীর্ঘ গাড়ীর পংক্তি বায়ুবেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া অনেকে ভাবিত, এ সকল ভূতের কার্য বা ভৌতিক বাপার। দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যে, সংবাদ বিদ্যুৎ চমকের দ্বারা, শত শত মাইলের পথ চলিয়া যাইতেছে, ইহা যখন তাহারা দেখিতে পাইত, তখন তাহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিত। অনেকে মনে করিত, ইংরেজেরা স্কুল ও হাঁসপাতাল খুলিয়া তাহাদিগের জাতিনাশের উদ্যোগ করিতেছেন,—ইংরেজী শিখিলে তাহারা আর হিন্দু থাকিতে পারিবে না।

৪। দুই লোকের দ্বারা এই সকল অর্থশূন্য অসার কথা বাঙ্গালা ও অযোধ্যার সিপাহীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। যে দুর্বৃত্তেরা ইহা প্রচার করিল, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদিগের মনে এই সকল কথায় বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস ছিল না। এই সময়েই সিপাহীদিগের হাতে নূতন ধরণের বন্দুক প্রদান করা হয়। এই বন্দুকে মোম বা চরবির কার্তুজ বা টোটা ব্যবহৃত হইত। কোন কোন লোকে সিপাহীদিগকে বুঝাইল যে, চরবি সংযুক্ত কার্তুজ বা টোটা ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাহাদিগের জাতিনাশ করা। সিপাহীরা বলিয়া বসিল, এ টোটা তাহারা ব্যবহার করিবে না। এই বলিয়া তাহারা উপরিস্থ সৈনিক কর্মচারীদিগের আজ্ঞা পালনে অসম্মত হইল। সিপাহীরা মনে করিল যে, আওরঙ্গজেব ও টিপু যেমন অনেক হিন্দুকে মুসলমান হইবার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়াছিলেন, ইংরেজরাও তেমনি তাহাদিগকে কোশলে খুষ্টান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তালুকদার ছিলেন। দক্ষিণভারতের নায়িক বা পলিগারদিগের গ্রাম এই সকল তালুকদারেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গের অধিস্বামী। তাঁহারা নায়িকদিগের গ্রাম, পার্শ্ববর্তী গ্রাম শাসন ও ঐ সকল গ্রামের কর আদায় করিতেন; বড় বেসী পীড়াপীড়ি হইলে, দেশের রাজাকে কর দিতেন, নচেৎ কিছুই দিতেন না। ইংরেজ যখন এই রাজ্য অধিকার করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের সমস্ত প্রভু হারাইলেন। প্রভু হারা হইয়া সকলেই মনে মনে বড় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সিপাহীদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

৬। এই ঘটনার এক কি দুই বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ পেশোয়া বাজিরাওর মৃত্যু হয়। মহারাষ্ট্রা সমরের অবসানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের জন্য বার্ষিক আট লক্ষ টাকা করিয়া পেনশন বা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কাণপুর হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী বিঠুরে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি এক বালককে পোষ্য রাখিয়াছিলেন। এই বালকের নাম নানাসাহেব। বাজিরাও নানার জন্য পাঁচকোটি টাকা নগদ রাখিয়া যান। কিন্তু নানাসাহেব ইহাতে পরিতৃপ্ত না রহিয়া, বাজিরাও যে পেনশন পাইতেন, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট হইতে সেই পেনশন পাইবার জন্য ইচ্ছুক হন। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এই পেনশনে তাঁহার কোন সত্ত্ব বা দাবি ছিল না বলিয়া তাঁহাকে ইহা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনিও ইংরেজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী হইবার নিমিত্ত উৎসাহ দিয়া পত্র লিখেন।

৭। প্রথমতঃ একটি কি দুইটি রেজিমেন্ট উপরিস্থের অবাধ্য হইয়া উঠিলে, ঐ সকল রেজিমেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া সিপাহীদিগকে বিদার

যাছে, তাহা অল্প সিপাহীদিগকে বলিতে থাকে । দিল্লীর নিকটস্থ মিরাতে সিপাহীদিগের এক বৃহৎ দল ছিল ; সেইখানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিউটিনী বা সিপাহীবিদ্রোহ সর্ব্ব অবয়বে ফুটিয়া পড়ে । সিপাহীরা তাহাদিগের উপরিস্থ সেনানীদিগকে গুলি করিয়া, পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু, যে কোন ইউরোপীয়কে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিল । তাহারা একবারে ক্ষিপ্তের স্থায় হইয়া উঠিল । তাহারা লোকের ঘরে আগুন দিল, এবং জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল ।

৮। দিল্লীতে পুরাতন মোগল সম্রাট্ শাহ আলমের বংশধরেরা বাস করিতেছিলেন । ইংরেজ তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন । তখনকার মোগল বংশধরের নাম বাহাদুর শাহ । বাহাদুর শাহ বৃদ্ধ । ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে প্রচুর বৃত্তি বা পেনশন দিতেছিলেন । তিনি ভাবিলেন, তিনি হস্তত এই সূত্রে সেই প্রসিদ্ধ বাদশাহদিগের স্থায় একজন প্রবল-পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট হইতে পারিবেন । এই ছুরাশার বশবর্তী হইয়া, তিনিও আপনার পুত্রদিগকে লইয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দান এবং আপনাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন । ইংরেজ রমণী ও শিশু, সংখ্যায় পঞ্চাশটি সিপাহীদিগের আক্রমণ হইতে আত্মজীবন রক্ষার্থ পলায়ন করিয়া তাঁহার প্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছিল । তাঁহার আত্মক্রমে তাঁহাদিগের সকলকেই হত্যা করা হইল ।

৯। মিরাতে যাহা ঘটিল, অত্যন্ত অনেক স্থানেই অবিকল তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল । ইংরেজ সেনানীরা, যে সকল সিপাহীকে তাঁহাদিগের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া প্রাণপণে অসংখ্য বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছেন, এবং যাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিখন্ত বলিয়া

যে সকল সিপাহীকে তাঁহারা সরলপ্রাণে বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত, তাহাদিগেরই অনেকে আজি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া, আপন আপন ইংরেজ সেনানায়ককে হত্যা এবং যে কোন ইউরোপীয়ের দেখা পাইল, তাহাকেই বধ করিয়া দিল্লী অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

১০। কাণপুরে নানাসাহেব বৃহৎ একদল বিদ্রোহীর নায়ক বা দলপতি হইয়া বসিলেন। কাণপুর নগরে কতিপয় ইংরেজ পুরুষ অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও শিশু সহ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সেখানে নিরাপদে থাকিবেন, এই বিশ্বাসেই তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে পাঠান হইয়াছিল। পুরুষেরা বহুসংখ্যক সিপাহীর বিরুদ্ধে উনিশ দিন পর্যন্ত বিশেষ সাহস সহকারে যুদ্ধ করেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা বিদ্রোহীদিগের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চড়িয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। উনিশ দিন যুদ্ধের পরে নানাসাহেব এই প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা যদি আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে পহঁচাইয়া দিবেন। তাঁহারা নিরোধের জ্বায়ে এই প্রতিশ্রুতিতে সন্মত হইয়া বহির্গত হইলেন ; এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা নৌকায় উঠিলেই, নানাসাহেবের সেনারা তট হইতে নৌকায় উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। সিপাহীরা এইরূপে তাঁহাদিগের অনেককে হত্যা করিয়া নৌকায় আগুন ধরাইয়া দিল। তাহারা পুরুষদিগকে গুলি করিয়া মারিল; এবং অসহায়্য অবলা ও নিরাশ্রয় শিশুদিগকে ধরিয়া নিম্ন প্রথমতঃ কারাগারে রাখিয়া দিল। অবশেষে নানাসাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া, মৃতদেহগুলি একটা কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। কাণপুরের হত্যা ভারতীয় ইতিহাসের একটা নিষ্ঠুরতম ঘটনা।

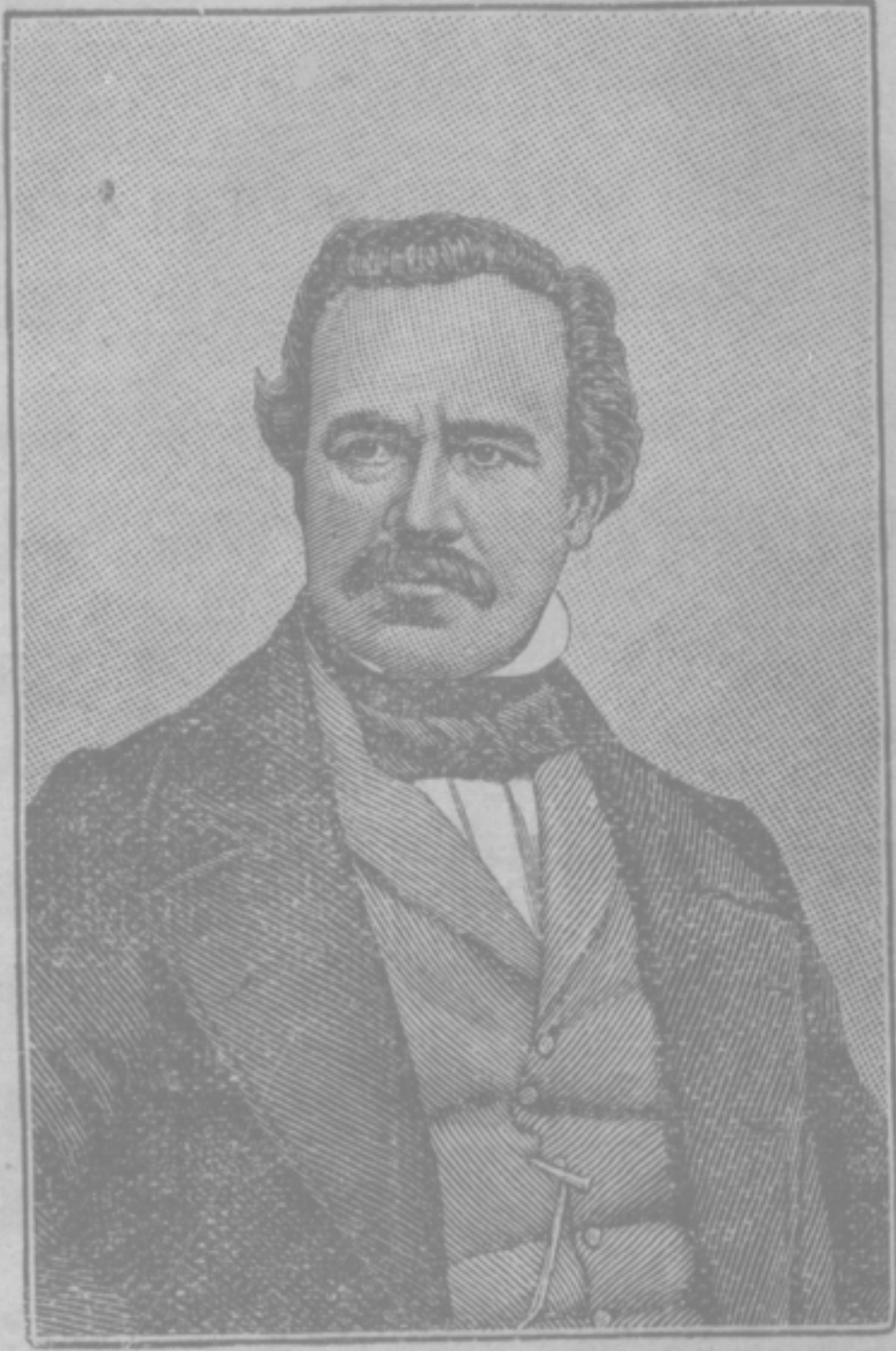
ছিল। ইত্যবসরে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও পঞ্জাব হইতে দলে দলে ইংরেজ



সৈন্ত দিল্লী অভিমুখে প্রেরিত হইল। এই ঘটনার মাত্র আট বৎসর পূর্বে শিখেরা ইংরেজ কর্তৃক বিজিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যোই ইংরেজদিগের শাসন-পদ্ধতি কিরূপ সুন্দর তাহারা উহার পরিচয় পাইয়াছে। কারণ, তাহারা ইংরেজ শাসনের অধীন হইয়া, তাহাদিগের স্বদেশীয়দিগের শাসন-সময় অপেক্ষা অনেক বেশী সুখে আছে। শিখেরা ও গুর্খা সৈন্তেরা ইংরেজের প্রতি বিশ্বস্ত রহিল। বড় অধিক দিনের

[জেনেরেল হেভিলক্] কথা নহে, শিখেরা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব ও সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণ ইংরেজের সপক্ষে সেইরূপে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যিনি পরে স্ত্র হেনরী নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন, সেই জেনেরেল হেভিলক্ নানা সাহেবকে পরাস্ত করিলেন। নানা সাহেব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, অরণ্যে লুকায়িত হইলেন। তিনি কোথায় পলায়ন করিলেন, ফিরিয়া আর তাঁহার কোনই সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জেনেরেল নেইল আসিয়া জেনেরেল হেভিলকের সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহারা কাণপুর অধিকার করিয়া লক্ষ্মী উদ্ধারার্থ চলিলেন। স্ত্র হেনরী লরেন্স অনেক মাস অবধি বিশেষ সাহসের সহিত ৫০০০০ বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মী রক্ষা করিতেছিলেন। জেনেরেল উইলসন্ ছয় দিন ব্যাপী কঠোর যুদ্ধের পর দিল্লী আক্রমণ দ্বারা অধিকার করিয়া লইলেন। সর্বপ্রধান সেনাপতি জেম্‌স্

আর্ডেট্রামের সহিত আরও বহু ইংরেজ সেনা আসিয়া পঁহুঁচিল । লক্ষ্মী ও কাণপুর অধিকৃত ও অযোধ্যা হইতে বিদ্রোহীর দল সম্পূর্ণ-রূপে তাড়িত হইল । দিল্লীর যুদ্ধে জেনেরেল নিকলসন্ নিহত হইলেন । ইহার অল্প কাল পরেই জেনেরেল হেভিলকের মৃত্যু হইল ।



১২ । মাদ্রাজ হইতে জেনেরেল হুইটলকের অধীন একদল এবং শ্রু হাগ-রোজের অধীন বোম্বাইর সৈন্যদল ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের দিকে অভিযান করিয়া পথে সিন্ধিয়া ও

[শ্রু জেমস্, আর্ডেট্রাম্]

হোল্কারের সৈন্যদল পরাস্ত করিল এবং দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিতে করিতে চলিল । এই সকল মহারাট্টা রাজারা স্বয়ং ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হন নাই । তাঁহারা ইংরেজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় সৈন্যদিগকে থামাইয়া রাখিতে পারেন নাই । তাঁহারা দলে দলে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত যোগদান করিয়া মহারাট্টা সর্দার তান্তিয়া টপির নায়কতায় চালিত হইয়াছিল । কিন্তু এই সিপাহীর দল প্রত্যেক স্থানেই পরাজিত হয় । অবশেষে, তাহাদিগের দলপতি তান্তিয়া-টপি ধৃত হইলে তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল ।

১৩ । দিল্লীর পতন হইলে পর, সিপাহীরা চারিদিকে পলাইয়া যায় এবং ১৮৫৮ সনের অবসানে পুনরায় সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

(৮৩)

ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন ভারত।

প্রথম পঞ্চ ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি।

১৮৫৮—১৮৭৭।

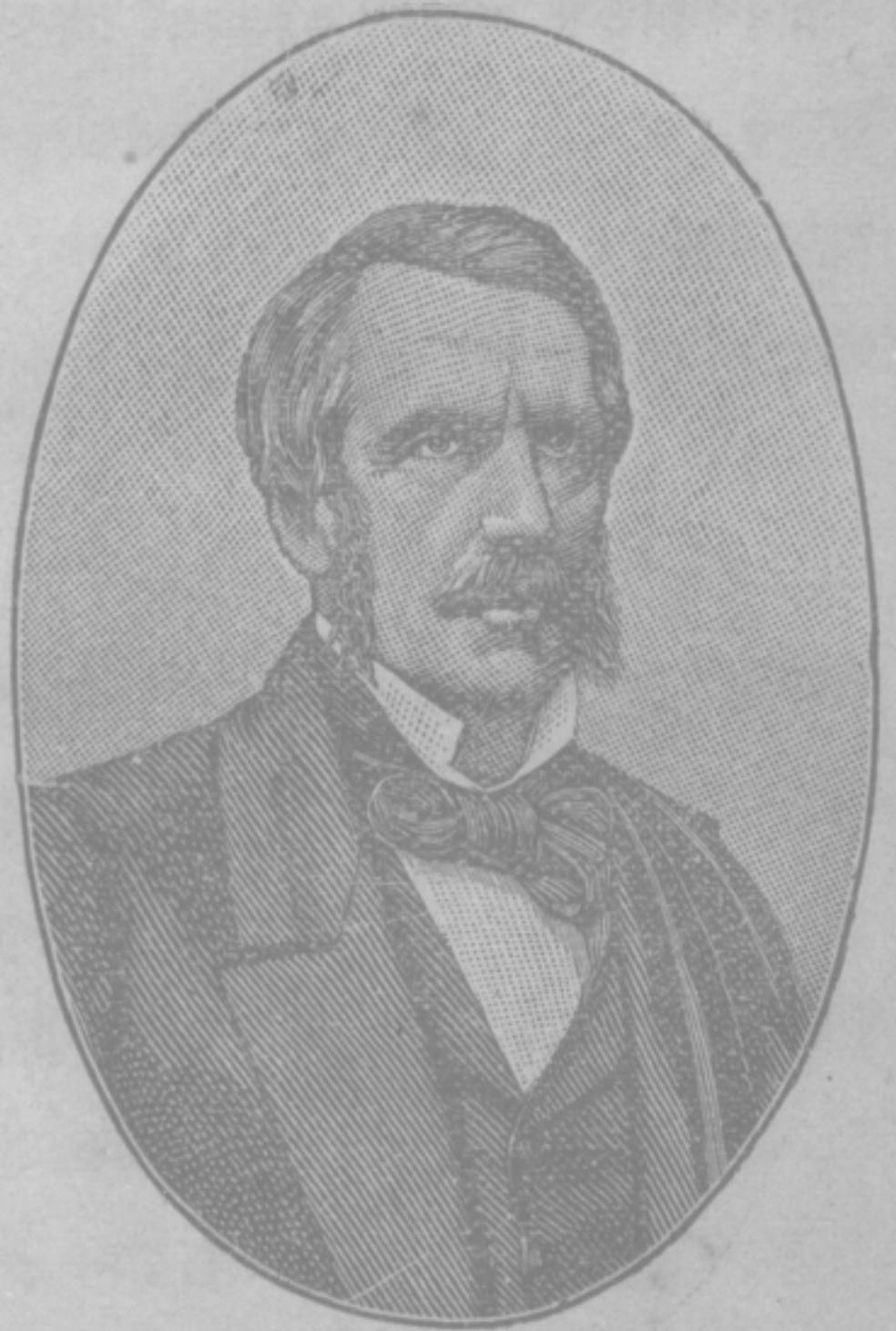
১। বঙ্গীয় মিউটিনী বা সিপাহী বিদ্রোহের পরে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের মহারানী এবং গবর্ণর জেনারেল ভারতের ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি হইলেন।

২। প্রথম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত শাসন করেন। লর্ড ডালহৌসীর আরম্ভ কাৰ্য্য তাঁহা কর্তৃক অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানে নূতন নূতন রাস্তা নিৰ্ম্মিত, রেলওয়ে গঠিত, ও খাল খনিত হয়; নানাস্থানে টেলিগ্রাফের তার বহিসে। বহুসংখ্যক নূতন স্কুল ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। এই সময়ে, মহারানী সমগ্র ভারতে এই ঘোষণা প্রচার করেন যে, কি ভারতবাসী, কি ইংরেজ, কি মুসলমান, কি হিন্দু, প্রত্যেকেই রাজার নিকট সমান চক্ষে পরিলক্ষিত ও তুল্য ব্যবহার প্রাপ্ত হইবে। দেশীয় কোন লোকের ধর্ম বা জাতির উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। সকলের তুল্য দাবি ও সমান অধিকার থাকিবে এবং সকলেরই বিচার-কাৰ্য্য এক আইন বা একই বিধিব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইবে। ভারতীয় রাজাদিগের কোন পুত্র সন্তান না থাকিলে, তাঁহারা পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর সেই পোষ্য পুত্র উত্তরাধিকারিকরূপে তাঁহাদিগের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।

সহিত ভাল বাসিত, তিনিও তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক স্নেহের ভাব পোষণ করিতেন। তিনি যেমন ছিলেন ইংলণ্ডের মহাপ্রতাপাবিত গর্ভিত লর্ডের অধীশ্বরী, তেমনি ছিলেন কান্দালের কান্দাল দীন দরিদ্র ভারতীয় কুলির মাতৃস্থানীয়া রাজ্যেশ্বরী। তিনি সর্বদা তাঁহার প্রজার সুখদুঃখ ও ভালমন্দের সংবাদ লইতেন;—কিসে তাঁহার প্রজা সুখে শান্তিতে থাকিবে, প্রতিনিয়ত তাহা চিন্তা করিতেন। বলিতে কি, অত্ৰ কোন রাজা বা রাণী কখনও অমন করিয়া প্রজার কথা ভাবেন নাই।

৫। দ্বিতীয় ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন্‌ তিনি যে বৎসর ভারতে আগমন করেন, তৎপর বৎসর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বৎসরই আফ্‌গানিস্থানের শাসনকর্তা দোস্ত মহম্মদ পরলোকগত হন। দোস্ত মহম্মদ ইংরেজের সহকারী মিত্র ছিলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময়, ইংরেজের বিশ্বস্ত সূহদের ঝায় কার্য্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র সিয়ার আলি সিংহাসন অধিকার করেন। সিয়ার আলির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফজল খাঁই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। সিয়ার আলি তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।



[লর্ড লরেন্স]

৬। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্মর্ জন্ লরেন্সকে ভারতের ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি করা হয়। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সেখানে বিশেষ কৃতিত্ব ও দক্ষতার সহিত আপন

কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। শ্রু জন্ লরেন্স শেষে লর্ড লরেন্স হন। নেপালের পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই রাজ্যের নাম ভূটান। ভূটানের রাজা বৃটিশ ভারতের কতিপয় লোককে বল-পূর্বক ধরিয়া লইয়া ক্রীতদাসরূপে রাখিয়াছিলেন। এই ক্ষত্রে শ্রু জন্ লরেন্সের সময়ে ভূটানের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হয়। যুদ্ধে ভূটানের রাজা পরাভূত হন এবং ক্রীতদাসগণ মুক্তিলাভ করিয়া আইসে। দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজল খাঁ তাঁহার পুত্র আবদুল রহমান কর্তৃক কারামুক্ত ও আফগানিস্থানের সিংহাসনে স্থাপিত হন। সিয়ার আলি গলাইয়া যান; কিন্তু কিছুকাল পরে, আফজল খাঁর মৃত্যু হয় এবং সিয়ার আলি ফিরিয়া আসিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

শ্রু জন্ লরেন্সের সময়ে উড়িষ্যা ও পশ্চিম ভারতে ক্রমে দুটা ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেন্ট প্রভূত অর্থ

ব্যয় করিয়া বহু সহস্র লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

৭। চতুর্থ ভাইসরয় লর্ড মেও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। মাত্র তিন বৎসর ভারতে অবস্থানের পরই তিনি নিহত হন। তিনি আগুমান দ্বীপ পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। সেই স্থানের একটা কয়েদী তাঁহাকে হত্যা করে। লর্ড মেও পাবলিক ওয়ার্কের উন্নতিকল্পে যথাসক্তি যত্ন করিয়াছিলেন। কৃষি-বিভাগের তিনিই সৃষ্টিকর্তা।



[লর্ড মেও]

তাহার ব্যবস্থানুসারেই অগ্রাণু দেশের কৃষকেরা কি ভাবে কি করিতেছে, তাহারা কি কি ফসল উৎপাদন ও কিরূপ শস্ত্র বপন করে, তাহাদিগের হল বা লাঙ্গল কিরূপ, বাগানে তাহারা কি কি ফল জন্মায়, চাষের ভূমিতে কিরূপ সার দেয়, এবং কিরূপে চাষ করে, এই কৃষিবিভাগের কর্মচারীদিগকে তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইত । তাহারা এই অনুসন্ধান অনান্যাসে করিতে পারিতেন ; কারণ, ইংরেজগণ সকল দেশেই যাতায়াত করিয়া থাকেন ; সুতরাং, পৃথিবীর কোথায় কি হয়, তাহারা অক্লেশে তাহা জানিয়া লইতে সমর্থ । ভারতবাসী অল্পকাল যাবৎ দেশান্তরে গমনাগমন আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পূর্বে তাহারা কখনও ভারত ছাড়িয়া অগ্রাণু গমন করিতেন না । এই হেতুই ইংরেজ কর্মচারী কর্তৃক এই কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয় । তাহারা দেশান্তরের কৃষিতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, দেশীয় শ্রেষ্ঠ কন্মের কৃষাগদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন এবং ফসল উৎপাদনের সর্বোত্তম প্রণালী কি, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া দেন ।

৮ । পঞ্চম ভাইসরয় বা রাজ-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক । তাহার সময়ে বঙ্গদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হয় । কিন্তু তিনি যাহাদিগের ফসল মারা গিয়াছিল, সেই সকল দরিদ্র লোকদিগকে কর্ম, বেতন ও খাদ্য-সামগ্রী দান



[মহারানী ভিক্টোরিয়া]

করিয়া দুর্ভিক্ষের হাতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার দূরদর্শিনী নীতি-

বলে আপতিত-প্রায় দুর্ভিক্ষ দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল । মহারাণী ভিক্টো-
রিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস্ বর্তমান রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত পরিদর্শন করেন । ভারতের সমস্ত রাজত্ববর্গ ও
সর্দারগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার-কামনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ।
সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া উৎসব ও আনন্দের মহান আড়ম্বর চলিয়াছিল ।

(৮৪)

সম্রাজীর অধীন ভারত ।

পরবর্তী সপ্ত রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় ।

১৮৭৭—১৯০৬ ।

১। ষষ্ঠ ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন দিল্লীতে এক বৃহৎ
দরবারের অনুষ্ঠান করেন । এই দরবারে ১৮৭৭ সনে মহারাণী ভিক্টো-



[লর্ড লিটন]

রিয়া ভারত সম্রাজী বা ভারত
রাজরাজেশ্বরীরূপে বিধোষিত
হন । এই সর্বপ্রথম ভারতীয়
রাজত্ববর্গ ও সর্দারগণ, তাঁহা-
দিগের পুরাতন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও
বাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া গিয়া, রাজ-
রাজেশ্বরীর চির অনুরত ভক্ত
প্রজার হ্রাস দরবার স্থানে আসন
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ।

২। এই দরবারের অল্পকাল
পরেই দক্ষিণভারত ও দাক্ষি-
ণাত্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত
হয় । ক্রমে দুই বৎসর যথাসময়ে

বৃষ্টি হয় না। এই দুর্ভিক্ষে পাঁচ মিলিয়ন অথবা পঞ্চাশ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। অনাহারক্লিষ্ট বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্টে যথাসক্তি যত্ন করিয়াছিলেন।... ভারতের যে অংশে দুর্ভিক্ষ ছিল, সেই স্থানে অত্যাণ্ড দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ শস্ত সমুদ্র ও রেল-পথে আনীত এবং সর্বসাধারণকে ভোজ্য যোগাইবার জন্য দশ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই উপায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ-রক্ষা করা হয়। পুনরায় ভারতের কোন অংশে এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে, যাহাতে ঐ স্থানে সহজে শস্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই দুর্ভিক্ষের পর আরও অনেক রেল-পথ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

৩। এই সময়ে গবর্ণর জেনেরল, একটি ইংরেজসচিবকে বন্ধুভাবে আফ্গানিস্থানে রাখিবার জন্য আমীর সিম্মার আলির নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সিম্মার আলি ভাইসরয়ের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া রুষরাজ্যদূতকে কাবুলে স্থান দান করেন। এই কার্য্য দ্বারা তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে, তিনিই ইংরেজের বিপক্ষ এবং রুষ যদি ভারত আক্রমণ করেন, তিনি তাঁহাদিগেরই সহায় হইবেন। এই কারণে, আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা হয়। ইংরেজ সেনা আফ্গানিস্থান আক্রমণ করে। সিম্মার আলি পলায়ন করেন। তাঁহার পরিবর্তে তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁকে আমীর করা হয়। তিনি ইংরেজের সহিত সন্ধি করেন। কিন্তু ইংরেজ সচিব শ্রী আই কেভেক্‌নারি আমীরের সহিত সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্যে কাবুলে প্রেরিত হইলে, আমীরের আফ্গান সৈন্ত-গণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তীর্ণ হয়, এবং রক্ষিবর্গসহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। ইহার পরে, ইয়াকুব খাঁ কাবুলের সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ভারতে প্রেরিত হন।

৪। মণ্ডম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ। লর্ড রিপণ দ্বিতীয়

আফ্গান সমর পরিসমাপ্ত করেন। ইয়াকুবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা



[লর্ড রিপণ]

আজব খাঁ সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বর্তমান লর্ড রবার্টস্ তখন মাত্র জেনেরেল ছিলেন। জেনেরেল রবার্টস্ কাবুল হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া কান্দাহারে উপস্থিত হন এবং আজব খাঁকে পরাজয় করিয়া তাড়াইয়া দেন। আফ-জল খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমানই সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন। অতঃপর

তঁাহাকেই আফ্গানিস্থানের আমীর করা হইল। তিনি ইংরে-

জের মিত্ররূপে স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। আবদুর রহমান দৃঢ় হস্তে ও অতি সুন্দররূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তঁাহার মৃত্যু হয় এবং তঁাহার পুত্র হবিবুল্লা আফ্গান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৫। লর্ড রিপণ দেশীয়দিগের প্রতি একান্ত সদয় ও অনুকূল ছিলেন। ভারতবাসী তঁাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত। তিনি মিউনিসিপাল ও নাগরিক নূতন বিধি প্রণয়ন করেন। এই বিধান অনুসারে, বহু বড় বড় নগর আপন আপন নাগরিক কার্য্য-ব্যবস্থার জন্য স্বয়ং লোক-নির্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বৃহৎ বৃহৎ নগর আপনি আপনার শাসনকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করে। তিনি দেশীয় লোকের স্থাপিত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট হইতে আর্থিক সাহায্য দানে, উহার ব্যয়ের একাংশ বহন করিবার ব্যবস্থা করেন। [ইহার পরে, নানা

স্থানে বহুসংখ্যক নূতন নূতন স্কুল বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড রিপণ ভারতে যে সকল পণ্যদ্রব্য আনীত হয়, তাহার প্রায় সর্বপ্রকার মাণ্ডল রহিত করিয়া দেন। ইহাতে ঐ সকল দ্রব্য অধিকতর সুলভ হইয়া উঠে ; এবং বাণিজ্যের বিস্তার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়।

৬। অষ্টম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফ্রিংয়ের ভারতে আগমনের অল্পকাল পরেই বর্মার রাজা থিব ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি বড়ই বিশৃঙ্খল-ভাবে তাঁহার রাজ্যশাসন করিতে-ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একদল সেনা প্রেরিত হয়। থিব পলায়ন করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উচ্চ বর্ম্মা অবশিষ্ট ব্ৰিটিশ বর্ম্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। থিব পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া, ভারতে বাস করিবার নিমিত্ত আনীত হন। বর্ম্মা-দেশীয় বহুসংখ্যক ডাকাত দমিত এবং উচ্চবর্ম্মা ও নিম্নবর্ম্মা এবং



[লর্ড ডফ্রিং]

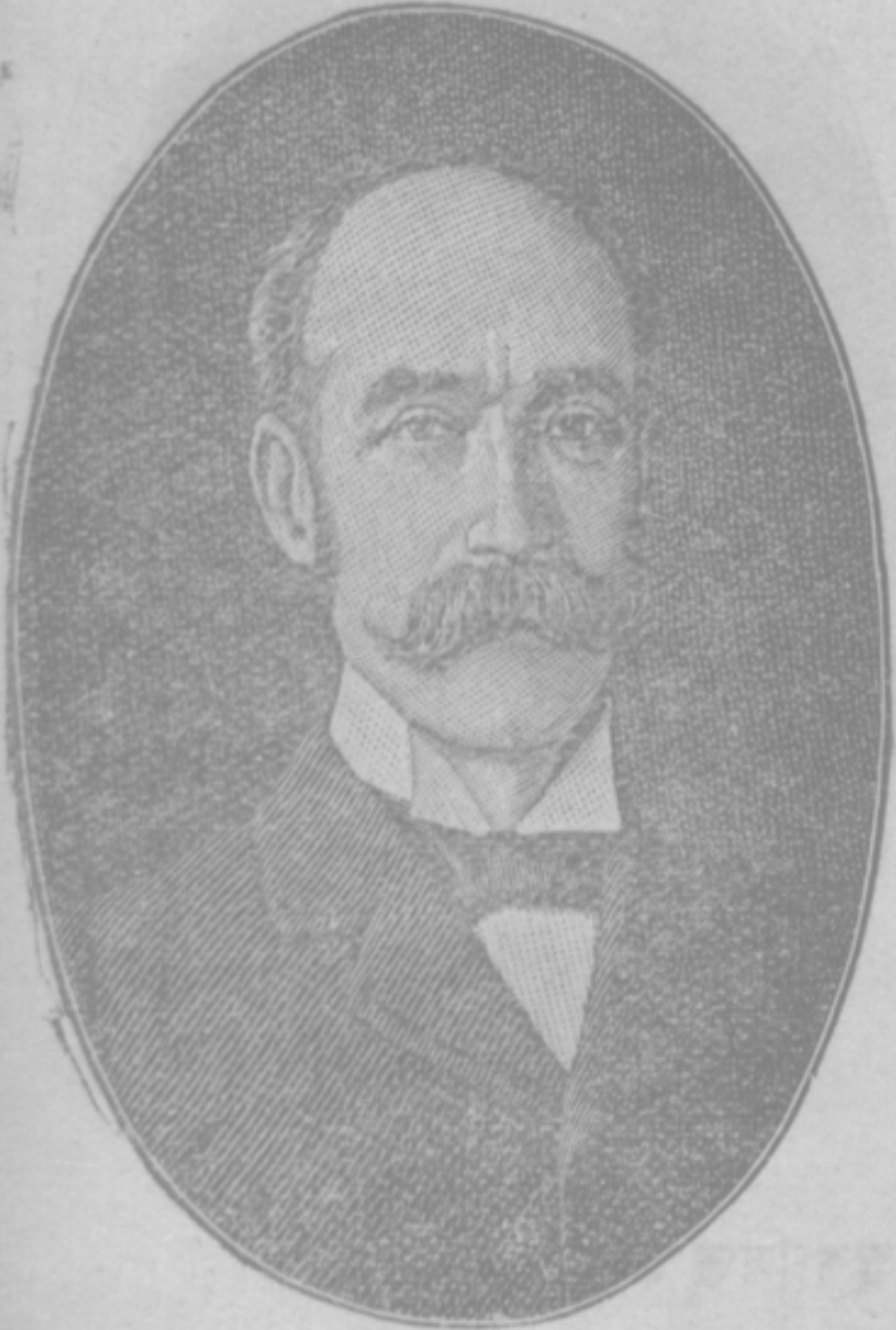
ভারতের অবশিষ্ট রাজ্য সমূহের ত্রায় শাসিত হইতে থাকে।

৭। ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধির পত্নী লেডী ডফ্রিংয়ের যত্নে ও সাহায্যে ভারতীয় মহিলাদিগের জন্য ইংলণ্ড হইতে এদেশে লেডী বা স্ত্রীলোক ডাক্তার আনীত হন। এই উদ্দেশ্যে ভারত ও ইংলণ্ড উভয় স্থানেই বহু টাকা সংগৃহীত ও লেডী ডফ্রিং ফণ্ড নামে একটি তহবিলের সৃষ্টি হয়।

৮। ইহার পরবর্ত্তী দুটি ভাইসরয়ের শাসনকালে, ভারতের প্রাক্ত-

বাসী জাতি সমূহের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল। এই সকল জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিগ্বর্তী পর্বত সমূহে বাস করে। প্রাচীন কালে তাহারা সমতলবাসীদিগের ধন-রত্ন লুণ্ঠনের জন্ত তাহাদিগের পর্বত-গৃহ হইতে অবতরণ করিত। এখনও তাহারা তাহাই করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখন তাহাদিগের গতিরোধের জন্ত সৈন্য প্রস্তুত আছে।

৯। শেষ তিন জন ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধির শাসন-সময়ে



সহরের লোক যেন সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে, বড় বড় নগরের লোকদিগকে পরিস্কৃত সুপেয় পানীয় জল প্রদান, রাজপথ পরিমার্জন এবং নগরের ধূলি, আবর্জনা ও মলাসমূহ নগরের বাহিরে দূরে অপসারণ ইত্যাদি কার্যে বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। পূর্বে বসন্তের আক্রমণে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। বসন্তের আক্রমণ হইতে লোক-রক্ষার জন্ত, টীকা-

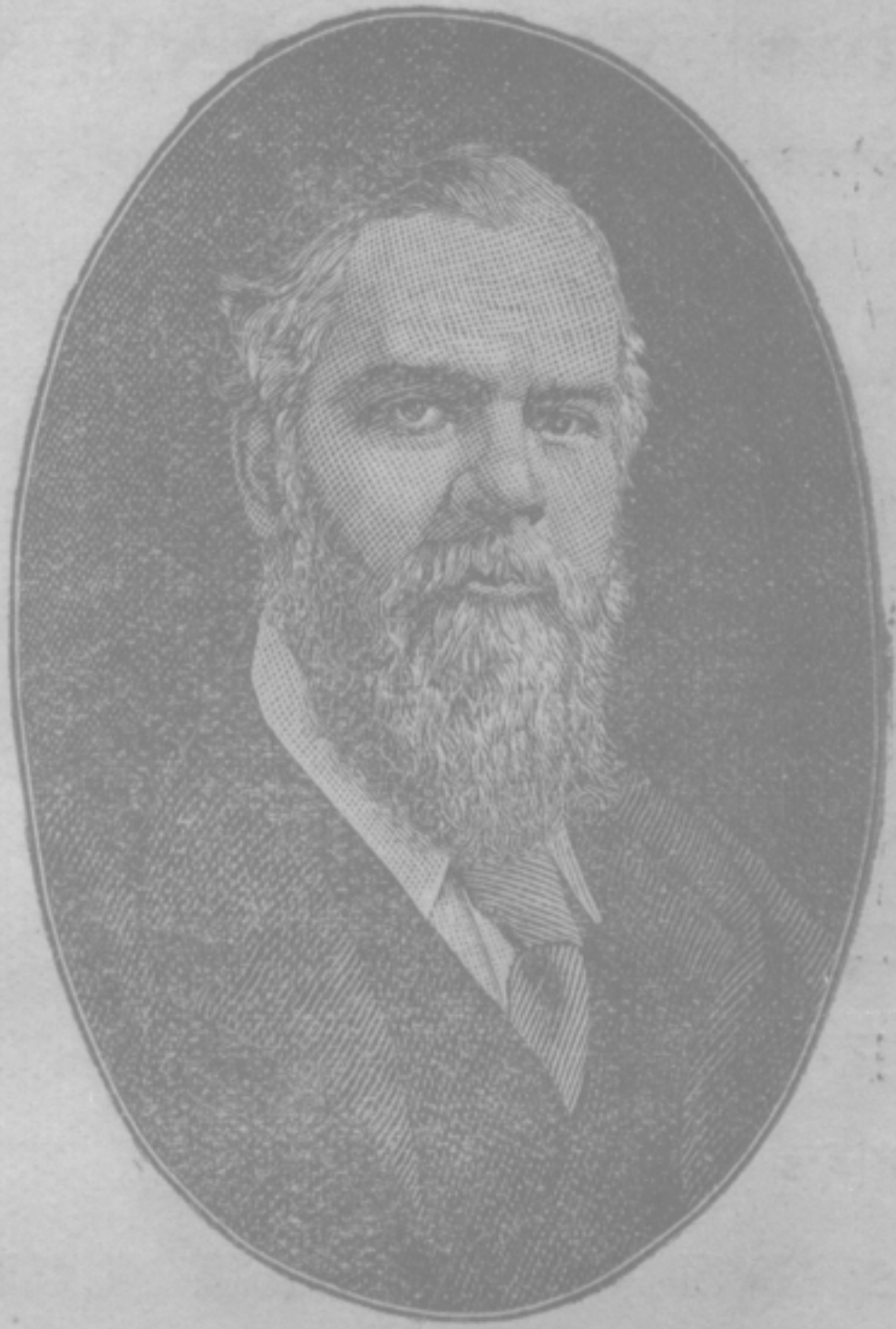
[লর্ড ল্যান্ডাউন]

দার বা ভেক্সিনেটারগণ টীকা

দেওয়ার জন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জরের আক্রমণ প্রতিষেধ ও জ্বর আরোগ্য করার ঔষধ কুইনাইন, সর্বত্র স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার আকর বহু জলাভূমি শুকাইয়া ফেলান হইয়াছে। এদেশে অল্পদিন হইল, প্লেগ নামক এক ভয়ানক সাংঘাতিক পীড়া দেখা দিয়াছে। প্লেগ কর্তৃক আক্রান্ত দরিদ্র লোকদিগের

চিকিৎসার জন্য বহু হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে । ইংলণ্ড হইতে ইংরেজ
 দাক্তরী বা শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া, প্লেগাক্রান্ত দিগের শুশ্রূষায় সাহায্য
 করিতেছেন । বহুসংখ্যক ডাক্তার তাহাদিগের চিকিৎসার জন্য প্রেরিত
 হইতেছেন । তাহারা রোগীদিগের চিকিৎসা করেন, এবং যাহারা
 সুস্থ আছে, তাহাদিগকে, কি করিলে প্লেগের হাতে অব্যাহতি পাওয়া
 যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন ।

১০ । এখন আশা করা
 যাইতে পারে যে, অতঃপর দীর্ঘ-
 কাল, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া
 শান্তি বিরাজমান থাকিবে এবং
 ভারতবাসী পূর্বে কখন যদি
 সুখস্বচ্ছন্দে থাকিয়া থাকে, এখন
 তদপেক্ষা অধিকতর সুখস্বচ্ছন্দে
 থাকিতে পারিবে । ইংলণ্ডে-
 শ্বরের সাহসী বীর সেনাগণ-
 কর্তৃক পরিরক্ষিত রহিয়া ভারত
 এক্ষণ নিরাপদ, উহার শত্রু ভয়
 সুদূরগত ।



১১ । আমরা দেখিয়াছি যে,

[লর্ড এলগিন]

অতীত কালে, শীত প্রধান উত্তর দেশ হইতে সময় সময় দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ
 জাতিনিচয় ভীমবেগে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে । ভারতে অধিষ্ঠিত
 হইয়া, তাহারা হিন্দুস্থানের উচ্চপ্রান্তরে বাস নিবন্ধন, কেমন করিয়া
 অচিরকাল মধ্যেই হীনবীৰ্য্য, হতোৎসাহ ও হীনসাহস হইয়া পড়িয়াছে
 এবং কালক্রমে সেই শীতপ্রধান উত্তর দেশ হইতে সমাগত অন্য জাতির
 সম্মুখে তাহারাও আবার তুণের তায় উড়িয়া গিয়াছে ।

১২। কিন্তু যে সকল দৃঢ়কার ইংরেজ সেনা এক্ষণ ভারতের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা দীর্ঘকাল এদেশে অবস্থান করে না। তাহারা ইংলণ্ডের শীতপ্রধান দেশে জন্মধারণ করে ও সেই খানেই প্রতিপালিত হইয়া ভারতে আইসে এবং কএক বৎসর এদেশে থাকিয়া আবার সেই ইংলণ্ডেই ফিরিয়া যায়। নূতন সৈন্তগণ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লয়। এই অবস্থায়, এদেশের ইংরেজ সেনা, এখন যেমন আছে, কোন কালে তাহা অপেক্ষা বলবীৰ্য্যে হীনতর হইয়া পড়িবে, সে আশঙ্কার কোনই কারণ দেখা যায় না।

১৩। এক্ষণকার জায়, ভারতবর্ষ পূর্বে আর কখনও এমন সম্মিলিত ভাবে, স্বায়ত্ত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত একচ্ছত্র রাজার অধীন হয় নাই। পুরাতন কালে ভারতে অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায় আপন আপন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজার শাসনে বাস করিত এবং সকলেই প্রতিনিয়ত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সেই পুরাতন শত্রুরাই এক্ষণে প্রগাঢ় বন্ধুরূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। আজি বীরপ্রাণ গুর্খা, তেজস্বী শিখ, দৃঢ়সঙ্কল্প মহারাট্টা, বিপুলবপু বলবান্ পাঠান,—হিন্দু ও মুসলমান সকলে একই পতাকার নীচে সম্মিলিত ও ইংরেজ সেনার সহিত পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইয়া, প্রয়োজন হইলে, তাহাদিগের দেশ ও রাজার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। ভারতীয় ইতিহাসে এই প্রথম সমগ্র ভারত এক শরীরবদ্ধ ও এক হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, এই অবস্থা চিরস্থায়ী হউক।

১৪। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। কোনকালে কোন রাজ্য এমন লোকবৎসলা দয়াবতী রানী কর্তৃক শাসিত হয় নাই। পৃথিবীর রাজ্যেশ্বরী রানীকুলে মহারানী ভিক্টোরিয়া শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার পরলোক গমনের পরে তৃতীয় জর্জ পল পিয়ার্স জর্জ ওয়েলস ইংলণ্ডের রাজা।

সপ্তম এডোয়ার্ড এবং ভারত সম্রাট এই উপাধি গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন।



[রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড, ভারত সম্রাট]

১৫। লর্ড কার্জন :৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, সাত

বৎসর কাল, ভারতের ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তিনি



[লর্ড কার্জন]

এদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রত্যেক বিভাগেরই সংস্কার-কার্যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে দেশ রক্ষার জন্ত বহু-সংখ্যক পুষ্করিণী ও কূপ খনন করাইয়া জল-সঞ্চয়ের উপায় করা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এদেশের রেলওয়ে ও পয়ঃপ্রণালী বা খাল-সমূহ অত্যধিক মাত্রায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। পুলিশের বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নানা প্রকারে সৈনিক বিভাগের বিবিধ উন্নতি বিহিত ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

বিগত কুড়ি বৎসরের মধ্যে, এই প্রথম টেক্স বা করভার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ লবণের শুল্ক পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। লর্ড কার্জন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবাসী জাতিসমূহের আক্রমণ ও তাহাদিগের কৃত উপদ্রব প্রশমনার্থ, তাহাদিগের স্বদেশের রক্ষাকার্যে তাহাদিগকেই সেনারূপে নিয়োগ করিয়া, তাহাদিগকে প্রীতির সূত্রে বন্ধন করিয়া গিয়াছেন। চিঠির ডাকমাণ্ডুল ও টেলিগ্রাফের মাণ্ডুল কমান হইয়াছে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও রাজ্যের প্রভূত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। লর্ড কার্জনের সময়ে ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধিভঙ্গ করা হেতু তিব্বতের সঙ্গে একটি অল্পকালস্থায়ী যুদ্ধ ঘটনা হয়। যুদ্ধে তিব্বতীয়েরা পরাজিত এবং তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

১৬। লর্ড কার্জন দেশের শাসন-কার্যের সুবিধা বিধানার্থ
ছটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিয়া
গিয়াছেন। সিন্ধুদের উত্তর-
পশ্চিমস্থ দেশটিকে উত্তর-পশ্চিম
প্রান্ত প্রদেশ এবং গঙ্গার
পূর্ববর্তী দেশের সহিত আসাম
রাজ্য সংযুক্ত করিয়া উহাকে
পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামক নূতন
প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছে।



১৭। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অত্র
এক ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি
ভারতে আগমন করিয়াছেন।
ইহার নাম লর্ড মিণ্টো।
এক শত বৎসর পূর্বে ১৮০৭
খৃষ্টাব্দে ইহার প্রপিতামহ লর্ড মিণ্টো ষষ্ঠ গবর্ণর জেনেরলরূপে ভারত-
শাসনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

[লর্ড মিণ্টো]

ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

(ক)

কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ।

১। এক্ষণে যে দেশকে আসাম বলা হয়, উহার পুরাতন নাম কামরূপ । কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস নাই । ব্রাহ্মণদিগের রচিত তন্ত্র ও পুরাণসমূহে, স্থানে স্থানে কামরূপ সম্বন্ধে প্রসঙ্গাধীন যে দুই একটি কথা বা উল্লেখ আছে, কামরূপের পুরাতন বিষয়ে উহাই আমাদিগের সম্বল । কামরূপ শব্দটি সম্ভবতঃ কোন পুরাতন নামের সংস্কৃত মূর্তি ; কিন্তু সে নামটি এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে ; অথবা কোন একটা প্রাচীন নামের অর্থ সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, কামরূপ শব্দের গঠন করা হইয়াছে, এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে । কামরূপ উত্তরভারতের পূর্বতম প্রান্তদেশে অবস্থিত । আর্যেরা পশ্চিম দিকের যে পার্বত্য পথে প্রথম পঞ্জাবে প্রবেশ করেন, কামরূপ তাহা হইতে প্রায় ২০০০ মাইল দূরবর্তী । উত্তরভারতের মত কামরূপ কোন কালেও কোন আৰ্য্য সম্প্রদায় কর্তৃক বিজিত এবং উপনিবেশিত হয় নাই । ব্রাহ্মণ যাজকগণ, সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী অতীত হইবার পরে, কামরূপের প্রান্তভাগে,—ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তটবর্তী দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ঐ অঞ্চলে যে সকল জাতির বসতি ছিল, তাহাদিগের সম্ভান সমুত্তির আকৃতি, প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বোধ হয়, তাহারা ভারতের উত্তরপূর্ব দিগ্বর্তী বঙ্গল দেশ হইতে সমাগত ।

২। ব্রাহ্মণদিগের কথিত পুরাতন কাহিনী এই যে, মহাভারতে

বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু পূর্বে, কৃষ্ণ, পরিণয় কামনায়, কুমারী কুম্ভিনীকে তাঁহার পিতা ভীষ্মকের গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনেন। ভীষ্মক কুন্দিলা রাজ্যের রাজা। সাদিয়ের পূর্ব দিকে কুন্দিলা নদীর তটে এখনও ভীষ্মক রাজ্যের নাম শ্রুত হইয়া থাকে। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ শ্রোণিতপুর আক্রমণ করেন। শ্রোণিতপুরের বর্তমান নাম তেজপুর। তখন শ্রোণিতপুরে প্রবল প্রতাপাবিত বাণরাজার রাজধানী ছিল। কথিত আছে, অনিরুদ্ধ শ্রোণিতপুর আক্রমণ করিয়া, পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণে, বাণরাজার কন্যা উষাকে লইয়া চলিয়া আইসেন। এই সকল আখ্যায়িকা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, হিন্দু রাজ্যবর্গ, বিশুদ্ধ আর্য্য বংশের সন্তানই হউন, অথবা পশ্চাতে হিন্দু নামে অভিহিত, আর্য্যভাবাপন্ন দ্রাবিড় বংশীয়ই হউন, তাঁহারা ভারতের আদিম নিবাসী সর্দারদিগের সহিত পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন। এই আদিম জাতিই বেদে, অশুর, দম্ব্য, দৈত্য, দানব এবং নিষাদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। বাণরাজা অপেক্ষাও অশুররাজ নরক অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। নরক তদ্দেশবাসী লোকের সন্তান। আখ্যায়িকায় তাঁহাকে স্বয়ং পৃথিবীর পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নরক কৃষ্ণের একজন সহযোগী সহায় স্বরূপ ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে কামরূপ রাজ্য প্রদান করেন। তিনি কিরাতদিগের দলপতি ঘটক নামক অপর এক রাজাকে তাড়াইয়া দিয়া, দীর্ঘকাল, গোহাটীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা নরকই কামাখ্যা মন্দিরের অভিভাবক বা পরিরক্ষকরূপে সম্মানিত। কামাখ্যার মন্দির এখনও সর্বত্র প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। নরক কালক্রমে এতদূর অহঙ্কৃত ও গর্বিত হইয়া উঠেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার রাজ্য তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে দান করিতে বাধ্য হন। ভগদত্তের

পুত্র কামদেব নামক পুত্র ছিল।—যথা কামপীঠ,

সুবৰ্ণপীঠ, রত্নপীঠ ও সৌম্য পীঠ । ভগদত্ত কামৰূপে হিন্দুধৰ্ম প্ৰবৰ্ত্তিত করেন । কিন্তু কুরুক্ষেত্ৰেৰ সেই মহাযুদ্ধে কৃষ্ণ যে পক্ষ ছিলেন, ভগদত্ত সে পক্ষ অবলম্বন করেন নাই,—তিনি কোঁৱৰদিগেৰ সহিত যোগদান কৰিয়াছিলেন । কথিত আছে, দুৰ্য্যোধন তাঁহাৰ কণ্ঠাৰ পাণিগ্ৰহণ করেন । সম্ভবতঃ তাঁহাৰ কোঁৱৰ পক্ষ যোগদানেৰ ইহাই প্ৰধান কাৰণ । ভগদত্ত কুরুক্ষেত্ৰ যুদ্ধে অৰ্জুন কৰ্ত্তক নিহত হন ।

৪ । এই সকল পুৰাতন আখ্যায়িকাৰ পৰে, মাঝে প্ৰায় ১০০০ বৎসৰেৰ ফাঁক পড়িয়া আছে । কামৰূপ সংক্ৰান্ত, এই সময়েৰ কোন ইতিবৃত্তই আমৰা অবগত নহি । যোগিনী তন্ত্ৰে আছে,—শকেৰ প্ৰাৰম্ভ অৰ্ধাৎ ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে, এই রাজ্য শূদ্ৰ রাজগণকৰ্ত্তক শাসিত হইতে থাকে । দেবেশ্বৰ নামক জনৈক শূদ্ৰ রাজা গোহাটী ও তেজপুৰে রাজত্ব কৰিতেছিলেন । ইহাৰ দীৰ্ঘকাল পৰে, একটা ব্ৰাহ্মণ রাজাৰ কথা শুনা যায় । তাঁহাৰ নাম নাগশঙ্কৰ । তিনিই বিশ্বনাথৰ মন্দিৰ নিৰ্ম্মাণ করেন । কথিত আছে, চন্দ্ৰগুপ্তেৰ পুত্ৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কামৰূপকে তাঁহাৰ বিৰাট্ সাম্ৰাজ্যেৰ অধীন অসংখ্য রাজ্যসমূহেৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিয়া লইয়াছিলেন ।

৫ । নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পৰ্য্যন্ত পালৰাজগণ বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন । এই সময়ে কামৰূপেও পাল শাসনকৰ্ত্তাদিগেৰ কথা শ্রুত হওয়া যায় । সম্ভবতঃ পালৰাজগণ কামৰূপ জয় কৰিয়াছিলেন । তাহাৰ পাতে একটা পুৰাতন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কুমাৰ পাল নামক জনৈক রাজা গোহাটীৰ নিকটে একখণ্ড ভূমি কোন ব্যক্তিকে দান কৰিয়াছিলেন । আসামেৰ হস্তলিখিত ইতিহাসে প্ৰতাপপুৰ নামক একটা প্ৰসিদ্ধ নগৰেৰ উল্লেখ আছে । এই নগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰেৰ উত্তৰতটে অবস্থিত ও ৰামচন্দ্ৰেৰ রাজধানী ছিল । কামৰূপে একটা রাজবংশ দীৰ্ঘকাল অৰধি রাজত্ব কৰিতে

বংশেরই এক রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হন। তাঁহার পর দাক্ষিণাত্যের জনৈক সর্দার ধরম বা ধর্মপাল উপাধি গ্রহণ করিয়া কামরূপ রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। তিনি ১২৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কামরূপে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ধরম পাল কামরূপের প্রথম রাজা রূপে গণ্য এবং উল্লিখিত রাজা রামচন্দ্রের আদি পুরুষ।

৬। পাল রাজাদিগের পতনের পরে, খ্যোন নামে পরিচিত আদিম অধিবাসীদিগের জনৈক সর্দার এই রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। বর্তমান রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কোমাতাপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি একটি ব্রাহ্মণকে তাঁহার সর্বপ্রধান মন্ত্রিপদে বরণ এবং স্বয়ং ‘নীলধ্বজ’ এই হিন্দু নাম গ্রহণ করেন। রাজা নীলধ্বজ তাঁহার রাজ্যের যাজন-কর্ম নিরূপার্থ মিথিল হইতে ব্রাহ্মণ আনাওয়া বিশেষ আদর ও যত্ন সহকারে আপন রাজ্যে উপনিবেশিত করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানের প্রতিদানে কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ খ্যোন সম্প্রদায়কে উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র রূপে সম্মানিত করেন। নীলধ্বজের পরে তাঁহার পুত্র চক্রধ্বজ রাজসিংহাসনে অধিকৃত হন। চক্রধ্বজের পরবর্তী রাজা নীলান্বর। নীলান্বরই এই বংশের শেষ রাজা। নীলান্বর খোড়াঘাটের দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করেন। কথিত আছে, তিনি রাজ্যের সর্বত্র সুন্দর সুন্দর পথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নিতান্ত অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদিগের প্রতি যার-পর-নাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। মন্ত্রিগণ পলাইয়া বঙ্গের গোড়নগরে যাইয়া নবাবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে হুশেন শাহ বাঙ্গালার নবাব। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা নবাবকে কামরূপ আক্রমণার্থ উৎসাহিত করিয়া তুলেন। বহুবৎসরব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের পর, হুশেন সা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামরূপ অধিকার করেন। এই সময়ের পরই, বোধ হয়,

(খ)

কোচারি আধিপত্য ।

উহার অভ্যুত্থান ও পতন ।

১। নীলাশ্বরের পতন হইলে, কামরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে । এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের একটিতে কুচি বা কোচারি নামে এক জাতি বাস করিত । কালে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে এই কোচারি রাজ্যই সর্বাধিক প্রতাপশালী হইয়া উঠে । প্রথমতঃ কুচিদিগের পৃথক পৃথক বহু সম্প্রদায় ছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একজন দলপতি, সর্দার বা অধ্যক্ষ ছিলেন । এই অধ্যক্ষ বা সর্দারদিগের মধ্যে এক জন সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন । এই সর্দার বা অধ্যক্ষের নাম হাজো । হাজো আত্মশক্তি ও ক্ষমতাবলে অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রভু বা রাজা হইয়া বসিলেন । তিনি ক্রমে সমগ্র রঙ্গপুর ও কামরূপের অধিকাংশ আপনার শাসনাধীন করিয়া লইলেন । কথিত আছে,—হাজোর দুটি কন্যা ছিল । একটির নাম হীরা, অন্যটির নাম জীরা । হাজোর পরে হীরার পুত্র বিশ্ব রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন । বিশ্ব শ্রীহট্ট হইতে নূতন একদল ব্রাহ্মণ আনাওয়া, তাঁহাদিগকে “কামরূপ ব্রাহ্মণ” নামে অভিহিত ও আপন রাজ্যে স্থাপিত করেন । এরূপ অনুমান যে, এই সময়েই, তন্ত্রসমূহ লিখিত হয় । যোগিনী তন্ত্র এই সকল তন্ত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান । রাজা এই সময়ে, “বিশ্বসিংহ” নাম গ্রহণ করেন । এইরূপ নাম পরিবর্তন দ্বারা, তিনিও একজন রাজপুত্র, ইহাই যেন বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল । রাজা বিশ্বসিংহ বলিতেন,—তিনি স্বয়ং ঈশ্বর শিব হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন । তাঁহার সম্প্রদায়টিও “রাজবংশী” বা “রাজপুত্র” নাম গ্রহণ করিল । হীরার বংশধরেরা সকলেই সাধারণ ভাবে “দেব”

বা “প্রভু” নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সিংহাসনে আসীন হইতেন, তাঁহাকে “নারায়ণ” নামে সম্বোধন করা হইত।

২। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হয়। তিনি ১৮টি পুত্র রাখিয়া যান। সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নরনারায়ণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার যত্নে ভাগবত, মহাভারত এবং অগ্ন্যাণ্ড গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। তিনি কামাখ্যার মন্দির নির্মাণ করান। মুসলমান আক্রমণকারিগণ শেষে



[কামাখ্যার মন্দির]

উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। “গোহাম কামুল আলি” নামে পরিচিত করিগুণ্ডাকার প্রসর পথটিও নরনারায়ণ কর্তৃক নির্মিত হয়। কথিত আছে,—তিনি আহমদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে করদ প্রজাভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল

বাসিত । তিনি ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন । মৃত্যুর পূর্বে, তিনি তাঁহার রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করেন । পূর্ব ভাগ বা “কুচ হাজো” রাজ্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে দেওয়া হয় । পশ্চিম ভাগ বা কুচবিহার, তিনি তাঁহার আপন পুত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য রাখিয়া যান । পরবর্তী কুচবিহারের রাজারা এই লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধর ।

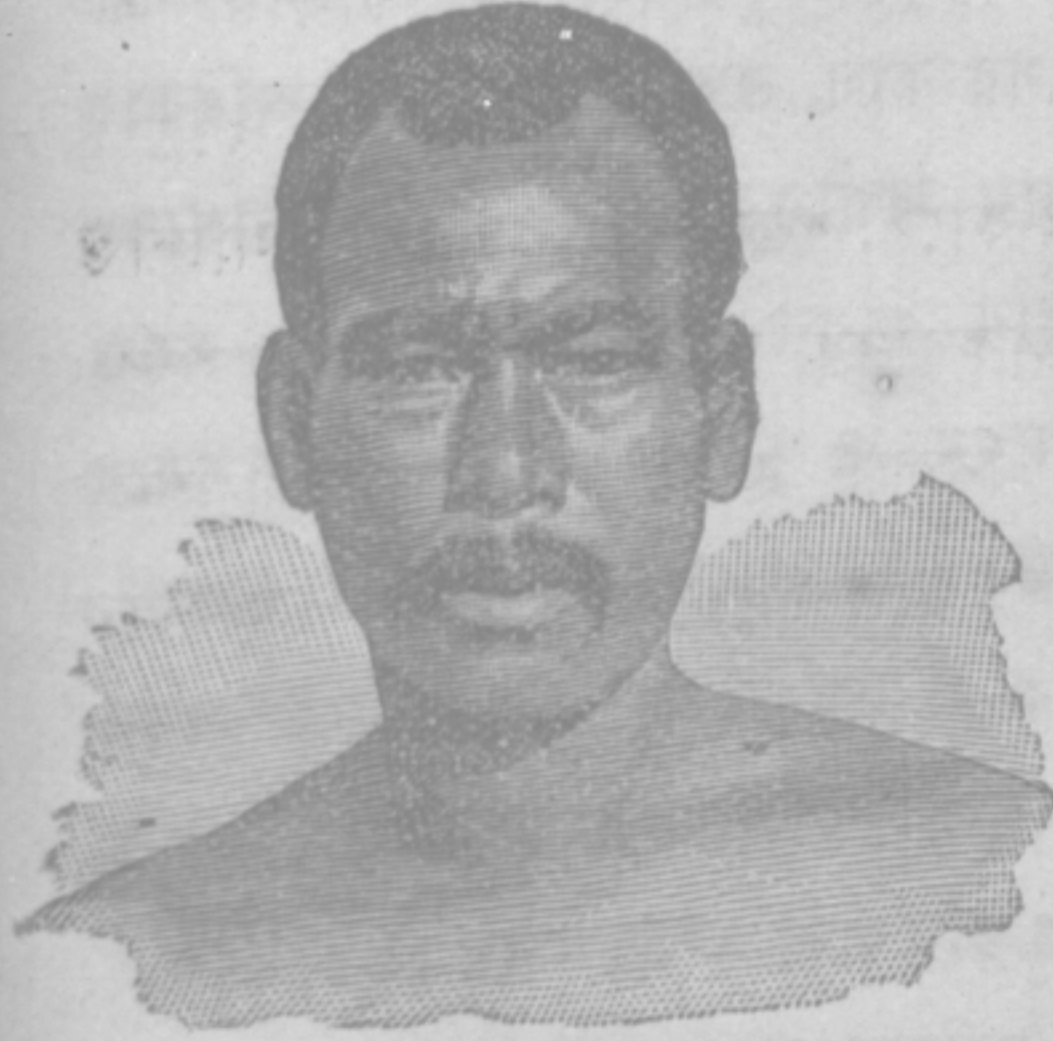
৩ । সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব কালে, শত্রুকর্তৃক কুচবিহার আক্রান্ত হয় । রাজা মানসিংহ তখন আকবরের অধীন বাঙ্গালার গবর্ণর । বিপন্ন লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের নিকটে যাইয়া সাহায্যপ্রার্থী হন । রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, অধীন রাজত্বরূপে দিল্লীর সম্রাটকে করদানে সম্মত হইলে, তাঁহাকে সাহায্য দান করা হয় । এই সময় হইতে কুচবিহার দিল্লীর অধীন করদ রাজ্য হইয়া পড়ে । কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময়ে, তদানীন্তন কুচবিহার-রাজ দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন । মির জুমলা একদল সৈন্য সহ কুচবিহারে প্রেরিত হইয়া বিদ্রোহী রাজাকে পরাস্ত করেন । ইহার পরে কুচবিহার রাজ্য একবারে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায় ।

৪ । পূর্বভাগের রাজা রঘুদেব নারায়ণের পরে, তাঁহার পুত্র পরীক্ষিত সিংহাসনে আরোহণ করেন । রাজা পরীক্ষিতের সময়ে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট ছিলেন । তখন বাঙ্গালার গবর্ণর ইসলাম খাঁ । ইসলাম খাঁ একদল সৈন্য পাঠাইয়া পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণ করিয়া-ছিলেন । এই যুদ্ধে পরীক্ষিত পরাভূত ও বন্দীকৃত হন । তাঁহার রাজ্যটি অতঃপর মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে । ঐ সময় হইতে কোচ রাজাদিগের স্বাধীনতা লোপ প্রাপ্ত হয় । পশ্চিম ভাগ মুসলমান শাসনের অধীন হয় । পূর্বভাগ আহমেরা জয় করিয়া আপনাদিগের শাসনাধীন করিয়া রাখে ।

(গ)

আহম আক্রমণ ও আহম-উপনিবেশ।

১। শান জাতির অন্তর্নিবিষ্ট সম্প্রদায় বিশেষ আহম নামে পরিচিত ছিল। আহমেরা প্রচণ্ড স্বভাব ও স্বাধীন জাতি। তাহাদিগের



পুরাতন রাজ্যের নাম পঙ্গ।
মোগঙ্গ এই রাজ্যের রাজধানী।
ইরাবতী নদীর উচ্চতর উপ-
ত্যকায় এই রাজ্য এখনও
বর্তমান আছে। খৃষ্টীয় প্রায়
১২২৮ অব্দে আহমেরা ব্রহ্মপুত্র
নদের উপত্যকা প্রদেশের উত্তর
প্রান্তে প্রবেশ করে। ক্রমে
তাহারা সমস্ত উপত্যকা জয়

[আহম পুরুষ]

করিয়া, তাহাদিগের নিজ নামে সমগ্র দেশের নাম নির্দেশ করিয়া লয়।
তাহাদিগের নাম অনুসারেই এখন ঐ রাজ্যকে আসাম বা আহাম
বলা হইয়া থাকে।

২। পঙ্গের সিংহাসন লইয়া কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে বিসংবাদ উপ-
স্থিত হইয়াছিল। যাহারা সিংহাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত বিবাদে
প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগের এক জনের নাম চুকাফা। চুকাফা বিবাদে
বিফলমনোরথ হইয়া কতিপয় সঙ্গী ও সহচর সহ, কএক বৎসর কাল,
ইরাবতী নদী ও পাতকই পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগে ঘুরিয়া বেড়ান।
অরশেষে তাহারা পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায়
প্রবিষ্ট হন। এই উপত্যকায় তখন বিবিধ পার্বত্য জাতির বাস ছিল।
একে একে এই সকল পার্বত্য জাতি তাহাদিগের বশীভূত ও অধীন

হইয়া পড়ে । কিন্তু ইহাদিগের একটি রাজ্য দৃঢ়গঠিত ছিল । এই রাজ্য চুত্যা সম্প্রদায়ের অধিকৃত । চুতোরাই সাদীয়ের পুরাতন পাল রাজ-বংশকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল । ইহারা হিন্দু ধর্ম অবলম্বন এবং ইহাদিগের দলপতি বা অধ্যক্ষ শেষ পাল-রাজ-কন্টার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল । আহম ও চুতোরাই বহু বৎসর কাল, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অধিকার করিয়া থাকে । এখন যে সকল স্থান লক্ষ্মীপুর জেলা ও শিবসাগরের অন্তর্গত, আহমেরা সেই সকল স্থান শাসন করিত ; অবশিষ্ট সমস্ত চুতাদিগের অধিকারে ছিল । আহম ও চুতোরাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে । কিন্তু কোন পক্ষই একক্ৰমে, দীর্ঘকাল সর্বোপরি ক্ষমতা চালাইতে বা আধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই । অবশেষে আহমেরা চুতাদিগকে সর্বতোভাবে বিধ্বস্ত করে ;—তাহাদিগের রাজ্য নিহত ও রাজধানী আক্রান্ত হয় । চুত্যাগণ এই পরাভবের পর ফিরিয়া আর মাথা তুলিতে পারে নাই । এই হইতেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহমদিগের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৩ । এই সময়ে আহমেরা কাচাড়িদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তটেও আপনাদিগের ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল । উল্লিখিত সমস্ত সময় ব্যাপিয়া আহম রাজগণ একের পর অন্যে রাজত্ব করিতেছিলেন । আসামীয় ইতিহাসে এই সকল রাজার নাম ও সময় লিখিত রহিয়াছে । এই রাজাদিগের মধ্যে এক জনের নাম চুচেঙ্গ্‌ফা । চুচেঙ্গ্‌ফা ১৬১১ হইতে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । তখন সম্রাট্‌ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । চুচেঙ্গ্‌ফা বহু হিন্দু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । এই সকল মন্দিরের মধ্যে মহেশ্বরের মন্দিরই সর্বপ্রধান । তিনি ধর্মকর্মের জন্য ব্রাহ্মণ যাজক নিয়োগ করেন এবং হিন্দুধর্মকেই রাজধর্মে পরিণত করিয়া লন । শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিই

৪। তাঁহার পুত্র ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে “জয়ধ্বজ সিংহ” এই হিন্দু নাম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে পরবর্তী সমস্ত আহম রাজগণই আহম ও হিন্দু উভয়বিধ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ধ্বজের রাজত্ব কালে ১৬৬০ হইতে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মির জুমলা আসাম আক্রমণ করিয়া আসামে রণকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। মির জুমলা কর্তৃক আসাম রাজধানী অধিকৃত হয়। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কামান ও গুলি বিসর্জন দিয়া আসাম হইতে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই আক্রমণের শেষ ফল এই দাঁড়ায় যে, আহমেরা নিয় আসামে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহিসে এবং গোহাটী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হয়। ১৮শ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানে আহম গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত এবং গোহাটী আহম রাজাদিগের রাজধানী ছিল।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রুদ্র সিংহ আহম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই আহম রাজাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধানরূপে গণ্য। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তাঁহার শাসনাধীন ছিল। রুদ্রনাথের উত্তরাধিকারী গৌরীনাথ সিংহ এবং গৌরীনাথ সিংহের, চন্দ্রকান্ত সিংহ। এই চন্দ্রকান্তের রাজত্ব সময়েই বর্মার লোকেরা আহম রাজ্য জয় করিয়া লয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকর্তৃক আহম রাজশক্তি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(ঘ)

কাচাড় ও কাচাড়ি রাজ্য ।

১। কাচাড়িদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু এই তক বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসীদিগের মধ্যে, কাচাড়িরাই সকলের, আগে জন-সমাজে পরিচিত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালাপাড়ায় ‘মেচ’ নামে পরিচিত

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী কাচাড়িরা ‘বোদো’ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয় । কিন্তু উত্তর কাচাড়ের কাচাড়িরা আপনাদিগকে “দিমিসা” বলে । “দিমিসা” সম্ভবত “দিমিফিসা” নামেরই রূপান্তর । “দিমিফিসা” শব্দের অর্থ, মহানদ ব্রহ্মপুত্রের সন্তান ।

কোচদিগের সহিত কাচাড়িদিগের বিশেষ নৈকট্য লক্ষিত হয় । শুধু কোচদিগের সহিতই নহে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চুত্যা ও লালুঙ্গ এবং দক্ষিণ পাহাড়ের গারো ও টিপরাদিগের সহিতও তাহাদিগের ঐক্য নৈকট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহা অসম্ভব নহে যে, এক সময়ে, আসামের অধিকাংশ ও উত্তরবঙ্গ লইয়া একটা বৃহৎ “বোদো” রাজ্য গঠিত হইয়াছিল ।

২ । কাচাড়িদিগের আদি কাহিনী ও প্রকৃত বিবরণ আমরা এই জানি যে, প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তট দিয়া একটা কাচাড়ি রাজ্য বিস্তৃত ছিল । ধনশ্রী নদীর উপত্যকাটিও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত । ইহার পূর্বদিকে আহম ও পশ্চিম দিকে ‘কামতা’ নামক হিন্দুরাজ্য । আহম ও কাচাড়ি রাজ্যের সীমা স্থলে দীক্ষু নদী প্রবাহিত ছিল ।

৩ । দিমাপুর নামক একটা বৃহৎ নগরে তখন তাহাদিগের রাজধানী ছিল । এই নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বন-মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । দিমাপুরের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে বুঝা যায়, দালানাদির গঠন ব্যাপারে কাচাড়িরা আহমগণ অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ ছিল । নগর ঘেরিয়া তিন দিকে দুই মাইল দীর্ঘ ইষ্টকনির্মিত প্রসর প্রাচীর ও চতুর্থদিকে ধনশ্রী নদী । সম্মুখে অতি সুন্দর একটি দ্বার এবং ১২ ফুট উচ্চ ও ৫ ফুট বেড় কতিপয় সূক্ষ্ম স্তম্ভ ছিল । এই ফটক বা দ্বারটি এখনও বর্তমান আছে । কিন্তু এই সময়ের আহমদিগের বাস-গৃহ বংশনির্মিত ও কাদার প্রাচীরে গঠিত । কাচাড়িরা বলে যে, রাজা চক্রবর্ত্ত

৪। কালক্রমে আহমেরা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে আহম ও কাচাড় রাজ্যের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধঘটনা হয়। অবশেষে আহমেরা জয়লাভ করে এবং কাচাড়িগণ সম্পূর্ণরূপে



[দিমাপুরের ধ্বংসাবশেষ]

পরাজিত হয়। আহমেরা জয়লাভ করিয়া ধনশ্রী নদী পর্য্যন্ত গমন করে, কাচাড়িদিগের রাজধানী দিমাপুর লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া লয় এবং কাচাড়িরাজ দেৎসঙ্গের সহিত বহুসংখ্যক কাচাড়িকে হত্যা করিয়া ফেলে।

৫। কাচাড়িরা ইহার পরে ধনশ্রী নদীর উপত্যকা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়, এবং উত্তর কাচাড়ে মাহুর নদীর তটে মেইবঙ্গ নগরে রাজধানী স্থাপন করে। কিন্তু এখানেও তাহারা শান্তিতে থাকিতে পারে না। প্রসিদ্ধ কোচরাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা শীল রায় এক দল কোচ সেনা লইয়া প্রায় ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই সময়েই সর্ব-প্রথম কাচাড়ি রাজা “হিড়িম্বরাজ” নামে অভিহিত হন।

৬। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাচাড়ি ইতিবৃত্ত বিষয়ে, ইহার অধিক আর কিছুই আমরা অবগত নহি। বোধ হয়, এফগ কাচাড় রাজ্যরূপে পরিচিত প্রান্তর ও উত্তর কাচাড়ের পাহাড় সমূহে তাহারা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। শুনা যায় যে, এক সময়ে এই দেশ ত্রিপুরারাজের অধীন ছিল। প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে কাচাড়ি রাজা ত্রিপুরা-রাজের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়, এই রাজ্য কাচাড়িরাজকে দান করা হয়।

৭। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে কাচাড়িরাজ শত্রুদমন, জৈন্তার রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে করদানে বাধ্য করেন। এই ঘটনায় তিনি আপ-মাকে এত দূর গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার পরেই, তিনি অসিমর্দন নাম ধারণ করেন। কিন্তু জৈন্তার রাজা, কিছু দিন পরে, আহম রাজের নিকট কন্যাদানে প্রস্তুত হইয়া, কাচাড়িরাজ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, আহমরাজকে অনুরোধ করিলেন। গর্ষিত কাচাড়ি রাজ ইহা অনুমোদন করিলেন না। এই সূত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শত্রুদমন আহমদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বয়ং “প্রতাপ নারায়ণ” উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং রাজধানী মেইবঙ্গের কীর্ত্তিপুর নাম রাখিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কাচাড়িরাজগণ, শত বৎসর কাল সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তথাপি আহমেরা, কাচাড়ি-দিগের অধিরাজরূপে আপনাদিগের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

৮। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আহমেরা মুসলমানদিগের সহিত রণ-ব্যাপারে এত দূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে যে, তাহারা কোন দিক দিয়াই কাচাড়িদিগের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে কাচাড়িরা ক্রমশই অধিকতর সাহসী হইয়া উঠে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের রাজা তাম্রধ্বজ প্রকাশভাবে আপনাকে স্বাধীন

৯। এই সময়ে রুদ্রসিংহ আহমদিগের রাজা ছিলেন। কাচাড়ি রাজের ঐরূপ গর্ষিত ঘোষণা শ্রবণমাত্রই রুদ্রসিংহ ৭০০০০ লোক লইয়া কাচাড় আক্রমণ করিলেন। তাম্রধ্বজ সন্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না ;—তিনি পলাইয়া জৈন্তার রাজা রামসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। আহম সেনা সমস্ত কাচাড় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজধানী মেইবঙ্গে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মেইবঙ্গে উপস্থিত হইয়া সেখানকার ইষ্টকনির্মিত দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু আহমেরা দীর্ঘকাল সেখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না ;—তাহাদিগের বহু লোক রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহাদিগকে কাচাড় ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইল।

১০। এদিকে জৈন্তার রাজা রামসিংহ শরণাপন্ন কাচাড়ি রাজকে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং কাচাড় রাজ্যটিকে স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। ইহার পরে, রাজা তাম্রধ্বজ কোন কৌশলে রুদ্রসিংহের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠান। রুদ্রসিংহ এই চিঠি পাইয়া জৈন্তা আক্রমণ ও রামসিংহকে পরাভব করিয়া ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তাম্রধ্বজকে মুক্ত করিয়া আনেন। অতঃপর তাম্রধ্বজ এক বৃহৎ দরবারে আহমরাজকে করদান এবং বৎসরে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি দরবারের অবসানে মেইবঙ্গে চলিয়া যান ; কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১। পরবর্ত্তী শত বৎসর কাল, কাচাড়ি রাজগণ আহমদিগের শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্ন করেন। কিন্তু তাঁহারা যতবার এরূপ প্রয়াস করিলেন, ততবারই পরাস্ত হইলেন। ১৭২০

করেন । ব্রাহ্মণেরা এই উপলক্ষে ধর্ম-উৎসবের এক অতি বৃহৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই ধর্ম উৎসবে কাচাড়িদিগের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র, তাম্রনির্মিত একটা প্রকাণ্ড গো-মূর্তির ভিতরে প্রবেশ করেন । উহার ভিতর হইতে বহির্গত হইবার পরেই তাঁহাদিগকে গোগর্ভসমুত এবং যথার্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হয় ।

১২ । ইহার পরে, এইরূপ একটা কথা প্রচার করা হয় যে, কাচাড়ি-রাজগণ পাণ্ডুরাজার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের সন্তান । ভীম যখন ভ্রাতৃগণ সহ ছদ্মবেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তখন তিনি গতিপথে কাচাড় অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া, দেখিতে পান যে, সেখানে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস রাজত্ব করিতেছে । ভীম হিড়িম্বের প্রাণবধ করিয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বীকে বিবাহ করেন । হিড়িম্বীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মে । এই পুত্রের নাম ঘটোৎকচ । ঘটোৎকচ হইতেই কাচাড় রাজ-বংশের উৎপত্তি । হিড়িম্বের কাহিনী মহাভারতের একটা পুরাতন কথা । রাক্ষস হিড়িম্ব কাচাড়ে বাস করিত, বহুকাল পরে, ব্রাহ্মণেরা ইহা আবিষ্কার করেন । প্রায় ৩০০ বৎসর অতীত হইয়াছে, লিখিত পত্র বা খোদিত ফলকে হিড়িম্ব নামের ব্যবহার সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়, এই সময়েই কাচাড়ি রাজা আপনাকে “হিড়িম্ব” বা “হিড়িম্বরাজ” নামে অভিহিত করেন । ইহার পূর্বে আর কখন, কোন প্রকারে এই নাম ব্যবহারের কোনরূপ নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

১৩ । ইহার অল্প কাল পরেই মণিপুররাজ্য কর্তৃক কাচাড় আক্রান্ত হয় । এই সময়ে গোবিন্দচন্দ্র কাচাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন । মণিপুর হইতে ভ্রাতৃত্ব মিলিত হইয়া আসিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রকে তাড়াইয়া দেন এবং সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া লন । গোবিন্দচন্দ্র স্বরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া, বর্ম্মারাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন ।

কাচাড় হইতে বর্মাদিগকে দূর করিয়া দিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে কাচাড় সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজকে বার্ষিক ১০০০০ টাকা কর স্বরূপ দিতে সম্মত হন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র শাসন-কার্য্য ভালরূপ চালাইতে পারেন নাই। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। কাচাড়ের লোকেরা ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। এই হেতু ১৮৩২ সনে কাচাড় রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের এক অঙ্গরূপে পরি-গৃহীত হয়।

(৬)

শা জেলাল কর্তৃক শ্রীহট্টের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ।

১। শা জেলাল ইব্রাহিমের পুত্র। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। আরব দেশের ‘যমান’ নামক স্থান তাঁহার জন্মভূমি। শা জেলাল কুরিশ সম্প্রদায়ের সেখ-পরিবারভুক্ত ছিলেন। তিনি শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া আহম্মদ কবির নামক জনৈক সৈয়দ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। সৈয়দ সাহেব একজন দরবেশ ও সম্পর্কে তাঁহার ধুল্লতাত। সৈয়দ মক্কার বাস করিতেন। কথিত আছে, শা জেলাল প্রথম বয়সে একদিন, শুধু দৃষ্টিশক্তিবলে, একটি যুগকে একটা ব্যাজের কবল হইতে রক্ষা করেন। ব্যাজ তাঁহার দৃষ্টি সহ করিতে না পারিয়া, ভয়ে জড়সড় হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার খুড়া বৃদ্ধ দরবেশ এই ঘটনা দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং ঈশ্বর বালককে বিশেষ শক্তি দিয়াছেন বুঝিয়া, তাঁহাকে হিন্দুস্থানে যাইয়া ইসলামধর্ম প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। ইহার পরে তিনি যুবকের হাতে এক যুষ্টি মৃত্তিকা তুলিয়া দিয়া বলিলেন,— “যে স্থানে এই বর্ণ, এই স্বাদ ও এইরূপ গন্ধবিশিষ্ট মৃত্তিকা প্রাপ্ত

২। জেলাল যখন হিন্দুস্থানে আসিয়া পঁছলিলেন, তখন শ্রীহট্টে গৌরগোবিন্দ নামে একটি হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। গৌরগোবিন্দ একজন বড় ঐন্দ্রজালিক বা যাদুগীর। তৎকৃত বিবিধ অপ-বিত্র ও ভৌতিক অনুষ্ঠান হেতু তাঁহাকে পুরাতন রাজ্য বাঙ্গালার গোড় দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। তখন শিলেটের নাম ছিল শ্রীহাট বা শ্রীহট্ট। এই স্থানে তখন বন্য লোকের বসতি ছিল। বন্যদিগের মধ্যে এখানে সেখানে দুই একজন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত লোকও দৃষ্টি-গোচর হইত। গোবিন্দ দেশের কর্তা হইয়া, এই সকল মুসলমানদিগের সহিত নিতান্ত মন্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। একান্ত উৎপীড়িত হইয়া, তাহাদিগের অধিকাংশই অন্যান্য রাজ্যে পলাইয়া যায়। অল্প কএকজন মাত্র দেশের মমতা ত্যাগ করিয়া অন্ত্র বাইতে পারিল না। যাহারা দেশে রহিল, তাহাদিগের এক জনের নাম সেখ বুরহান্দী।

৩। বুরহান্দীর কোন সন্তান নাই। সে মানস করিল,—যদি তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সে আল্লার নামে গুরু জবাই করিবে। কিছু দিন পরে তাহার একটি পুত্র জন্মিল। সেও তাহার মানসিক কর্ম, গুরু জবাই করিল। রাজা গোবিন্দ ইহা শুনিয়া যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিরুপায় বুরহান্দীকে ধরিয়া লইয়া গুরু জবাইর শাস্তি স্বরূপ তাহার ডান হাত ধানি কাটিয়া ফেলিলেন এবং যে শিশুর কল্যাণ-কামনায় গোহত্যা করা হইয়াছিল, সেই নবজাত পুত্রটিকেও আনিয়া বলি দিলেন।

৪। বুরহান্দী এই নিষ্ঠুর 'অত্যাচারে প্রাণান্তকর কষ্ট পাইয়া শ্রীহট্ট হইতে পলায়ন করিল। ইহার পরে সে দিল্লীতে যাইয়া আলা-উদ্দীনের চরণতলে, অভিযোগ জানাইল। আলা উদ্দিন ইহা শুনিয়া

অতিপ্রায়ে একদল সৈন্য সহ ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দর শাকে শ্রীহটে পাঠাইয়া দিলেন। সেকেন্দর ঢাকা পঁহুঁচিয়া, ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়া শ্রীহট্টের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা গৌরগোবিন্দও তাঁহার সেনা-সামন্ত লইয়া সাহস সহকারে সেকেন্দরের সম্মুখীন হইলেন। কথিত আছে,—বহুসংখ্যক ভূত বা দানব রাজা গোবিন্দের সাহায্যার্থ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। এই সকল ভূত বা দানব সম্ভবতঃ ঐ দেশবাসী জঙ্গলীলোক। রাজার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে “অগ্নিবাণ” বা হাঐ আনীত হইয়াছিল। এই অগ্নিবাণ নিক্ষেপে পাঠানদিগের অশ্বগুলি একান্ত ভীত, ভীত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হিন্দুগণ জয়ী হইলেন। দিল্লীর সেনা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

৫। বুরহান্দী এই সৈন্যদলের সঙ্গে আসিয়াছিল; সেও সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া গেল। বুরহান্দী, দিল্লীর সম্রাট্ প্রদত্ত সাহায্যে কোন ফল হইল না দেখিয়া, দরবেশ শা জেলালের শরণাপন্ন হইল। এই সময়ে, শা জেলাল দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন। সাধু মহাত্মা জানে, সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। সম্রাটের পীর বা আধ্যাত্মিক গুরু তাঁহাকে নিফুট কাল রঙের এক যোড়া কবুতর দিয়াছিলেন। কথিত আছে, শা জেলাল সেই কবুতর যোড়া সঙ্গে করিয়া শ্রীহটে লইয়া আসেন। শা সাহেবের দরগায় এখনও কতকগুলি কবুতর দৃষ্ট হয়, লোকে বলে এগুলি ঐ দুই কবুতর হইতেই উৎপন্ন।

৬। আলা উদ্দীন পুনর্বার শ্রীহট্টের বিরুদ্ধে আর একদল সেনা পাঠাইয়া দিলেন। সৈয়দ নাসির এই সৈন্য দলের সেনাপতি। শা জেলালও এই সেনার সঙ্গে চলিলেন। সেনাদল ব্রহ্মপুত্রের তটে পঁহুঁচিলে, জেলাল তাঁহার সাধনার আসন বা চাটাইতে চড়িয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া শা সাহেব শিম্ববর্গ সহ নির্ভয়ে

হইল । কিন্তু বাণ তাঁহাকে স্পর্শ করিল না ;—ফিরিয়া গিয়া রাজার সৈন্যগণের উপরেই নিপতিত হইল । রাজার সেনাদল ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পড়িল । রাজার মন্ত্রিগণ মুসলমান সাধুর আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন । ‘তাঁহারা রাজাকে সাধুর নিকট বশুতা স্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন । রাজা নিজেও এতদূর ভীত হইয়া-ছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের পরামর্শ অগ্রাহ করিতে সাহস পাইলেন না । প্রথমতঃ রাজার প্রতি একটি মসজিদ নির্মাণ উপযোগী প্রস্তর যোগাইবার জন্ত আদেশ করা হইল । ইহার পরে, সমস্ত রাজ্য ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করা যাইতে পারে, এই পরিমাণ প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া দিতে বলা হইল ।

৭ । শা জেলাল তাঁহার প্রার্থনার মাদুর বা চাটাইতে বসিয়া সূর্য্যানদী পার হইলেন । সূর্য্যানদীর পর পাড়ে যাইয়া শা জেলাল সেধানকার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলেন । তিনি মক্কা হইতে যে মাটি আনিয়াছিলেন, সেখানে সেই রঙ, সেই গন্ধ ও সেই আশ্বাদযুক্ত মৃত্তিকা দেখিতে পাইয়া, বলিলেন ;—“আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব ।” এই বলিয়া শা জেলাল সূর্য্যানদীর পর পাড়ে আপনার ‘আস্তানা’ আশ্রম বা বিশ্রামস্থান প্রস্তুত করিয়া লইলেন । তাঁহাকর্তৃক সেকেন্দর শাঐ রাজ্যের রাজা নিযুক্ত হইলেন । শা জেলালের সঙ্গে ৩৬০ জন দরবেশ আসিয়াছিলেন ; ইহার পরে, ইসলাম ধর্ম প্রচার ও স্থানীয় অধিবাসীদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত সেই দরবেশ-দিগকে চারিদিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল । দরবেশগণ ধর্ম প্রচারব্রতে এতদূর কৃতকার্য হইলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই, দেশের প্রায় সমস্ত লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল ।

৮ । দেশপ্রচলিত কিম্বদন্তীতে শা জেলালের এই কাহিনী এখনও

শ্রীহট্টের মুন্সেফ ছিলেন। তিনি এই জনশ্রুতির কাহিনীটিকে পারসিক কবিতায় গ্রথিত করিয়াছেন। “সুহেইল-ই যমান” অথবা “যমানের নক্ষত্র” কবিতাটির এই নাম রাখা হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, শা জেলাল ৩২ বৎসর শ্রীহট্টে বাস করিয়া ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন।



[শা জেলালের সমাধি]

৯। আবু আবদুল্লাহ মহম্মদ একজন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান পরিব্রাজক। তিনি “ইবু বাটুটা” বা পরিব্রাজক নামেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন। ইবু বাটুটা ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকা দেশে তাজিয়ারে জন্ম ধারণ করেন। তিনি সমগ্র এশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া মহম্মদ টোগলকের রাজত্ব কালে ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহম্মদ টোগলক তাঁহাকে দিল্লীতে কাজীর কর্মে নিযুক্ত করেন। পরিব্রাজক মহোদয় ভ্রমণ-সময়ে শ্রীহট্টে

গমন করিয়াছিলেন । তিনি তাঁহার লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে শ্রীহট্টকে কামরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি সুপ্রসিদ্ধ সাধু মহাদ্বার দর্শন কামনায় শ্রীহট্টে গমন করিয়াছিলেন । পরিত্রাজক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে “তাব্রিজের শা হেলাল” সাধুর এইরূপ নাম নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন যে, সাধু তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বহু অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই বলিয়া তিনি সাধুর অনুষ্ঠিত কতিপয় অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন, সাধু তখন ১০০ বৎসরের বৃদ্ধ । আকৃতি সুদীর্ঘ, কিন্তু ক্ষীণ । চুল ও দাড়ি গৌফ বেসী ছিল না । তিনি গুহা বা গহ্বরে বাস করিতেন এবং একক্ৰমে দশদিন উপবাস করিয়া তাঁহার রক্ষিত একটি গাভীর কিঞ্চিৎ পরিমাণ দুগ্ধ মাত্র পান করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন । প্রায়ই তিনি প্রার্থনায় বসিয়া একাসনে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিতেন । তাঁহার কামরূপে গমন ও সেই স্থানে স্থায়ী বাসস্থান নির্দেশের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের লোককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা । তিনি তাঁহার এই সঙ্কল্পে সম্যক কৃতকার্য হইয়াছিলেন । দেশের লোকেরা, কি নিকটস্থ, কি দূরস্থ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত এবং নানা বস্তু আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিত । সেখানে যে সকল ভিক্ষুক ও ফকির থাকিত, সাধু এই সকল উপহার-দ্রব্য তাহা-দিগকে বিলাইয়া দিতেন । কোন্ দিন, কোন্ সময়ে, তাঁহার মৃত্যু হইবে, তিনি তাহা পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন । তাঁহার পূর্বকথিত নির্দিষ্ট মুহূর্ত্তেই তাঁহার তনুত্যাগ হইয়াছিল । তিনি প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন ।

(৮)

মিরজুন্না কর্তৃক আসাম আক্রমণ ।

হইয়াছিল। প্রত্যেক মুসলমান রাজাই, তাঁহার সুশিক্ষিত সেনা ও শ্রেষ্ঠ কল্লের অস্ত্র-বলে প্রথম কৃতকার্য হইয়াছেন। কিন্তু আসাম জয় করিয়াও তাঁহাদিগের কেহই সেখানে রাজত্ব স্থাপনে সমর্থ হন নাই;— কিছু সময় পরে, সকলকেই, দেশের ভৌগোলিক-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা, ও গন্তব্য পথের অভাব নিবন্ধন, বিশেষতঃ অরদূষিত জল-বায়ুর উৎপীড়নে, আসাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

২। মিরজুন্না, আওরঙ্গজেবের একজন বড় সেনাপতি। তিনি



[মিরজুন্না]

সর্বশেষ আসাম আক্রমণ করেন। এই রণ-ব্যাপার ১৬৬০—১৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই আক্রমণই পূর্বকার অণু সকল আক্রমণ অপেক্ষা সমধিক প্রবল। উচ্চ আসাম তখন কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। একদিকে কামরূপ অণু দিকে বাঙ্গালা। মাঝখানে কুচহাজো ও কুচবিহার নামক দুটি রাজ্য ছিল। নিম্ন আসামের বর্তমান গোয়ালপাড়া, ধুব্রি ও রঙ্গমতী লইয়া কুচহাজো রাজ্য। পশ্চিমে ত্রিহত, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে

তিব্বত এই সীমান্তের মধ্যে কুচবিহার বিস্তৃত। কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ আকবরের নিকট বশুতা স্বীকার করেন। তদবধি কুচবিহারের রাজারা রীতিমত কর দিয়া আসিতেছিলেন। কুচবিহার-রাজ্য বঙ্গীয় মোগল-রাজপ্রতিনিধির অধীন ছিল।

৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে বাঙ্গালার গবর্ণর ইসলাম খাঁ কুচ-

হাজোতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন । মুকব্বরাম খাঁ এই সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন । পরীক্ষিৎ তখন কুচহাজোর রাজা । মুকব্বরাম খাঁ রাজা পরীক্ষিৎকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন । কঠোর যুদ্ধের পরে, পরীক্ষিৎ বন্দী হন । কুচহাজো মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায় । কিন্তু পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলদেও বা বলদেব পলায়ন করিয়া কামরূপের রাজা স্বর্গদেও বা স্বর্গদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন । তাঁহার উত্তেজনায় উৎসাহী হইয়া স্বর্গদেব কুচহাজোস্থিত মোগল-সেনার সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হন । তিনি কুচহাজোর একাংশ অধিকার করিয়া নানা যুদ্ধে মোগল-দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু অবশেষে মোগলেরাই জয় লাভ করেন । আসামীরা কুচহাজো হইতে নিকাসিত হইয়া যায় । মোগলেরা কামরূপ আক্রমণ করিয়া উহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন । কুচহাজো এবং গোহাটিতে ফৌজদার বা গবর্ণর নিযুক্ত হন । ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই সকল ঘটনা হইয়াছিল ।

সাজাহানের রাজত্বের শেষভাগে কুমার সুজা বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন । ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পীড়িত হইয়া পড়িলে, সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয় । প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সুজা তখন বাঙ্গালার প্রত্যেক স্থান হইতে সৈন্য সকলকে আহ্বান করিয়া আনেন । কুচহাজো ও কামরূপ হইতেও সৈন্যদল উঠাইয়া আনা হয় । এইরূপে তিনি এক অতি বৃহৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে রণ-যাত্রা করেন ।

৪ । এই ঘটনার অল্পকাল পরে, কুচবিহারের করদ রাজা ভীষ-নারায়ণ কুচহাজোতে কোন সৈন্য সামন্ত নাই দেখিয়া, কুচহাজো আক্রমণ করিলেন । এক দিকে এই আক্রমণ । পূর্বদিক্ হইতে আবার কামরূপের প্রাচীন আহম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ একদল সৈন্য ও

তিনি এই রণতরি ব্রহ্মপুত্র দিয়া চালাইয়া আনিলেন । রাজা জয়ধ্বজ মুসলমান ও কুচবিহার সেনা, এই উভয়কেই আক্রমণ করিলেন ।

কুচহাজোর মুসলমান গবর্ণর মির লুৎ জুন্না আসামীদিগের সহিত যুদ্ধে আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন । কুচবিহারের রাজা ও আহমরাজ অপেক্ষা আপনাকে হীনবল বুঝিয়া স্বরাজ্যের দিকে সরিয়া পড়িলেন । এইরূপে সমগ্র নিম্ন আসাম আহমদিগের করায়ত্ত হইল । আহমেরা পরবর্তী তিনবৎসর কাল নির্বিবাদে এইস্থানে আধিপত্য করিল ।

৫ । সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে, নবাব মিরজুন্না বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া আসিলেন । একদিক হইতে কামরূপের রাজা জয়ধ্বজ সিংহ এবং অন্য দিক হইতে কুচবিহারের ভীমনারায়ণ, উভয়েই সন্ধিপ্রার্থী হইয়া মিরজুন্না সমীপে আপন আপন দূত পাঠাইয়া দিলেন । রাজা জয়ধ্বজ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি কুচবিহারীদিগকে দূরে রাখিবার নিমিত্তই কুচহাজো অধিকার করিয়া রহিয়াছেন । তিনি কুচহাজো সম্রাটের জন্য রাখিয়াছেন এবং যে কোন যোগল কর্মচারী প্রেরিত হইবেন, তিনি তাঁহার হাতেই রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন ।

৬ । মিরজুন্না স্বয়ংই, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্যসহ বাঙ্গালা হইতে বহির্গত হইলেন । কুচবিহার গমনের একটা পথ ঘন বাঁশবনের মধ্য দিয়া ছিল । উহা অরক্ষিত আছে, ইহা জানিতে পারিয়া, তিনি ঐ পথ ধরিয়া চলিলেন । নবাব বাঁশবনের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে সৈন্য চালনা করিয়া ছয় সপ্তাহের পরে রাজধানীতে পঁহুচিলেন । রাজা ভীম-নারায়ণ তাঁহার কামানগুলি ফেলিয়া ভূটানে পলাইয়া গিয়াছিলেন । বিনা যুদ্ধে কুচবিহার যোগল-রাজ্যভুক্ত হইল । , নবাব রাজধানীর নাম পরিবর্তন করিয়া লইলেন । কুচবিহারের রাজধানী এক্ষণে আলমগীর

৭। মিরজুয়া এই স্থানে ১৬ দিন বিশ্রাম করিলেন এবং এই বিশ্রাম অন্তে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে, জানুয়ারি মাসে, আসাম আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন । তিনি আসামের পথে প্রায় সর্বত্রই গভীর জঙ্গল, অসংখ্য নানা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাইলেন । তিনি দেখিলেন, সুদীর্ঘ ঘাস ও নল খাগড়ায় সমস্ত দেশ ঢাকিয়া রহিয়াছে । নবাব অতি ধীরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । একদিনে ৫ কি ৬ মাইলের অধিক চলা অসাধ্য হইয়া উঠিল । অবশেষে তিনি গোয়ালপাড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন । নবাব গোয়ালপাড়ায় পঁহুঁচিয়া দেখিলেন, কোথাও আসামী সেনার নাম গন্ধও নাই ;—তাহারা দেশ রক্ষার জন্য একটি অস্ত্রাঘাতও না করিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে । গোয়ালপাড়া হইতে মোগল সেনা, নদীপথে নৌকায় দ্রব্য-সামগ্রী পাঠাইয়া, আপনারা নদীতট দিয়া যাত্রা করিল । এইরূপে ১৫ দিন হাঁটিয়া তাহারা গোঁহাটীতে পঁহুঁচিল । এস্থান হইতেও আসামীগণ দুর্গ জনশূন্য রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছিল । অতঃপর নবাব সৈন্যসামন্তসহ কামরূপের রাজধানী ঘরগাঁও অভিমুখে যাত্রা করিলেন । ঘরগাঁও ব্রহ্মপুত্রের পর পাড়ে অবস্থিত ছিল । তাহারা তাঁহাদিগের সঙ্গীয় নৌকাযোগে দুই দিনে ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন । গতিপথে তাঁহারা সিমলাগড় ও চামধুরার দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন । এই ঘটনার অল্পকাল পরে বিপক্ষীয় ৮০০ শত নৌকার একটা বহর আসিয়া তাঁহাদিগের নৌকা আক্রমণ করিল । সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল । কিন্তু কামানসহ স্থল সৈন্য আসিয়া পঁহুঁচিলেই বিপক্ষেরা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল । তাহাদিগের ৪০০ রণতরি ধ্বংস হইল । প্রত্যেক তরিতে একটি করিয়া কামান ছিল । ইহার পরে নবাব ৯ই মার্চ তারিখে সসৈন্তে লুচ্ছগারে পঁহুঁচিলেন । এই স্থানে একটি ব্রাহ্মণ দূত ;—আসাম রাজার গুরু ১০০

জুম্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। মিরজুম্মা এই পত্রের প্রত্যুত্তরে এইমাত্র বলিলেন যে, সন্ধির কথা কহিতে হইলে, তিনি ঘরগাঁয় পঁহুঁচিয়া কহিবেন। আহমরাজের তদানীন্তন রাজধানী ঘরগাঁও যে স্থানে দিহঙ্গ নদী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে নদীতটে অবস্থিত ছিল। কিন্তু সেখানকার নদীর গভীরতা নিতান্ত কম বলিয়া নবাব ৩২৩ রণতরির বহর পশ্চাতে লুক্‌হগারে রাখিয়া স্থল-পথে সৈন্য সহ অগ্রসর হইলেন। অবশেষে তিনি রাজধানী ঘরগাঁয় ঘাইয়া পঁহুঁ-চিলেন। ১৭ই মার্চ তারিখে তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাজা তাঁহার অধিকাংশ ধনসম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু পরদিন একটা পুকুরের মধ্যে কতকগুলি কামান পাওয়া গেল। রাজা ঐ পুকুরে কামান ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ৮২টি হাতী এবং মোহর ৩ টাকায় ৩ লক্ষ মুদ্রা নবাবের হস্তগত হইল। মোগলেরা এই রণ-যাত্রায় সর্বসমেত ৬৭৫টি কামান ৭০০০ মাচলক্ বা পলিতার বন্দুক, প্রভূত পরিমাণ যুদ্ধ-সরঞ্জাম এবং ১০০০ নৌকা ও ছোট জাহাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঘরগাঁয়ে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল সঞ্চিত ছিল, তাহাও নবাবের হাতে পড়িয়াছিল।

৮। নবাব ঘরগাঁয়ে রক্ষক স্বরূপ একদল সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সেনাসহ মথুরাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘরগাঁও ছাড়াইয়া ১০ মাইল দূরে মথুরাপুর। সংবাদ পাওয়া গেল যে, রাজা কামরূপ হইতে বহু দূরবর্তী পূর্বদিকে নামরূপ নামে পরিচিত পাহাড় সমূহে পলায়ন করিয়াছেন। নামরূপের জলবায়ু এতদূর কদর্যা যে, উহা নরক নামে অভিহিত ছিল। রাজা এই স্থানে অপরাধীদিগকে নির্ক্ষাসিত করিতেন। বর্ষার ঝড়ি আরম্ভ হইয়াছিল। নবাব মথুরাপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বর্ষা কাটাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

৯। ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি কালক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে।

রাজা কোন কালে আসাম জয়ে সমর্থ হন নাই । যখন যে সেনা ঐ দেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । কোন পথিক বা পরিব্রাজক কখন নিরাপদে এদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই । যখন কোন সেনা এই দেশ আক্রমণ করিয়াছে, দেশের লোকেরা অমনি পাহাড় পর্বতে পলাইয়া গিয়াছে । এই পাহাড়ে বিদেশীদিগের কেহই তাহাদিগের অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় নাই । দেশের লোক সমস্ত বর্ষাকাল পাহাড়ে লুকাইয়া রহিয়াছে, এ দিকে আক্রমণকারীর দল, অনাহারে, বা প্রচুর আহাৰ্য্যের অভাবে, রোগে এবং দেশীয় লোকের অবিশ্রান্ত নৈশ-আক্রমণে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ।

১০ । সাহাব-উদ্দিন বলেন, পূর্ব আক্রমণকারীদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণ মিরজুমার সেনার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল ।

বর্ষার বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই মুসলমানদিগের পক্ষে সৈন্য চালনা এক প্রকার অসাধ্য ও অসম্ভব হইয়া পড়িল । তাহারা প্রতিনিয়ত, বিশেষতঃ রাত্রি কালে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিল । দ্রব্য-সামগ্রী আনাই-বার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল । শিবিরের বাহিরে দূরে দূরে প্রহরিরূপে যে সৈন্যদল রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগকে সরাইয়া সরাইয়া শিবিরের নিকট টানিয়া আনিতে হইল । ঘরগাঁও ও মথুরাপুর ব্যতীত অল্প সমস্ত স্থান ক্রমে আসামীরা পুনঃ অধিকার করিয়া লইল । কোন ব্যক্তি যদি সাহসে ভর করিয়া শিবিরের বাহিরে যাইত, তাহা হইলে, অমনি কোন লুকায়িত শত্রু তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিত । সাহাব-উদ্দিন বলেন,—এরূপ দুর্দশা পূর্বে আর কখন কোন মোগল-সেনার ভাগ্যে ঘটে নাই । শিক্ষিত মোগল সেনা যে শত্রুদিগকে তুণবৎ অবজ্ঞা করিত, সেই নগণ্য শত্রু কর্তৃকই এই স্থানে ১২০০০ মোগল সেনাকে ৬ মাস

বা প্রয়োজনীয় বস্তুই তাহাদিগের নিকট পঁছঁচিতে পারিত না । রাজা নামরূপের পাহাড় হইতে বাহির হইয়া স্বয়ং এই সকল আক্রমণ ব্যাপারে নায়কতা করিতে লাগিলেন । অন্য স্থান হইতে মুসলমান শিবিরে কোন দ্রব্য-সামগ্রী আসিতে পারিত না । সুতরাং, আহাৰ্য্য বস্তুর নিতান্তই অসদ্ভাব হইয়া উঠিল । মাখন ১৪ টাকা সের ও লবণ ৩০ টাকা সের দরে বিক্রীত হইত । নবাব মিরজুন্না, সৈন্যদল আর কোনপ্রকারেই দীর্ঘকাল মথুরাপুরে থাকিতে পারিতেছে না, বুঝিয়া আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে ঘরগাঁয়ে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন । সন্ধ্যায় তারবাহী পশুপালের অধিকাংশ মরিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং মিরজুন্না, সঞ্চিত দ্রব্য-সামগ্রীর এক চতুর্থাংশ বহুসংখ্যক কামান এবং অনেকগুলি পীড়িত ও আহত লোককে ফেলিয়া যাইতে হইল । অবিরাম বৃষ্টি । সেনাদল বহু কষ্টে ঘরগাঁও পঁছঁচিল । এখানেও লবণশূন্য লাল রঙের মোটা চাউল ভিন্ন আর কোন খাদ্য সামগ্রী যুটিল না । জ্বর ও আমাশয়ে তাহাদিগের অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল ।

১১ । অবশেষে সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে বৃষ্টি থামিল । নদীপথে সেনাদিগের খাদ্য-সামগ্রী আসিয়া পঁছঁচিল । আসামরাজ তাহাদিগের চিরচলিত রীতি অনুসারে পুনরায় পাহাড়ে পলায়ন করিলেন । নবাব তাহাদিগের অনুসরণে সৈন্য প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু সেই সকল সেনা তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিল না । অবশেষে নবাব নিজেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন । প্রধান প্রধান সেনানায়কেরা একবাক্যে বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নহেন এবং যদি আবারও একটা বর্ষা তাহাদিগকে আসামে কাটাইতে হয়, তাহা হইলে, তাঁহারা সকলেই সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন । যোগলসম্রাট্ যে দুই সম্ভ্রান্ত অভিজাতকে কুচহাজো বা কামরূপের

এহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন । এই সময়ে, আসামের রাজা সন্ধি প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন । মিরজুলাও আহ্লাদসহকারে সন্ধির জন্ত প্রস্তুত হইলেন । সন্ধিতে এই সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল ।—

(১) আসামরাজ, তাঁহার একটি কন্যাকে পরিণয়ার্থ মোগল সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিবেন । তাঁহাকে তখন ২০০০০ তোলা সোণা, ১২০০০০ তোলা রূপা, ৩৫টি হাতী দান করিতে হইবে ; ইহার পরে তিনি বার মাসের মধ্যে ৩টি লখা (Lakhas) ৯০টি হস্তী দিবেন এবং প্রতি বৎসর করস্বরূপ তাঁহাকে ২০টি করিয়া হাতী দিতে হইবে । সন্ধির সর্ত্তানুসারে কার্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে আসামরাজের চারি জন ফুহান বা সেনাপতির পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ মোগল-হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত আসামরাজকে দারঙ্গ, নেকিরানী বা গারো পর্বত, নাগা পর্বত, বেলতলী এবং ছুমুরিয়া এই কএকটি জেলাও ছাড়িয়া দিতে হইল ।

১২ । ১৬৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে সৈন্যদিগের প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদত্ত হইল । এই অনুমতি পাইয়া হতাশ ও ক্লিষ্ট সেনাদল আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল । কিন্তু দেশে ফিরিয়া আসিতে তাহাদিগকে অপরিসীম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । এই দেশ-যাত্রার শেষ ভাগে, ঐতিহাসিকেরা বলেন,—পশুগুলিকে একমাত্র তৃণ ও মানুষদিগকে জলমাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল । পীড়িত নবাবের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল । গোহাটা ছাড়িয়া আসিবার অল্প পরে, নদীপথে নৌকায় তাঁহার মৃত্যু হইল ।

১৩ । আসাম ‘বুরান্জি’ বা রাজ-আখ্যানে এই যুদ্ধের অন্তরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে । রাজ-আখ্যানের বর্ণনা অনুসারে মোগল সেনা যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং সমগ্র কামরূপ আসামীদিগের হাতেই থাকিয়া যায় । ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ধ্বজ সিংহ পরলোকগত হন ।

চারি বৎসর কাল, গোহাটী মোগল সাম্রাজ্যের প্রান্ত নগর হইয়া থাকে। কিন্তু ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে আসামীরা ইহা পুনঃ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ। রাম সিংহ একজন বড় রাজপুত্র অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত রাজকুল ছিলেন। তিনি দিল্লীর সিংহাসন লাভ বিষয়ে আওরঙ্গজেবের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রামসিংহ কর্তৃক, উল্লিখিত ঘটনার ১০ বৎসর পরে, পুনরায় মোগলদিগের পক্ষ হইতে গোহাটী বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল। ইহার পরে, বোধ হয়, আবার মোগলেরা গোহাটী হইতে বিতাড়িত হন এবং গোহাটী আহম রাজাদিগের রাজধানী হইয়া পড়ে।

(ছ)

বর্মা কর্তৃক আসাম আক্রমণ

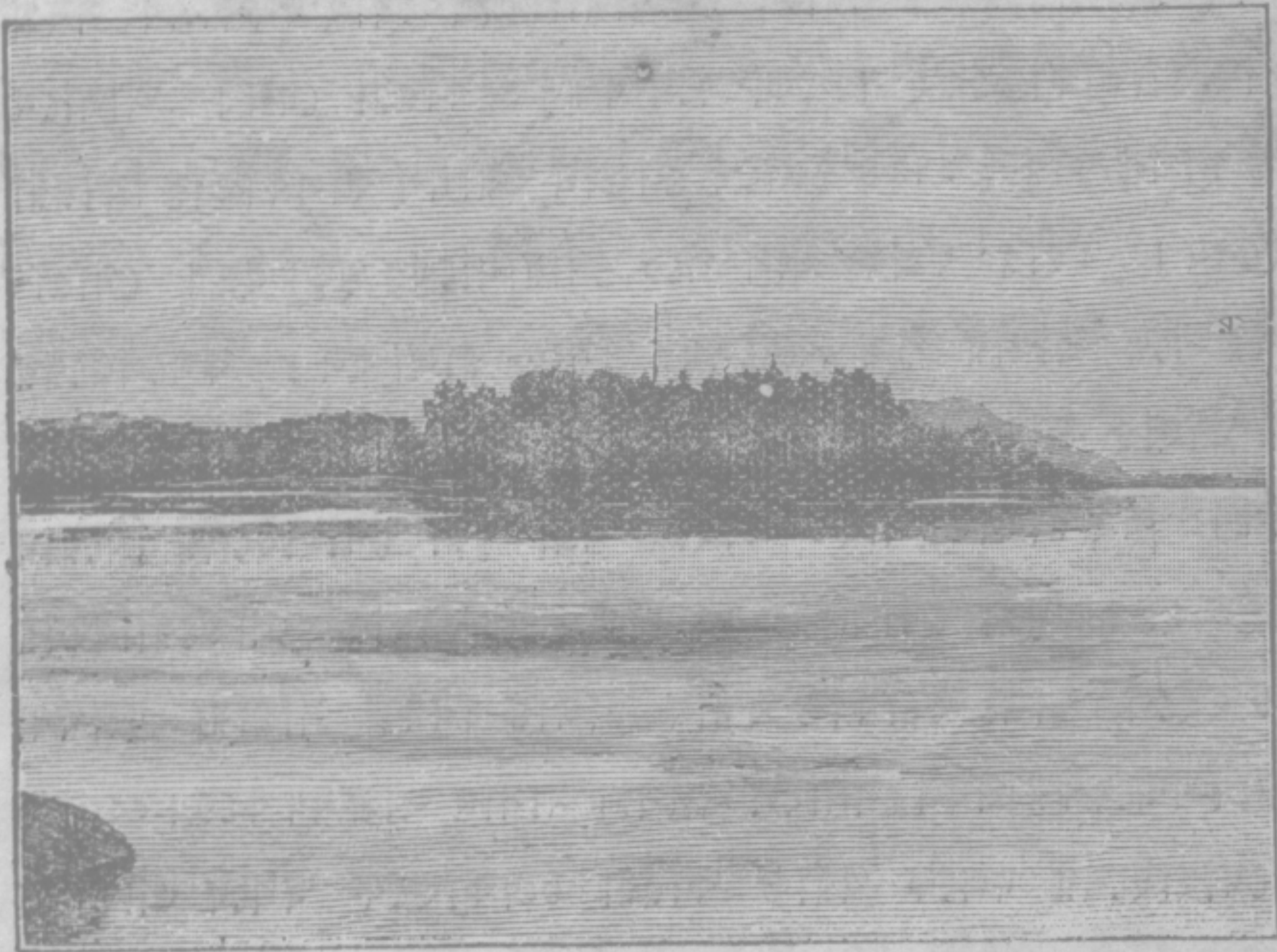
ও

আসামে ব্রটিশ শাসনের প্রবর্তন।

১। অল্প কএক দিন পূর্বে, কাচাড়িরা পরাভূত হইয়াছে। কুচ রাজ্যের অধঃপতনে দুর্গাঙ্গ ও বিজিনির রাজদ্বয় করদ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং মিরজুমা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে; আসাম উপত্যকায় আহমদিগের প্রতিযোগী আর কেহই রহিল না।

২। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে চুকুঙ্গফা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আর এক নাম রুদ্রসিংহ। রুদ্রসিংহ সমগ্র আসাম উপত্যকার উপর অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সমস্ত পার্শ্বত্যজাতিগুলিও তাঁহার বশতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি রঙ্গপুর নগর প্রতিষ্ঠা ও তথাকার দুর্গ নির্মাণ করেন। রুদ্রসিংহ তিব্বতের সহিত আসামের বিস্তৃত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসামের বাণিজ্য সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গোহাটীর ঠিক বিপরীত দিকে প্রবাহিত নদীতটে

তাঁহার মৃত্যু হয় । এই স্থানে পশ্চাৎ তাঁহার পুত্ৰ, কুদেব্বৰ নামক শিব-
মন্দিৰ নিৰ্ম্মাণ করেন ।



[গোঁহাটীৰ সন্নিহিত দ্বীপ]

৩। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে গোঁৱীনাথ সিংহ আসাম সিংহাসনে অধিৰূঢ়
হন । তাঁহার সময়ে মোয়ামাৰিয়াগণ বিদ্ৰোহী হইয়া উঠে । মোয়া-
মাৰিয়া একটা শক্তি-শালী ধৰ্ম্ম সম্প্ৰদায় । মোয়ামাৰিয়াদিগের বাসভূমি
ডিব্ৰুগড় । মোয়ামাৰিয়াদিগের সহিত রাজা গোঁৱীনাথের যুদ্ধ উপস্থিত
হয় । তাহারা ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে রাজার সৈন্যদিগকে পৰাস্ত করে । মণি-
পুৰের রাজা আসাম রাজের সাহায্যার্থ আগমন কৰিয়াছিলেন । তিনিও
যুদ্ধে পৰাভূত হন । এই সময়ে দাৰুৱাঙ্গের রাজা কৃষ্ণ নারায়ণ আসাম-
রাজকে আক্ৰমণ করেন । রাজা গোঁৱীনাথ এইৰূপে একান্ত বিপন্ন
হইয়া ব্ৰটিস্ গবৰ্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান । গোঁৱীনাথের

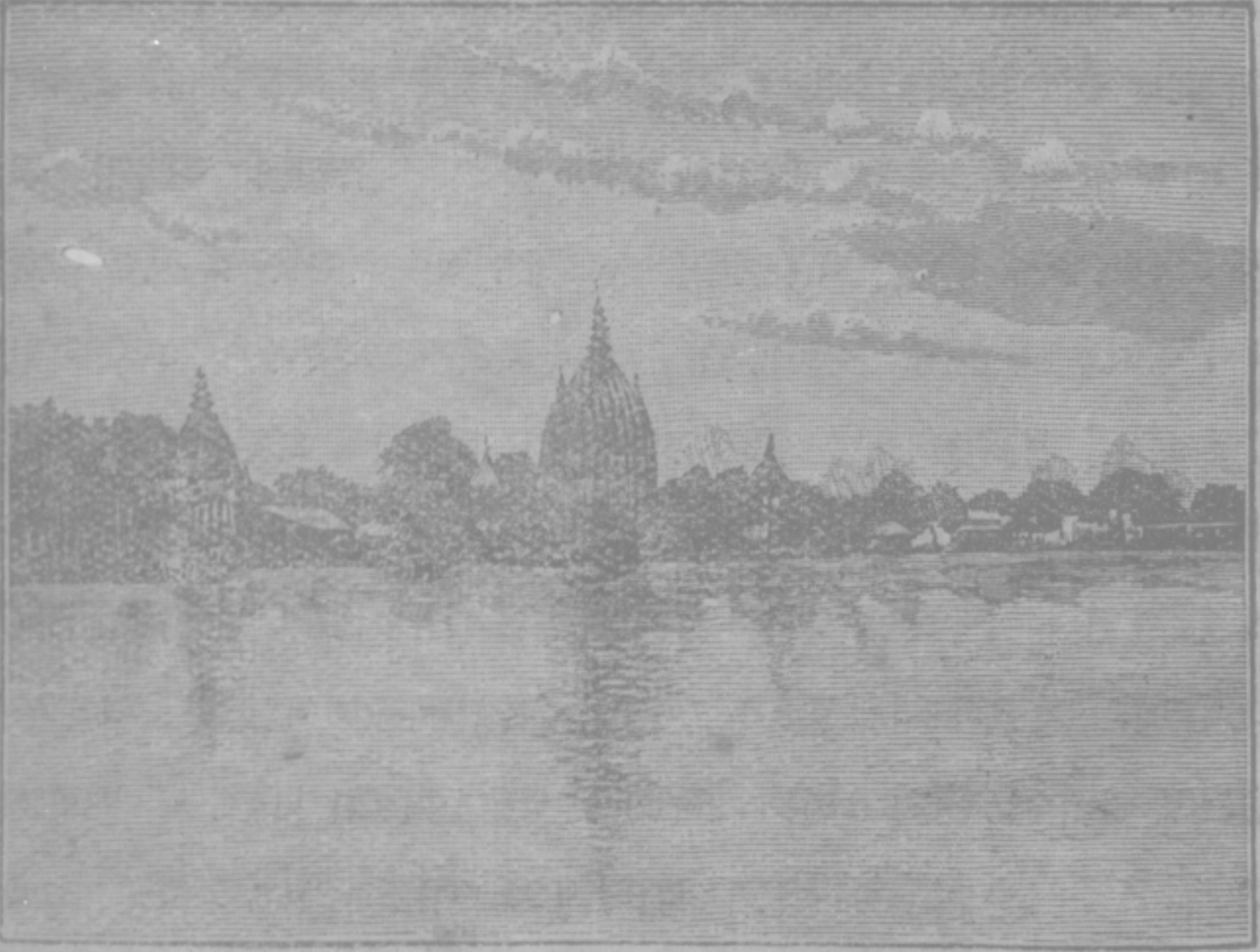
সাহায্যার্থ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে একদল সেনা প্রেরিত হয় । কাপ্তান ওয়ালস্ এই সেনাদলের সেনাপতি হইয়া গিয়াছিলেন । কাপ্তান ওয়ালস্ কৃষ্ণনারায়ণকে পরাস্ত, মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ দমন এবং সমগ্র আসাম উপত্যকাটিকেই সর্বতোভাবে বশীভূত করিয়া দেন । আসামে শান্তি স্থাপন করিয়া ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান ওয়ালস্ কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন । ইহার কএক মাস পরে, গৌরীনাথের মৃত্যু হয় । গৌরীনাথের পরে তাঁহার পুত্র কমলেশ্বর সিংহ রাজা হন । কমলেশ্বরের পরে, তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন । এই রাজার সহিত তাঁহার মন্ত্রী বুরা গোহাইনের বিরোধ উপস্থিত হয় । বুরা গোহাইন প্রকাণ্ডরূপে তাঁহার প্রতিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলে, রাজা চন্দ্রকান্ত বর্ম্মার রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন । বর্ম্মদেশীয় প্রবল সেনাদল আসিয়া আসাম আক্রমণ করে । তাহার বুরা গোহাইনের দলকে পরাস্ত করিয়া চন্দ্রকান্তকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যায় । বর্ম্মদেশীয় সেনা স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই বুরা গোহাইন আবার শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং চন্দ্রকান্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন । চন্দ্রকান্ত পুনরায় বর্ম্মবাসীর শরণাপন্ন হন । তাহার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া আবার তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে । পুরন্দর সিংহ সিংহাসনচ্যুত হইয়া ব্রিটিশ্ গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান । কিন্তু ব্রিটিশ্ গবর্ণমেন্ট সাহায্য দানে সম্মত হন না । ইহার পরে, চন্দ্রকান্ত বর্ম্মবাসীদিগের সহিতই বিবাদ আরম্ভ করিয়া দেন । অবশেষে বর্ম্মদেশীয়েরা ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকান্তকে আসাম হইতে তাড়াইয়া দিয়া সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া লয় ।

৪। চন্দ্রকান্ত পলাইয়া ইংরেজ অধিকারে গমন করেন । তাঁহার সঙ্গে

বর্ষ দেশীয়েরা এই সকল লোকের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং ইহাদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছিল। এই ঘটনার পরে, বর্ষদেশীয় সেনাপতি ভয় প্রদর্শন পূর্বক ব্ৰিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট চিঠি লিখেন। সেনাপতি মহাশয় লিখিয়া পাঠান যে, ব্ৰিটিশ গবর্ণমেন্ট চন্দ্রকান্তকে তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। যদি গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে, তাঁহারা ব্ৰিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিয়া বর্ষ-পূর্বক চন্দ্রকান্তকে ধরিয়া আনিবেন। এইরূপ ভয় প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই একদল বর্ষদেশীয় সেনা কাচাড়ে দিকে অগ্রসর হইল। এই সময়ে কাচাড় রাজ্য ব্ৰিটিশ গবর্ণমেন্টের রক্ষণাধীন ছিল। প্রথম বর্ষদেশীকে কাচাড় হইতে সরিয়া যাইতে বলা হইল, কিন্তু তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। অতএব ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্ৰিটিশ গবর্ণমেন্ট বর্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ব্ৰিটিশ সেনা, অল্পদিনের মধ্যেই একবহর কামানের নৌকাযোগে সমস্ত উপত্যকা জয় করিয়া লইল। অতঃপর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে জান্দাবুতে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির সর্তানুসারে বর্ষীগণ আসাম রাজ্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যান।

৫। ইহার পরে আসামের একাংশ অর্থাৎ কামরূপ, নওগড় ও দাবুগড় এই কয়টি জেলা ব্ৰিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন করা হইল। ডিব্রুগড় জেলায় মোয়ামারিয়াগণ বাস করিত। উহা কএক বৎসর কাল, মোয়ামারিয়াদিগের দলপতি ‘বর সেনাপতির’ শাসনে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ‘বর সেনাপতির’ মৃত্যু হয় এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ডিব্রুগড় ব্ৰিটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। প্রথমতঃ শিবসাগর ও লক্ষীপুর জেলায় রাজা পুরন্দর সিংহের হাতে রাখা হইয়াছিল। তিনি বার্ষিক ৫০০০০ টাকা কর দানে সম্মত হইয়া উহা রাখিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুত কর দিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পরে, তিনি

আর এরাজ্য শাসন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া প্রকাশ করেন। সুতরাং এত্ৰুটি জেলাও ব্ৰিটিশ্ রাজ্যভুক্ত করা হয়। সাসীয় জেলা থাম্-পতি সর্দারের হাতে ছিল। থাম্‌পতিগণ বিদ্রোহী হওয়াতে, এই সময়ে



[শিব সাগরের শিবমন্দির]

সাসীয় জেলাও ব্ৰিটিশ্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র আসাম রাজ্য ব্ৰিটিশ্ শাসনের অধীন হইয়া আছে।

৬। গোয়ালপাড়া সমেত আসাম প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপে বাঙ্গালা রাজ্যের অধীন ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম ইহা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানিকে দান করেন। পূর্ব দুয়ার রাজ্য হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভূটান যুদ্ধের অবসানে ব্ৰিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট উহা ভূটানের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লন।

সম্পূর্ণ।

